বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্থ অধিবেশনের

কার্য্যবিবরণ

ময়মনসিংহ

বঙ্গাব্দ ১৩১৮

ময়মনসিংহ
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার এম আর এ এস
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্থ অধিবেশন,—ময়মনসিংহ।

উদ্দেশ্য।

সর্ব্ব প্রকার সম্মিলনই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা-পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। সাহিত্য জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক ও সাহায্যকারী, ইহা বলাই বাহুল্য। যে উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সম্মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য অতি মহান্। করুণাময় পরমেশ্বর সেই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিয়া সম্মিলনের প্রতিষ্ঠাতৃগণকে জয়যুক্ত করুন। সম্মিলনও বর্ষে বর্ষে আপন কর্ত্তব্য পালন ও উদ্দেশ্য সাধন করিয়া দেশের ও দশের আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করুক।

ইতিহাস।

বঙ্গদেশে সাহিত্য-সম্মিলনের এই অভিনব ভাব মুর্শিদাবাদ হইতেই প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল। ১৩০৯ সনে মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত "সুধা" পত্রের পরিচালক, নবীন কবি শ্রীমান্ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পরলোকগত সুলেখক ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের সাহায্যে সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনার আভাস প্রচার করেন। নানা কারণে দক্ষিণা-রঞ্জনের সাধু-উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতঃপর ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহের প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন। ৭ই বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই সম্মিলনে যোগদান করিয়া "স্বদেশী সমবায়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন স্থির হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া পড়ায়, সেই সময়ে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। ইহার পর ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে বরিশালের যুবক কবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় স্বীয় জন্মভূমিতে সাহিত্য-সম্মিলনের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। সে বৎসর সেখানেও রাজনীতি-আলোচনার নিমিত্ত বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-সম্মিলনের অধিবেশনও হয়। সেই প্রাদেশিক সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলনেরও ব্যবস্থা ও আয়োজন হইয়াছিল। নানাস্থানের বহু প্রবীণ সাহিত্যিক সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা-কল্পে বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং

কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাদেশিক সম্মিলনের বোধন হইতে না হইতেই বিসর্জ্জন হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলনেরও কল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে বারবার তিনবার বঙ্গীয়-সাহিত্যিকগণের আগ্রহ ও চেষ্টা দৈব-প্রতিকূলতায় নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতেও কিন্তু সাহিত্য-হিতৈষী ব্যক্তিবৃন্দ বিশেষতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় ধুরন্ধর হতাশ না হইয়া পুনরায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান ও আয়োজন করিতে থাকেন। এইবার কাসিম-বাজারের স্বনাম-ধন্য সাহিত্যবন্ধু মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সম্মিলনের ভার নিজ হস্তে লইয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু এখানেও এক অচিন্তিতপূর্ব্ব, বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। অকস্মাৎ সম্মিলনের প্রাণ-স্বরূপ মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র নন্দী পরলোকগত হওয়ায় সে বৎসরের চেষ্টাও সংরুদ্ধ হইয়া যায়। অবশেষে কয়েকমাস যাইতে না যাইতে কঠোর-কর্ত্তব্যপরায়ণ, শোকবিজয়ী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাহিত্যের প্রকৃত বন্ধুরূপে, ১৩১৪ বঙ্গাব্দে আবার এই বিষয়ের আয়োজন করিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে আহ্বান করেন। এই বার ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্ত্তিক হইতে কাসিম-বাজারে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থির হয়। অবশেষে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক কাসিম-বাজারের শোক-সন্তপ্ত রাজপুরীতেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন বা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়।

পরবর্ত্তী অধিবেশন।

প্রথম অধিবেশনে রাজশাহীর সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-সম্মিলনকে দ্বিতীয় বর্ষের জন্য রাজশাহীতে আহ্বান করেন। তদনুসারে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ও ১৯শে মাঘ রাজশাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তৎপরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়।

ময়মনসিংহে আহ্বান।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ভাগলপুর অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ময়মনসিংহ শাখা হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্, এ, মহাশয়দ্বয়কে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়। যোগেন্দ্র বাবু শাখা-পরিষদের অনুরোধে ময়মনসিংহ-বাসীর পক্ষ হইতে আগামী বর্ষে ময়মনসিংহে মিলিত হইবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করেন। কলিকাতা-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী-

সম্পাদক ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল-নিবাসী, ভূতত্ত্ববিৎ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্, এ মহাশয় এই নিমন্ত্রণ সমর্থন করিলে, সম্মিলনের পক্ষে কাসিমবাজারের শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

উদ্যোগ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ময়মনসিংহ-শাখা ১৩ই আশ্বিন স্থানীয় সিটি কলেজ গৃহে এক বিশেষ সভা আহ্বান করেন। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ অভ্যর্থনা-সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হয় এবং কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হয়। (পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য)

সভাপতি।

১৯শে আশ্বিন স্থানীয় সিটি কলেজ গৃহে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়কে সম্মিলনের সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীমন্মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করেন। যথাসময়ে ডাক্তার বসু চতুর্থ সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া চতুর্থ সম্মিলনকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

সম্মিলনের অধিবেশন প্রথমতঃ বড় দিনের ছুটীতেই হইবার প্রস্তাব স্থির হইয়াছিল, শেষ ঐ সময়ের দিন পরিবর্ত্তিত করিয়া গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১লা, ২রা ও ৩রা বৈশাখ নির্দ্ধারিত করা হয়।

নিমন্ত্রণ।

বঙ্গীয় গ্রন্থকার, প্রবন্ধ-লেখক, সংবাদ-পত্র ও মাসিক পত্রের সম্পাদক, সাহিত্য-পরিষদের সভাগণ এবং বিভিন্ন জেলার উচ্চপদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার গ্রন্থকার, প্রবন্ধ-লেখক, সম্পাদক, জমিদার, তালুকদার, হাকিম, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, পণ্ডিত, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোককেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রায় আট সহস্র নিমন্ত্রণ পত্র নানা প্রণালীতে দেশময় প্রেরিত হয়।

স্থান।

স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সাহিত্য-যজ্ঞের বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলেজ-কমিটীর সভাপতি সহৃদয় ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, আর, ব্লাকউড্ মহোদয় সম্মিলনের মণ্ডপ-

নির্ম্মাণ জন্য কলেজ-প্রাঙ্গণ ও প্রতিনিধিগণের অবস্থানের জন্য কলেজ-হোষ্টেল ও কলেজ-গৃহ সম্মিলনকে ছাড়িয়া দিয়া এই বিরাট যজ্ঞের সফলতা সম্পাদনে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ সাহায্য করেন। সভা-মণ্ডপ এবং অধিকাংশ প্রতিনিধির বাসের সমাবেশ একই স্থানে হওয়ায়, এই বিরাট ব্যাপার সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই জন্য মিঃ ব্ল্যাকউডের নিকট সম্মিলন সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ।

অধিবেশনের সময়। ১লা বৈশাখ ৩টা হইতে ৫টা এক বেলা, ২রা বৈশাখ প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৬টা এবং ৩রা বৈশাখ ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সম্মিলনের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

সমাগম। সভা-মণ্ডপে পঞ্চসহস্র দর্শকের স্থান করা হইয়াছিল, কিন্তু সম্মিলনে আশাতিরিক্ত লোক-সমাগম হওয়ায় প্রথম দিন সম্মিলন-মণ্ডপে এই বৃহৎ জনতার স্থান সমাবেশ হয় নাই। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া ও ভূমিতে উপবেশন করিয়া সম্মিলনের কার্য্যাবলী দর্শন করিতে হইয়াছিল। সাহিত্য-সম্মিলনে এইরূপ বিরাট জনতা হইবে বা হইতে পারে, পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করেন নাই। এই বিরাট জনতার ভিতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বা ভূমিতে উপবেশন করিয়া ধৈর্য্য সহকারে যে সম্মিলনের সফলতার প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতেই ব্যাপারটির প্রতি দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের যে কতটা শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও যত্ন পড়িয়াছিল, তাহাই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। ময়মনসিংহের বহু জমীদার মৃত্তিকাসনে বসিয়া সম্মিলনের কার্য্যাবলী পরিচালন করিয়াছিলেন; ইহাদ্বারা ময়মনসিংহের মুখ উজ্জ্বল ও গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। সম্মিলনে প্রায় সাতহাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিভিন্ন জেলার সদস্য সংখ্যা দুই শতাধিক হইবে।

(পরিশিষ্ট "খ" দ্রষ্টব্য)

আদর অভ্যর্থনা। ২৯শে চৈত্র হইতেই প্রতিনিধিগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন চট্টগ্রামের সাহিত্য সেবিগণ ২৯শে তারিখ অপরাহ্নে আগমন করেন। ৩০শে চৈত্র পূর্ব্বাহ্নে ঢাকার ও অপরাহ্নে ভাগলপুর, কলিকাতা, মালদহ, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, গৌহাটী, ঢাকা, প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণ এবং সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ বসু মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হন। সেই দিন রাত্রি ১২টার গাড়ীতে কাসিমবাজারের

শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, লালগোলার রাজকুমার ও মুর্শিদাবাদের অন্যান্য সাহিত্যিকগণ আগমন করেন। স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীমন্মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ, সমিতির সদস্যগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ষ্টেশনে থাকিয়া সকলকেই সমাদরে অভার্থনা করিয়া লইয়া আসেন। সভাপতি ডাঃ বসুর বাসের জন্য সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় সার্কিট হাউস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কাসিমবাজারের মহারাজকে, লালগোলার রাজকুমারকে এবং কাশিমবাজারের সাহিত্যিকগণকে মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়দ্বয়কে আমবাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়, কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-কিশোর আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়-দ্বয়কে কালীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বিজয়কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় অতিথি-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নিবারণ-চন্দ্র দাস-গুপ্ত মহাশয়দ্বয়কে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ মহাশয় অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু-প্রতিনিধিগণকে দুর্গা-বাড়ীতে এবং ঢাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জন্য পাতিলাদহের "বিশ্রাম-নিবাসে" স্থান প্রদান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রতিনিধি ও সাহিত্যিকগণ, যাঁহারা সম্মিলনের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কলেজ-হোষ্টেলে ও কলেজগৃহে স্থান প্রদান করা হইয়াছিল। আদর-আপ্যায়ন জন্য প্রতিস্থানেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তত্ত্বাবধায়ক, সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক, স্বেচ্ছাসেবকগণ নিয়োজিত ছিলেন। সর্ব্বোপরি তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান পরিদর্শন জন্য একজন পরি-দর্শক ছিলেন। (পরিশিষ্ট "গ" দ্রষ্টব্য।) পরিদর্শক প্রতিকেন্দ্রে যাইয়া প্রতিনিধি-গণের সুখ, সুবিধা ও অভাব-অভিযোগের তত্ত্ব সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন।

বিবিধ বিভাগের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ কর্ম্মকুশল লোক লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ নিরূপিত হইয়াছিল। মিলন-মণ্ডপের সম্মুখে বিস্তৃত ময়দানে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাবাসে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ভাণ্ডার-গৃহ ছাত্রাবাসের এক প্রকোষ্ঠে ছিল। এখান হইতেই বিভিন্ন স্থানে খাদ্য-সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ হইত। (পরিশিষ্ট "ঘ" দ্রষ্টব্য।) মশুয়ার জমিদার,

শৃঙ্খলা।

সাধারণের কার্য্যে অগ্রণী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় বিবিধ বিভাগের সুশৃঙ্খলার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

সুবন্দোবস্তে সর্ব্ব বিভাগের কার্য্যই সুশৃঙ্খলায় ও সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ।

সম্মিলনে পাঠের জন্য বহু প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে, বিজ্ঞান বিষয়ে, দর্শন বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়েরও প্রবন্ধ ছিল। কতকগুলি প্রবন্ধ সভাস্থলে পঠিত ও কতকগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। একজন মহিলা এবার সম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাহিত্য-সম্মিলনে মহিলা-রচিত কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই; সুতরাং কোনও অধিবেশনে মহিলাকর্তৃক কোন প্রবন্ধও পাঠেরও সুযোগ ঘটে নাই। এবারকার অধিবেশনের এবং বাঙ্গালার সাহিত্যের ইহা এক বিশেষ ঘটনা বলিতে হইবে। ময়মনসিংহের পক্ষে আবার ইহা আরও গৌরবের বিষয় হইয়াছে; কারণ প্রবন্ধ-রচয়িত্রী ময়মনসিংহেরই একজন অধিবাসিনী এবং তিনি বিদুষী ও একখানি প্রধানা মাসিক-পত্রিকার সম্পাদিকা। সম্মিলনে প্রবন্ধের সংখ্যা অধিক হইলে, সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হইতে পারে না; এজন্য যাঁহাদিগের প্রবন্ধ পঠিত হইতে পারে না, তাঁহারা দুঃখিত হন। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। সেজন্য এবার পূর্ব্ব হইতেই লেখকগণকে মূল প্রবন্ধের সহিত সম্মিলনে পাঠের জন্য সেই প্রবন্ধেরই একটী করিয়া সংক্ষিপ্তসার প্রবন্ধ লিখিয়া আনিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। অনেকেই তাহা করিয়াছিলেন। যাঁহারা করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকেও সংক্ষেপেই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। যাঁহারা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠান নাই, তাঁহাদের প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে এবার প্রবন্ধ সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছিল।

সম্মিলনে মহিলা।

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনে অনেকগুলি মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাও এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের আর একটী বিশেষত্ব। সভাপতির আসনের পশ্চাৎ-ভাগে কলেজের বারেন্দায় মহিলাদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। যে সকল মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জন স্থানীয় ও কয়েক জন ভিন্ন জেলা হইতে আগত।

বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক পরীক্ষা।

সভাপতি ডাঃ বসু মহাশয় সম্মিলনে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা বৈদ্যুতিক আলো ও যন্ত্র সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য স্থানীয় সূর্য্যকান্ত হলে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করা হয়। মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর

সূর্যকান্ত হলে তাড়িত আলোর সংযোগ ব্যবস্থা করিয়া ও এসিষ্টাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার খাঁ বাহাদুর শ্রীযুক্ত মৌলবি আবদুল মমিন সাহেব সেটেল্‌মেণ্ট আফিসের ইলেক্‌ট্রিক তারদ্বারা আলোক সংযোগে সাময়িক সাহায্য করিয়া সম্মিলনের প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। প্রয়োজন মত হঠাৎ এই সকল বিশেষ সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া এই দুই মহোদয় সম্মিলনের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ডাঃ বসু দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন রাত্রিতে যন্ত্র-সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখাইয়া তাঁহার আবিষ্কৃত নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ক্রিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রথম দিন স্থানীয় ইয়োরোপীয় এবং জমিদারগণকে এবং দ্বিতীয় দিন নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণকে ঐ সকল ব্যাপার প্রদর্শন করান হয়।

প্রদর্শনী।

সাহিত্য সম্মিলনের সহিত একটী ঐতিহাসিক ও শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐতিহাসিক প্রদর্শনী ময়মনসিংহের পক্ষে এই নূতন নহে। ১৩০৫ সালেও এই নগরে একটী ঐতিহাসিক প্রদর্শনী হইয়াছিল। এবারকার প্রদর্শনীতে অনেক বিশেষত্ব ছিল। এই প্রদর্শনী সম্পূর্ণরূপে সাহিত্য-সম্মিলনের সময়োপযোগী হইয়াছিল। স্থানীয় সিটী স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ প্রদর্শনীর জন্য সিটি স্কুলের বিশাল প্রাঙ্গণ ও গৃহগুলি প্রদান করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রদর্শনীর পুরস্কার জন্য ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এজন্য আমরা সম্মিলনের পক্ষে স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ৩০শে চৈত্র প্রাতঃকালে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড্ মহোদয় প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করেন। স্থানীয় লোকের প্রদর্শনী দেখিবার জন্য ।০ আনা ও ৵০ আনা মূল্যের প্রবেশ টিকিট ছিল, ভিন্ন জেলার নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণকে বিনামূল্যের টিকেট দেওয়া হইয়াছিল। ৩০শে চৈত্র ও ৪ঠা বৈশাখ সমস্ত দিন প্রদর্শনী খোলা ছিল, অন্যান্য দিন সম্মিলনের অধিবেশনের সময় ব্যতীত অন্য সময় প্রদর্শনী খোলা ছিল। প্রদর্শনীর কার্য্য-বিবরণ ও কর্ম্মচারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। পরিশিষ্ট "ঙ" দ্রষ্টব্য।)

আয় ব্যয়।

সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এপর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ হইয়াছে, যাহা ব্যয় হইয়াছে এবং যে টাকা উদ্বৃত্ত আছে, তাহার হিসাব 'চ' পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। স্থির হইয়াছে যে, এই উদ্বৃত্ত টাকা এই অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-মুদ্রণে ব্যয়িত হইবে। ধনীর অর্থে নিধনের পরিশ্রমে এই সকল

সমাজহিতকর, বিরাট ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং যে সকল ধনবান জমিদার ও তালুকদার সম্মিলনে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দানসম্বন্ধে সম্মিলনের আনন্দপ্রকাশ করা ব্যতীত আর কিছু বলিবার নাই; পরন্তু যে সকল সামান্য লোক শ্রদ্ধা করিয়া সম্মিলনকে অর্থদানে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধার নিমিত্ত তাঁহারা সম্মিলনের প্রকৃত ধন্যবাদ-ভাজন।

ধন্যবাদ।

ময়মনসিংহের জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্ল্যাক-উড্ মহোদয় এই সম্মিলনের প্রতি প্রথম হইতেই যত্ন ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সম্মিলনের স্থান-সমাবেশ জন্য, অতিথিগণের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য, প্রদর্শনীর সফলতার জন্য, সভাপতির বাসস্থানের সুবন্দোবস্তের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি তিনি প্রথমদিনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমবেত অতিথিগণকে অভিভাষণ করত: আমাদিগের এই সম্মিলনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিভাষণও ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্মিলনের আরও একটী বিশেষত্ব। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের এই স্নেহ চিরস্মরণীয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল মহোদয় সম্মিলনের সফলতার জন্য সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সম্মিলনের পক্ষে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহারে।

উপসংহারে আমরা একটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গেল, কিন্তু এই নির্ম্মল সম্মিলনের ক্ষেত্রে মিলনের যে পরিমাণ আনন্দ আশা করা গিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ঘটে নাই। এখনও ইহার প্রতি ছোট-বড়, প্রাচীন-নবীন অথবা দূরবাসী বা নিকটবাসী সাহিত্যিকমাত্রই আকৃষ্ট হইতেছেন না। বৎসরান্তে সাহিত্যের নামে আহূত হইয়া এই মুক্তমিলনক্ষেত্রে সকল বাধা, সকল বিঘ্ন, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতে এখনও সকলে সমর্থ হইতেছেন না। এখনও আহ্বান, অভ্যর্থনা ব্যক্তিগত অনুরোধ-উপরোধের অপেক্ষা আছে। যে দিন দেখা যাইবে যে, কোথাও সাহিত্য-সম্মিলনের নামে ডঙ্কা পড়িলেই সাহিত্য-প্রিয়, সাহিত্য-সেবী এবং সাহিত্যিকগণ সকলে আপনা হইতে ছুটিয়া গিয়া সেই স্থানে জড় হইতেছেন, যে দিন সাহিত্য-সম্মিলন কুম্ভমেলার ন্যায় সাহিত্যিকগণের অবশ্য-অধিষ্ঠান-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেইদিন এই সম্মিলনের প্রকৃত সফলতা ঘটিবে। আরও একটি ব্যাপারে সাহিত্য-সম্মিলনের

মিলন-মহোৎসব তেমন প্রীতিকর বা তৃপ্তিকর হইতে পারে না। সময়ের সঙ্কীর্ণতা ও সম্পাদ্য কার্য্যের বহুলতা জন্য সাহিত্যিকগণের অধিকাংশ ব্যক্তিই সমস্ত সময় সভাক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকেন; সকলে সকলের সহিত মেলা-মেশা বা আলাপ-পরিচয়াদি করিবার সুযোগ পান না। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ইহার অনুষ্ঠাতৃবর্গ এবিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অপেক্ষাকৃত সুযোগ বিধান করিতে সমর্থ হইবেন।

কার্য্যারম্ভ।

১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে সারকিট-হাউসে ডাঃ বসু, কাসিমবাজারের মহারাজা, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য কতিপয় গণ্যমান্য লোককে লইয়া যে কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত করেন, তদনুসারে প্রথম দিনের সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন।

চতুর্থ অধিবেশন,— প্রথমদিন।

স্থান—ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ।

সময়—১লা বৈশাখ ১৩১৮, ১৪ই এপ্রিল ১৯১১, বেলা ৩টা।

কার্য্যসূচী।

১। গতবর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্, মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি-এ মহাশয়ের আসন গ্রহণ।

২। আবাহন সঙ্গীত।

৩। অভ্যর্থনা কবিতা।—শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী।

৪। গতবর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ।

৫। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি-এ মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ।

(ক) শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের অভিভাষণ।

৬। উপস্থিত হইতে অসমর্থ মহোদয়গণের পত্রাদি পাঠ।

৭। সভাপতি-বরণ।

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ)।

সমর্থক—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাসিমবাজার)।

(ক) ঐ সম্পর্কে চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্তের কবিতা পাঠ।

৮। সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এম, এ, ডি, এস্‌সি, সি, আই, ই মহোদয়ের আসন গ্রহণ ও অভিভাষণ।

৯। গতবর্ষে মৃত সাহিত্যিকগণের বিয়োগে শোক-প্রকাশ। প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়।

১০। গত ভাগলপুর-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ ও গ্রহণ-প্রস্তাব,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বি এল্।

সমর্থক ,, বোমকেশ মুস্তফী।

(ক) তৃতীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সংকল্পিত কার্য্যগুলির মধ্যে

ভাগলপুরের উপর অর্পিত কার্য্য-বিবরণ—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বি এল

(খ) দ্বিতীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সংকল্পিত কার্য্যগুলির মধ্যে

রাজশাহীর প্রতি অর্পিত কার্য্য-বিবরণ—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল

(গ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মিলনে সংকল্পিত

অন্যান্য কার্য্যের বিবরণ—শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী।

(ঘ) তৃতীয় সম্মিলনে প্রস্তাবিত রমেশচন্দ্র-সারস্বত-ভবন সম্বন্ধে কার্য্য-বিবরণ—শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী

১১। তৃতীয় সাহিত্য-সম্মিলনে প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর গ্রহণ প্রস্তাব,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কাসিমবাজার)

সমর্থক— ,, দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)

১২। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি-গঠন প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়।

১৩। সঙ্গীত।

গত-বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভারম্ভ ঘোষণা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র উকীল কর্ত্তৃক ময়মনসিংহ-সন্তোষের জমীদার সুপ্রসিদ্ধ-কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের রচিত নিম্নোক্ত সঙ্গীতটী গীত হয়।

মিশ্র সাহানা।

ঐ আসে চলে, বাণীপদতলে,
দেশের আলোকরাজি।
পদ-মধু লোভে, গুঞ্জরণ স্বরে,
অলি কুল এল সাজি।

স্বাগত সবে স্বাগত, দুঃখ নিরাশা বিগত,
মধুরছন্দে হৃদয়-রন্ধ্রে, বাঁশী উঠে বাজি' বাজি'।
ক্ষণে ক্ষণে ঘোষে গভীর শঙ্খে,—
বঙ্গভাষা জয় আবার বঙ্গে,
ভাসিল সাধন-তরী তরঙ্গে
কাণ্ডারী বাণী আজি
স্বাগত সবে স্বাগত, দুঃখ নিরাশা বিগত
মধুর ছন্দে, হৃদয়-রন্ধ্রে, বাঁশী উঠে বাজি' বাজি'।

তৎপরে "দশানন-বধ" মহাকাব্য-রচয়িতা শেরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় তাঁহার স্বরচিত অভ্যর্থনা-কবিতা পাঠ করেন। ("ছ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।) ইহার পর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গতবর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রেরিত অভিভাষণ পাঠ করেন। ("জ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।) তৎপরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সুপণ্ডিত এবং সাহিত্য-সেবক সুসঙ্গের মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বিএ মহোদয় স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করিয়া সমবেত জনমণ্ডলী ও বিদেশাগত প্রতিনিধি এবং সাহিত্যিক-বর্গকে অভ্যর্থনা করেন। ("ঝ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় বিনয়-নম্র অভিভাষণে নিমন্ত্রিত জনমণ্ডলীকে সাদর-সম্ভাষণ করিলে পর ময়মনসিংহের জনপ্রিয় ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত জে, আর, ব্ল্যাক-উড্ মহোদয় সভার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ও ডাঃ বসুকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন যে "সাহিত্য-সম্মিলনের এই সুন্দর দৃশ্যে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। ভদ্র-মহোদয়গণের উপস্থিতিতে ও সাহিত্য-আলোচনায় স্থানীয় লোকের অনেক উপকার হইবে। আমি আশা করি, আপনারা এই কার্য্যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইবেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মহারাজ বাহাদুরের কৃত সম্ভাষণ-প্রস্তাবে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

তৎপর যে সকল মহোদয় ইচ্ছাসত্ত্বেও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই, পত্র বা টেলিগ্রাম দ্বারা স্ব স্ব সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম সভাক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত হয়। নিম্নে তাঁহাদিগের নাম প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(বেঙ্গলী)

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর (লালগোলা)

„ „ প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (আসাম—গৌরীপুর)

কুমার „ শরদিন্দুনারায়ণ রায় (দিনাজপুর)

„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (খাগড়া, বহরমপুর)

„ কামিনীকুমার চন্দ (কাছাড)

„ ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (কালীপুর)

„ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (ময়মনসিংহ—গৌরীপুর)

„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (কলিকাতা)

„ যতীন্দ্রমোহন বাগচী (নদীয়া)

„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (কলিকাতা)

„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা)

ডাক্তার „ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (কোচবেহার)

„ খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন (ঢাকা)

„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা)

কুমার „ অরুণচন্দ্র সিংহ (কলিকাতা)

„ আশুতোষ চৌধুরী „

„ হেমচন্দ্র চৌধুরী (আমবাড়িয়া)

অনন্তর রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের প্রস্তাবে ও মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এম. এ. ডিএস্‌সি. সি, আই, ই, মহাশয় সভাপতি-পদে বরিত হইলেন। এই সময়ে চট্টগ্রামের নবীনকবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় ডাঃ বসু মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া যে "অর্ঘ্য" নামে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ("ঞ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

অনন্তর ডাক্তার বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া "বিজ্ঞানে সাহিত্য" বিষয়ক অভিভাষণ পাঠ করেন। ("ট" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

অতঃপর নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। সভাপতি মহাশয়কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা পরিগৃহীত হয়।

মৃতব্যক্তিগণের নাম।

(ক) স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন
(খ) „ চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ. বি, এল
(গ) „ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুর সি. আই, ই
(ঘ) „ শিশিরকুমার ঘোষ
(ঙ) „ ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি, এল
(চ) „ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
(ছ) „ দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র
(জ) „ মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ
(ঝ) „ রায় রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর
(ঞ) „ বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী
(ট) „ ধীরেন্দ্রনাথ পাল
(ঠ) „ গিরীশচন্দ্র সেন

তৎপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ভাগলপুরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বি এল মহাশয় গত ভাগলপুর অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের মুদ্রিত অংশ উপস্থিত করিয়া বলেন যে "বাঙ্গালার প্রান্তে প্রবাসী বাঙ্গালীগণের উৎসাহে ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার সফলতার প্রতি ভাগলপুরবাসীর বিশেষ সন্দেহ ছিল কিন্তু মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় এবং নানাদেশাগত মহানুভব সাহিত্যিকগণের সমবেত চেষ্টায় তাহা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার এই কার্য্য-বিবরণ পরিগৃহীত হইলে বাধিত হইব। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে এই কার্য্য-বিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অনন্তর রাজশাহী সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্. এ. বি, এল্ মহাশয় দ্বিতীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সংকল্পিত কার্য্যগুলির সম্বন্ধে বলেন,—"দ্বিতীয় সম্মিলন রাজশাহীতে হয়। বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সেবার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেবার সেখানে বৈজ্ঞানিক-প্রবন্ধেরই সংখ্যাধিক্য হইয়াছিল। কেহ কেহ সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞানের প্রাধান্য সহ্য করিতে পারেন না। সেজন্য তর্ক করিবার আবশ্যক নাই। সাহিত্যদ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন ও জাতীয়

চরিত্র গঠন করিতে হইলে, যে সকল বিষয়ের আলোচনায় তাহা হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য। গতপূর্ব্ববৎসর সাহিত্য-সম্মিলনে বাঙ্গালার মানবতত্ত্বালোচনার, বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি-নির্ণয়ের জন্য যে প্রস্তাব হয় এবং যাহার ভার সম্মিলন হইতে রাজশাহীবাসীর স্কন্ধেই প্রথমে দেওয়া হয়, তৎসম্পর্কে আমাদের ক্ষুদ্রশক্তিতে আমরা যাহা কিছু গত বৎসরে করিতে পারিয়াছিলাম, তাহার সবিস্তার বিবরণ গত বৎসর ভাগলপুরে উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। এ বৎসরও তাহার কার্য্য কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কোন্ কার্য্যের কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহার বিবরণ তত্তৎবিষয়সংক্রান্ত প্রবন্ধে এবং কার্য্যবিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পঠিত ও কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইলে, তাহা সকলের গোচরীভূত হইবে। অবশেষে আমার অনুরোধ—বাঙ্গালার মানবতত্ত্বালোচনা ও জাতিতত্ত্বালোচনা যে কেবল রাজশাহী জেলাতেই সংরুদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে। বর্ষে বর্ষে যেমন সম্মিলন বিভিন্ন জেলায় আহূত হইবে, তেমনি বর্ষে বর্ষে সেই সকল জেলায় এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় দুইটির আলোচনার ব্যবস্থা সম্মিলনের করিয়া আসা উচিত। গত পূর্ব্ববৎসরে যেমন রাজশাহীর উপর ভার দেওয়া হইয়াছে, এ বৎসর সেইরূপ ময়মনসিংহের প্রতি এ বিষয়ের অনুসন্ধান ও আলোচনার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। ময়মনসিংহ প্রাপ্তে আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সংযোগস্থল, এ স্থান ভাষা ও জাতির সংমিশ্রণ ভূমি—সুতরাং এই স্থানেই আবার ঐ সকল অনুসন্ধানের একটু বিশেষ উপযোগিতা আছে।”

অনন্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মিলনে সংকল্পিত অন্যান্য কার্য্যের বিবরণ প্রদান করিতে যাইয়া কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন—“রাজশাহী হইতেই সম্মিলনের উদ্দেশ্যমত কার্য্য করিবার কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজশাহীর উপর যে সকল কার্য্যভার দিয়া আসা হইয়াছিল, সেই সকল কার্য্যই আবার ভাগলপুরকে দেওয়া হয় এবং ভাগলপুরে গত বৎসরে কয়েকটি নূতন কার্য্যেরও ভার দেওয়া হয়। ভাগলপুর, গয়া প্রভৃতি বিহারের জেলাগুলি, প্রাচীন পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তিরাশিতে পরিব্যাপ্ত সুতরাং ঐ জেলায় প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য নূতন প্রস্তাব করিয়া আসা হয়। ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব এই তিন বিষয়েরই অনুসন্ধান এবং আলোচনার জন্য রাজশাহী ও ভাগলপুরে ভার দেওয়া হয়। রাজশাহী প্রত্নতত্ত্বের এবং জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিশেষ ভাবে

কার্য্য করিতেছেন। তাহার ফল এই সামান্য কালে এবং সামান্য উপায়ে যতটা হইয়াছে, তাহা তথাকার কার্য্যবিবরণে প্রকাশিত আছে। ভাগলপুরের উপর গত বৎসর সংক্রামক রোগাদির যেরূপ অত্যাচার গিয়াছে এবং সমস্ত কর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ শাখাপরিষদের সম্পাদকের ব্যক্তিগত যে সকল মহা মহা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাতে এ বৎসর আমরা সেখান হইতে খুব বেশী কার্য্যের আশা করিতে পারি না। তবে এইটুকু বলিয়া আমি আপনাদের আশ্বস্ত করিতে পারি যে তাঁহারা নিশ্চিন্ত নহেন। ন্যস্তকার্য্য যাহাতে তাঁহারা সুযোগ ও সুবিধার সহায়তায় আগামী বর্ষে কিছু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা সচেষ্ট আছেন। এখানে প্রত্যেক কার্য্যের তালিকা ধরিয়া তাহা পাঠে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত হইলে, আপনারা তাহা স্পষ্ট জানিতে পারিবেন। অবশেষে আপনাদিগকে আর একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সাহিত্য-সম্মিলনে দেশের হিতচিন্তক মনীষীবৃন্দ একত্র হইয়া যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, তাহা সংসাধন করিতে হইলে যেরূপ অভিজ্ঞ, কার্য্যকুশল, কৃতবিদ্য, কর্ম্মঠ লোকের প্রয়োজন, যে প্রণালীতে কার্য্য করা আবশ্যক, তজ্জন্য কর্ম্মিগণের যে পরিমাণ সময়, সুযোগ ও সুবিধা আবশ্যক এবং সর্ব্বোপরি তজ্জন্য যে পরিমাণ অর্থ আবশ্যক দেশে তাহার কোনই ব্যবস্থা নাই। এ সকল কার্য্য যে দেশের লোককেই করিতে হয়, সমস্ত বিষয়েই রাজানুগ্রহের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলে না, তাহা এখনও এ দেশের কৃতবিদ্য সমাজেও বুঝেন না। এ সকল কার্য্য করিতে যে একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সাধারণতঃ জীবিকার্জ্জন-কাতর বাঙ্গালী তাহার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে না। তাহার পর সাহিত্য-সম্মিলনের বয়সও মাত্র এই তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে,—এখনও ইহাতে দেশের কৃতবিদ্য সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতে পারেন নাই। যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারা কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতেছেন মাত্র, কিন্তু তৎসাধনের প্রণালী ও উপায় নির্দ্দেশ করিতে এখনও সমর্থ হন নাই, কাজেই বর্ষে বর্ষে বড় বড় গৌরব-জনক কার্য্যের প্রস্তাব হইলেও তাহার ফল অতি ক্ষীণভাবে অতি ক্ষুদ্রাকারে পাওয়া যাইতেছে। আপাততঃ আমাদের ইহাতেই সন্তুষ্টি লাভ করিতে হইবে, নতুবা দেশের সমস্ত অভাব, সমস্ত অভিযোগ ও সমস্ত বাধা একবারে অতিক্রম করিয়া সাধনার ও সফলতার দীপ্তিময় রাজ্যে উপস্থিত হইবার আশা করিলে, বেশী প্রতারিত হইতে হইবে। অতএব দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের সঙ্কল্পিত কার্য্যগুলির

বিবরণ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কার্য্যবিবরণে মুদ্রিত হইলে, আপনারা তাহাতে বিরক্ত না হইয়া ধৈর্য্য-সহকারে ভবিষ্যৎ-সফলতার আশায় অপেক্ষা করিবেন এইমাত্র অনুরোধ। একটা প্রবচন আছে—"আজিকে হল না বলে, ছেড়োনাকো হাল, আজিকে হল না বটে হতে পারে কাল।" আশাই উৎসাহের মূল, উৎসাহই অধ্যবসায়ের জনক, অধ্যবসায়ই সাধনার ভিত্তি। সাধনা করিয়া যান, ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।"

অনন্তর তৃতীয় সম্মিলনে প্রস্তাবিত রমেশচন্দ্র-সারস্বত-ভবন সম্বন্ধীয় কার্য্য কতদূর হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বিবৃত করেন। ব্যোমকেশ বাবু বলেন—"রমেশ-ভবন" সম্বন্ধে বড় সুখের সংবাদ শুনাইতে পারিব। এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বের মত নৈরাশ্যের ভয় নাই। ভাগলপুরে সমস্ত ভারতের কৃতবিদ্য এবং সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তিগণকে লইয়া রমেশ-ভবনের যে সমিতি গঠিত হয়, সেই সমিতির সভাপতি,—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এই সমিতি গতবৎসরে বরোদাধিপতি মহারাজ গায়কোয়াড়কে এই সমিতির পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। বরোদা রাজ্যের বর্ত্তমান জজ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়ের মধ্যস্থতায় শ্রীযুক্ত মহারাজ গায়কোয়াড় বাহাদুর আমাদের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, অধিকন্তু এই কার্য্যসম্পাদনের জন্য ৫০০০৲ টাকা নগদ পাঠাইয়াছেন, টাকাও আসিয়া পঁহুছিয়াছে। অতঃপর কাসিমবাজারের মাননীয় দানশীল মহারাজ বাহাদুর রমেশভবন নির্ম্মাণে যতটা জমীর আবশ্যক হইবে, ততটা জমী দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার কতিপয় বদান্য ব্যক্তি যে পরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের আর পাঁচ সহস্র টাকার সংস্থান হইয়াছে; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে যে মহাত্মার নামে এই সদনুষ্ঠানের সঙ্কল্প হইয়াছে, তাঁহার প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধাভক্তি প্রচুর আছে এবং তজ্জন্য আমাদের কার্য্যে কোন বাধা হইবে না। এদিকে রমেশ-ভবনে যে চিত্রশালা স্থাপনের সঙ্কল্প আছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার উপযুক্ত প্রাচীন মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন শিল্পজাত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙ্গালার মৃতসাহিত্যিকগণের লেখা, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, রচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি যাহা আর কোন চিত্রশালায় স্থান পায় না, তাহাও এখানে সুরক্ষিত হইবে। অবশেষে বক্তব্য এই যে এই সময়ে দেশের

অন্যত্র অন্যবিধ ব্যক্তির স্মরণার্থ মূর্ত্তি, ভবন, প্রভৃতি স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ চলিতেছে বলিয়া, রমেশভবনের কার্য্য এ বৎসর যে বড় বেশী অগ্রসর হইবে, তাহা আশা করিতে পারি না। তবে দানশৌণ্ড জমীদারকুল-নিসেবিত ময়মনসিংহে এবার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আসিয়াছি, এখানে বোধ হয় হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে না।”

অনন্তর তৃতীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে সম্মিলন-পরিচালনের জন্য যে নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় সভাস্থলে তাহার মুদ্রিত প্রতিলিপি বিতরণ করিয়া ঐ নিয়মাবলী পাঠ করিলে, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাহা সম্মিলনের পরিচালন জন্য গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করেন। বরিশালের শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় ২য় নিয়মের ৩য় পংক্তির শেষে “জ্ঞান” শব্দের পূর্ব্বে “সাহিত্যানুরাগ” শব্দ সংযোগ করিয়া দিতে বলেন। সভাপতি মহাশয় ও প্রস্তাবক মহারাজ বাহাদুর এই সংশোধন স্বীকার করিয়া লইলে, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের গৃহীত নিয়মাবলী—“ঠ” পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

অনন্তর সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমান সম্মিলনের ২য় ও ৩য় দিবসের আলোচ্য বিষয়াদির নির্দ্ধারণ জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তি-বর্গকে লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন করিয়া সকলকেই রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কাসিমবাজারের মহারাজের বাসভবন “আলেকজেণ্ডার কাসেলে” সমবেত হইতে অনুরোধ করেন।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সভ্যগণের নাম।

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু এম্, এ, ডি, এস্ সি, সি, আই, ই,
২। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
৩। ” ” সহকারী সভাপতিগণ
৪। ” ” সম্পাদকগণ
৫। ” ” কোষাধ্যক্ষ
৬। ” ” সহকারী সম্পাদকগণ
৭। স্থানীয় পরিষদের সভাপতি
৮। ” ” সহকারী সভাপতি
৯। ” ” সম্পাদক

১০। স্থানীয় পরিষদের সহকারী সম্পাদক
১১। মূল পরিষদের সম্পাদক
১২। „ উপস্থিত সহকারী সম্পাদকগণ
১৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল
১৪। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ
১৫। „ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ
১৬। „ গৌরহরি সেন (চৈতন্য লাইব্রেরী সম্পাদক)
১৭। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
১৮। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (কাসিমবাজার)
১৯। „ শশধর রায় এম, এ, বি, এল, (রাজশাহী)
২০। „ প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্, এম, এস (বগুড়া)
২১। „ মন্মথনাথ গুপ্ত বি, এল (ভাগলপুর)
২২। „ গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল (ভাগলপুর)
২৩। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ (গৌহাটী)
২৪। „ দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)
২৫। „ কর্ণেল মহিমচন্দ্র বর্ম্মা ঠাকুর (ত্রিপুরা)
২৬। „ কৈলাসচন্দ্র সিংহ (ত্রিপুরা)
২৭। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ঢাকা)
২৮। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল (ঢাকা)
২৯। „ অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী (ঢাকা)
৩০। মিঃ আর, কে, দাস ব্যারিষ্টার (ঢাকা)
৩১। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় (ফরিদপুর)
৩২। „ বীরেশ্বর সেন (নদীয়া)
৩৩। „ জলধর সেন (নদীয়া)
৩৪। „ বিনয়কুমার সরকার এম, এ (মালদহ)
৩৫। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ (চট্টগ্রাম)
৩৬ „ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় (রঙ্গপুর)
৩৭। „ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ (রঙ্গপুর)

৩৮। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ (জাতীয় শিক্ষা সমিতি, কলিকাতা)

৩৯। „ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল

৪০। „ হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী

৪১। „ শ্যামাচরণ রায় ময়মনসিংহ

৪২। „ অমরচন্দ্র দত্ত

অনন্তর ময়মনসিংহ কালীপুর-নিবাসী নবীন কবি শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গীত হইলে সন্ধ্যা ৭ ঘটীকার সময় প্রথম দিনের সভাভঙ্গ হয়।

মিশ্র ইমন-কল্যাণ।

তীর্থ আজি এ পুণ্য নগর
কমলা-বাণীর মিলনে,
বরষ এসেছে নব আশা নিয়ে
অবসাদ গেছে মরণে।
বাজুক তন্ত্রী বাণীর বীণার
অম্বর কাঁপি উঠুক ঝঙ্কার,
যাক্ জীবনের নিবিড় আঁধার
জ্ঞানের জ্যোৎস্না-কিরণে।
এসেছি মন্দিরে নিয়ে অর্ঘ্যভার
পরাণের প্রীতি ভক্তি-উপহার,
এস জীবনের সাধনা আমার
ব'স এ হৃদয় আসনে।

প্রথম দিনের বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি।

স্থান—মহারাজ-কুমারের "আলেকজাণ্ডার কাসল"—কাসিমবাজারের মহারাজের বাসগৃহ।

সময়—রাত্রি ৮৷৷০ টা হইতে ১২৷৷০ টা।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু,—সভাপতি

মহারাজ „ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাসিমবাজার)

„ „ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি)

কুমার „ জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, (মুক্তাগাছা)

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (কলিকাতা)

„ শশধর রায় (রাজশাহী)

„ প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত (রঙ্গপুর)

„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (কাসিমবাজার)

„ পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ (গৌহাটী)

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী (কলিকাতা)

„ বাণীনাথ নন্দী (কলিকাতা)

„ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল (গাঙ্গটীয়া)

„ হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী (সেরপুর)

বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (কালীপুর)

„ সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী (কৃষ্ণপুর)

„ হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)

„ অমরচন্দ্র দত্ত (ময়মনসিংহ)

„ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার (বেতাগড়ী)

„ কেদারনাথ মজুমদার প্রভৃতি

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইবে ও যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইবে, তাহা এই সভায় নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সভায় নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচী দ্বিতীয় দিবসের কার্য্যবিবরণের প্রারম্ভে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্থ অধিবেশন,—দ্বিতীয় দিন

২রা বৈশাখ ১৩১৮, ১৫ই এপ্রিল ১৯১১

পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা—১১টা, অপরাহ্ণ ৪টা—৪৷৹টা

কার্য্যসূচী

পূর্ব্বাহ্ণের কার্য্য-সূচী

১। সঙ্গীত

২। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা স্তোত্র,—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় বি, এ

৩। সাধারণ সঙ্কল্প।

৪। প্রস্তাব—১ম—দরিদ্র-সাহিত্যিক সংস্থান-ভাণ্ডার স্থাপন—প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী। সমর্থক—শ্রীযুক্ত জগদীশ-নাথ মুখোপাধ্যায় (রঙ্গপুর) ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (কলিকাতা)

৫। অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সহানুভূতি-সূচক টেলিগ্রামাদির মর্ম্মজ্ঞাপন।

৬। প্রবন্ধ পাঠ।

৭। সঙ্গীত।

অপরাহ্ণের কার্য্য-সূচী।

১। সঙ্গীত।

২। কবিতা—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস।

৩। অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সহানুভূতি-সূচক টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ।

৪। প্রবন্ধ পাঠ।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র উকিল ও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ধর কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার রচিত নিম্নে উদ্ধৃত সঙ্গীত গীত হয়।

ইমন-ভুপালী।

কমল-আসন-মূলে মিলি দলে দলে
(হেথা) অতিথি তোমারি,
আজি কুসুম-চন্দনে রচিয়া অঞ্জলি
(সবে) পূজার ভিখারী।
তব পুণ্য-পরশে পুলকিত বাজে বীণা
গাহে বন্দন-গাথা নানা ছন্দে,
ঝঙ্কারি উথলে গগনে গগনে
মহিমা তোমারি।
আজি বিজলি ঝলকে উৎসব অঙ্গনে
(এ যে) তোমারি নয়ন-জ্যোতিঃ,
যত রতন-ভূষণ সকলি তোমারি
সিঞ্চিত-চরণ-রেণু।
অযুত-কণ্ঠের গীতি-আরাধনা
লীন আজি তব রাজীব-চরণে,
আশীষ-সিঞ্চনে কর সঞ্জীবিত
সাধনা তোমারি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিলে পর স্বরচিত একটি বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করেন। ("ঙ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

তৎপরে সভাপতি মহাশয় যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত সাধারণ সঙ্কল্পগুলি সভায় গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত করেন।

(ক) বাঙ্গালার মানব-তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে আপাততঃ ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি, ব্যবসায়ভুক্ত জনগণের বংশ-হানির ও বংশ-বৃদ্ধির গতি এবং পুরুষানুক্রমে ব্যক্তিগত চরিত্রের বিকাশ পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(এই কার্য্যের ভার স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের সহকারী বিজ্ঞানাধ্যাপক মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল।)

(খ) বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ময়মনসিংহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণের জন্য ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা

হইতেছে এবং সংগৃহীত তথ্য আগামী বৎসরের সম্মিলনে উপস্থিত করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইতেছে।

(এই কার্য্যভারও স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের সহকারী-বিজ্ঞানাধ্যাপক মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল।)

(গ) বাঙ্গালাভাষার শব্দ-তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অংশে প্রচলিত বিবিধ প্রাদেশিক ভাষার সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি যোগের রূপ-ভেদ এবং নিকটবর্ত্তী বন্য-জাতির ভাষার যে সকল শব্দ এদেশের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলি সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিতে ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(এই সমস্ত সংগ্রহের ভার শ্রীমন্মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের উপর অর্পিত হইল।)

(ঘ) এই জেলার নিকটবর্ত্তী বন্যজাতিগুলির সর্ব্ববিধ তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(এই কার্য্যের ভারও শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের উপর অর্পিত হইল।)

(ঙ) ময়মনসিংহ হইতে পত্র-তত্ত্ব, ভৌগোলিক-তত্ত্ব, প্রাচীন শিল্পাদির বিবরণ ও উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(সাহিত্য-পরিষদের ময়মনসিংহ-শাখার সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইল।)

(চ) এই সকল প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য যে সকল ব্যক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভার গ্রহণ করিলেন, ময়মনসিংহের শাখা-পরিষৎ তাঁহাদিগকে আবশ্যকমত সাহায্য করিবেন এবং তাঁহারাও আবশ্যকমত উক্ত পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যসম্পন্ন করিবেন। সংগ্রহকারী মহোদয়গণকে এই সকল সংগৃহীত তত্ত্বের বিবরণ সাহিত্য-সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(ছ) ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে ভাগলপুরে "রমেশচন্দ্র-সারস্বত-ভবন" নামে যে সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যার্থ অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত ময়মনসিংহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া স্থানীয় সমিতি গঠিত হইল।

মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ, (সুসঙ্গ)
রাজা ,, জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)
,, ,, যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুর)
,, ,, মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)
মহারাজ-কুমার শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)
কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (গোলকপুর)
রায় বাহাদুর ,, রাধাবল্লভ চৌধুরী (সেরপুর)
,, ,, সতীশচন্দ্র চতুর্ধূরীণ (ভবানীপুর)
মাননীয় খাঁ বাহাদুর মৌলবী সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী (ধনবাড়ী)
,, শ্রীযুক্ত ওয়াজেদালী খাঁ পণি (করটীয়া)
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)
,, সুরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
,, বিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী
,, গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী
,, অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
,, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর)
,, ধরণীকান্ত লাহিড়া চৌধুরী (কালীপুর)
,, যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ,,
,, বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ,,
,, সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী (রুকুপুর)
,, বীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী (বাসাবাড়ী)
,, চারুচন্দ্র চৌধুরী (সেরপুর)
জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্, এ, বি, এল
,, গোপালদাস চৌধুরী (সেরপুর)
কুমার ,, শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী
,, নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
,, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)
,, কালীশঙ্কর গুহ (উকিল)
,, ব্রজনাথ বিশ্বাস (উকিল)

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ এম, এ, বি, এল
,, শ্যামাচরণ রায় (উকিল)
,, রেবতীশঙ্কর রায় বি, এল
,, সারদাচরণ ঘোষ এম, এ, বি, এল
,, মনোমোহন নিয়োগী বি, এ
,, সূর্য্যকুমার সোম বি, এ
,, রমেশচন্দ্র সেন বি, এল

কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (সম্পাদক)

(প্রয়োজন অনুসারে এই সমিতির সদস্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে)

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় (ক) হইতে (ছ) পর্য্যন্ত সাধারণ সঙ্কল্পগুলি পাঠ করিলে সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে সেগুলি গৃহীত হইল।

তৎপর শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

"দরিদ্র সাহিত্য-সেবীদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের সাহায্যার্থ ও তাঁহাদিগের পুস্তকাদি প্রকাশের সাহায্যার্থ "দরিদ্র-সাহিত্যিক-সংস্থান-ভাণ্ডার" নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপন করা হউক।"

এই প্রস্তাবের আনুকূল্যে প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় বলেন, যে এই দরিদ্র সাহিত্য-সেবীদিগের সাহায্য-ভাণ্ডারে আমি ১০০০৲ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিতেছি এবং আমার সম্পত্তি অক্ষুন্ন থাকিলে আমি আরও চারি সহস্র টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। এতদ্ব্যতীত আমার রচিত দশাননবধ-কাব্য নামক পুস্তকের স্বত্ব আমি এই সাহায্য-ভাণ্ডারে দান করিলাম। আমার তালুকের একখানা গ্রামের আয়ও আমি এই সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিতে প্রস্তুত রহিলাম।

রঙ্গপুর নিবাসী—শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—এই প্রস্তাবটি যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি উপকারী। প্রস্তাবকের উদ্দেশ্য জমীদার-ভূমি ময়মনসিংহে পরিপুষ্ট হইতে বিলম্ব হইবে না। কলিকাতায় "সাহিত্য-সম্মিলন" নামক সমিতি এই উদ্দেশ্যে বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গে আজ তাঁহাদের আশা মুকুলিত হইল।

প্রস্তাবকের সদ্দৃষ্টান্তও সকলের অনুকরণীয়। এই ভাণ্ডারের উপকারিতা এদেশে বিশেষ ভাবে অনুভূত হইবে।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলেন—আমি এই মূল্যবান্ প্রস্তাবের জন্য এবং ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য প্রস্তাবক মহাত্মাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমি নিজে এই সাহায্য-ভাণ্ডারে ২৫৲ টাকা নগদ ও আমার রচিত "কবি রজনীকান্তের জীবনী" গ্রন্থ ১০০ খণ্ড প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি।

সভাপতি মহাশয়ও প্রস্তাবককে তাঁহার এইরূপ সদনুষ্ঠানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন। সমবেত জনমণ্ডলীও তাঁহার এই সৎ-কার্য্যের জন্য ঘন ঘন করতালীদ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন ও আপনাদিগের আনন্দপ্রকাশ করেন।

অনন্তর যে সকল ব্যক্তি সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া টেলিগ্রাম বা পত্রদ্বারা সহানুভূতি জানাইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম সভাস্থলে পঠিত হয়। নিম্নে তাঁহাদিগের নাম প্রদত্ত হইল।

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর (নাটোর)
মাননীয় মহারাজ ,, গিরিজানাথ রায়বাহাদুর (দিনাজপুর)
,, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর)।
,, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)।
,, হেমচন্দ্র চৌধুরী—(আমবাড়িয়া)।
,, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মেসার্স এস ফ্রেণ্ড্স এণ্ড কোং কলিকাতা)।
,, আনন্দচন্দ্র রায় (ঢাকা)।
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (রঙ্গপুর)।

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

(ক) ময়মনসিংহে সাহিত্য-চর্চ্চা—
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম্, আর, এ এস্ (ময়মনসিংহ)

(খ) আধুনিক নাট্য-সাহিত্য—
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (কলিকাতা)

(গ) গবাদি পশু সম্বন্ধে কয়েকটী কথা—

লেখক—রাজা শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সিংহ (সুসঙ্গ)

পাঠক—মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ

(ঘ) আয়ুর্ব্বেদের ক্রম-বিকাশ—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন (ময়মনসিংহ)

(ঙ) পূর্ব্ববঙ্গের নদী পরিবর্ত্তন—

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় (ফরীদপুর)

(চ) পল্লীবিষয়ক ও পল্লীকথা—

লেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত (মালদহ)

পাঠক— শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।

(ছ) পারসী ও আরবী ভাষায় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে অক্ষরান্তরীকরণ—

মুন্‌শী মহম্মদ সহিদুল্লাহ্‌ বি, এ (২৪ পরগণা)

এই প্রবন্ধটি পঠিত হইলে পর মূল পরিষৎ এই প্রস্তাবসম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই যে সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন, সভাপতি মহাশয়ের আদেশে মূল পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় তাহ বিবৃত করিলেন। রাখাল বাবু বলিলেন,—"সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অবস্থায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার ইতিহাসগুলিতে মুসলমান বাদ্‌শাহ ও নবাবদিগের এবং মুসলমানের নামযুক্ত স্থানের নামগুলির বানানের একত্ব বিধান জন্য একটি প্রস্তাব করেন। সেই সম্পর্কে পরিষদে বহুদিন হইতে শব্দ সমিতিতে এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। তৎপূর্ব্বে ৺অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার ভারতবর্ষের "উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভূগোল গ্রন্থে এবিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পরিষদের শব্দ-সমিতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং কতিপয় আরবী-পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন মৌলবীর সাহায্যে এ বিষয়ের একটা নিয়ম সঙ্কলনের চেষ্টা করিতেছেন। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় একটা রীতি নির্দ্দেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন,—শব্দ-সমিতি তাহা অবলম্বনে বিচার-বিতর্কে লিপ্ত আছেন। যে সময়ে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে, পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে, সকলে তাহা জানিতে পারিবেন। মুন্‌শী সহিদুল্লাহ্‌ আজ মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে

এই প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া সাহিত্য-পরিষদের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনেক ছাত্রসভ্য তাঁহার এবিষয়ে উৎসাহ প্রশংসনীয় এবং পরিষদের চেষ্টার বিশেষ অনুকূল।"

(জ) মহাভারতের কাল ও জ্যোতিষিক প্রমাণ—

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার বি এ, (ময়মনসিংহ)

(ঝ) ব্যাকরণ-বিভীষিকা—

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ(কলিকাতা)

তৎপরে নিম্নোক্ত প্রবন্ধের লেখকদ্বয় উপস্থিত না থাকায় প্রবন্ধ দুইটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

(ঞ) ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি—

লেখক—শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু (ময়মনসিংহ)

(ট) পাণিনি—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম, এ (ঢাকা)

অতঃপর পুনরায় ৪টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে, জানাইয়া সভাপতি মহাশয় সভাভঙ্গ করেন।

দ্বিতীয় দিবস—অপরাহ্ণ

পূর্ব্বানুরূপ সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি-ক্রমে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

("চ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

এই দিন পূর্ব্বাহ্ণের সভায় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয় "ব্যাকরণ-বিভীষিকা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গ-ভাষায় যে সকল সাধারণ ভ্রম উপেক্ষার বশে চলিয়া যাইতেছে, তাহা সরল ও সরস ভাষায় জ্ঞাপন ও তাহা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন। ঐ প্রবন্ধের কোন কোন স্থানের ভাষা কোন কোন ব্যক্তি পীড়াজনক হইয়াছে বলেন, শুনিয়া প্রবন্ধলেখক তৎসম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া ইহা দিলে সকলেই প্রীতিলাভ করিবেন এবং তৎপরে সভার কার্য্যারম্ভ হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে জ্ঞান-বৃদ্ধ মহামহোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার ক্রম-বিকাশ" সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম ("গ" পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)।

অনন্তর নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে আগত সহানুভূতি-সূচক লিপি ও টেলিগ্রামের মর্ম পঠিত হয়।

ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (আর্য্যাবর্ত্ত সম্পাদক)
„ ব্রহ্মবাদী সম্পাদক (বরিশাল)
„ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (বালি)

তৎপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

(ক) অদ্বৈতবাদ ও স্পিনোজা—
শ্রীযুক্ত শশীমোহন বসাক এম, এ (ময়মনসিংহ)

(খ) বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গনারী—
শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত (ভারত-মহিলা-সম্পাদিকা)

'ভারত-মহিলার' সম্পাদিকা শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, এরূপ সভা-সমিতিতে বাঙ্গালী রমণীর প্রবন্ধ পাঠ এদেশে এই প্রথম, অতএব আমাদের সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া এই ঘটনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। তদনুসারে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করেন।

(গ) সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব—
শ্রীযুক্ত অবনীমোহন সেন সাহিত্য-বিশারদ (ঢাকা)

(ঘ) জাতীয় উৎকর্ষ—
শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল্

এই সময় সভাপতি মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে সভা-স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

(ঙ) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন—

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ (ত্রিপুরা)

পাঠক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

(চ) কালিদাসের কাব্যে বঙ্গ প্রভাব

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় বি, এ, (যশোহর)

(ছ) মাইকেল ফ্যারাডে—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ (গৌহাটী)

(জ) ময়মনসিংহের মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ-পত্র—

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী (ময়মনসিংহ)

(ঝ) সূতিকা গৃহ—ডাঃ প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস্ (বগুড়া)

এই সময় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে তাঁহার প্রস্তাবের মীমাংসা সভার শেষে হইবে বলিয়া তখনকার মত স্থগিত হয়। ইত্যবসরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশ-অনুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদের "উৎপত্তি ও বিস্মৃতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। (এতৎসংক্রান্ত প্রবন্ধ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর প্রথম দিনের অধিবেশনে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠনে যে সকল সভ্যের নাম প্রবাদ পড়িয়াছিল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবে সভাপতি মহাশয় সেই সকল ব্যক্তিকে ও অন্যান্য প্রস্তাবিত-নাম ব্যক্তিগণকে সেই সমিতিভুক্ত করিয়া লইয়া, তাঁহাদিগকে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় আলেকজাণ্ডার কাসেলে উপস্থিত হইয়া পর দিবসের সভার কার্য্যসূচী আলোচনা ও নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

দ্বিতীয় দিনের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি

স্থান—আলেকজাণ্ডার কাসেল।

রাত্রি ৯টা হইতে ১১॥০ টা

উপস্থিত,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু—সভাপতি

মাননীয় মহারাজা " মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" শশধর রায়
" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
" নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
" হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
" বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
পণ্ডিত " পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
" হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
" প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" কেদারনাথ মজুমদার প্রভৃতি

এই সভায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের উত্থাপিত আপত্তির সুমীমাংসা হইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে আরও কতকগুলি ব্যক্তির নাম গৃহীত হয়। সমস্ত নামই (ত) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব ও প্রবন্ধ গৃহীত হইবে, তাহা এই সভায় নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সভার নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচী তৃতীয় দিবসের কার্য্য-বিবরণের প্রারম্ভে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্থ অধিবেশন,—তৃতীয় দিন

৩রা বৈশাখ ১৩১৮, ১৬ই এপ্রিল ১৯১১

পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা—১২টা

কার্য্যসূচী

১। সঙ্গীত।

২। কবিতা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, কলিকাতা।

৩। প্রস্তাব :—(১ম) ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (ময়মনসিংহ)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত (বগুড়া)

ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রধর শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত (ময়মনসিংহ)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ (কলিকাতা)।

(২য়) বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে অন্যান্য সমুন্নত ভাষার সাহিত্য হইতে গ্রন্থ রচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করাইবার নিমিত্ত ভাণ্ডার স্থাপন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ (মালদহ)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাসিমবাজার)

„ জলধর সেন (নদীয়া)

„ সুরেন্দ্রনাথ সেন বি এ (বরিশাল)

„ দেবকুমার রায় চৌধুরী

অনুমোদক—„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ (কলিকাতা)

(৩য়) সাহিত্য-সম্মিলনের নূতন নিয়মানুসারে আগামী বর্ষের নিমিত্ত সম্মিলনের সাধারণ-সমিতি গঠন।—প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্ (রাজসাহী)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র বর্ম্মা ঠাকুর (ত্রিপুরা)

অনুমোদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ঢাকা)

কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের-রচিত প্রথম দিনের সঙ্গীতটিই শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা গীত হইলে, সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় "সম্মিলন" নামক একটী কবিতা পাঠ করেন। ("থ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অতি সুললিত ভাষায় যুক্তি দেখাইয়া প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

বগুড়াবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত ও ময়মনসিংহনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রধর শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ ওজস্বিনী ভাষায় নানা যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ (কলিকাতা)

রাখাল বাবু বলেন,—স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ময়মনসিংহ শেরপুরবাসী হইলেও, সমগ্র ভারতের পূজ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও বরণীয় ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পরই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে তাঁহার বিয়োগবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশের নিমিত্ত একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব করা হয় এবং কিরূপে তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন রক্ষা করা হইবে, তাহা নিরূপণের জন্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্‌সি প্রমুখ মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি এই সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যের ব্যস্ততায় কোন কাজ করিতে পারেন নাই। এখান হইতে আমরা ফিরিয়া গিয়াই এই সমিতির কার্য্যে মন দিব এবং যেরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা এখানকার সমিতিকে জ্ঞাপন করিব।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব,—

বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সমুন্নত ভাষার ন্যায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণদ্বারা উপযুক্ত উপায়ে বিবিধ শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করাইবার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

মালদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, এই প্রস্তাব সভায় উপস্থানপূর্ব্বক ইহার সারবত্তা বুঝাইয়া একটি অতীব যুক্তিপূর্ণ এবং সারবান্ বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্ম "দ" পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল

মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও বরিশাল-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি এ, এবং শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়গণও নানা যুক্তি দ্বারা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। মহারাজ বাহাদুর বহরমপুর কলেজের অধ্যাপকগণদ্বারা এ কার্য্য একবারে আরম্ভ করাইয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। শ্রোতৃবর্গ ইহাতে মহা উৎসাহ দেখাইয়া ঘন ঘন করতালীদ্বারা মহারাজকে অভিনন্দন করেন

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদনে কেবল অনুবাদ দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টি কতটা হইতে পারে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে যাইয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম "ধ" পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

অনন্তর নিম্নলিখিত অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সহানুভূতি-সূচক পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করা হয়:

শ্রীযুক্ত এ, এফ্, এস্ আবদুল আজিজ এম্ এ এফ্ আর, এস্, এফ্, এফ্ আর, এইচ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

দেওয়ান আজিম চাঁদ খাঁ (জঙ্গলবাড়ী)

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মৈত্র এম্ এ, (অধ্যাপক)

তৎপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়;—

(ক) অন্ন-সংস্থান—

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ন্যাসানাল কলেজ

(খ) আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন—

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ (রাজশাহী কলেজ।)

(গ) বৃক্ষের সহিত ভূমির উর্ব্বরতার সম্বন্ধ—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, (প্রেসিডেন্সী কলেজ)

(ঘ) বাঙ্গালা ও দ্রাবিড় ভাষার সাদৃশ্য—

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলী)

(ঙ) ভাষা শিক্ষার সহজ উপায়—

শ্রীযুক্ত বিভুচরণ বটব্যাল বি, এল (ময়মনসিংহ)

(চ) ময়মনসিংহে প্রথম মুসলমান প্রবেশ—

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস (ময়মনসিংহ)

সময়াভাবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

(ছ) বঙ্গভাষা (কবিতা)—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ)

(ছ) খাদ্যের অভিব্যক্তি—

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি, বি, এল (কলিকাতা)

(ঝ) পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ভাষা—

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার বি, এ (ময়মনসিংহ)

(ঞ) অর্থকরী উদ্ভিদ বিদ্যা—

শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন বি, এ, বি, এসসি, (কলিকাতা)

(ট) বৈচিত্র্যে একতা—

ডাঃ প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস (বগুড়া)

(ঠ) দেশীয় কল—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ (কটক)

(ড) ইতিহাস, বিজ্ঞান ও মানব জাতির আশা—

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ (মালদহ)

(ঢ) শব্দের শক্তি—

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী (কলিকাতা)

(ণ) নাট্য-শিল্প—

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী (কলিকাতা)

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যো-

পাধ্যায় এম্, এ মহাশয় বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রতি শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষর পরিবর্ত্তনের নমুনা প্রদর্শন পূর্ব্বক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম "ন" পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

তৎপরে তৃতীয় প্রস্তাব—

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল মহাশয় উপস্থাপিত করিলেন,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নব-গঠিত নিয়মানুসারে আগামী বর্ষের "সাধারণ সম্মিলন-সমিতি" গঠনের জন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সদস্ত নির্ব্বাচিত করা হইল। ইঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে দশজন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি গঠন জন্য মূল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে প্রেরণ করিবেন।

সদস্তের নাম—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এম্, এ, ডিএসসি, সি, আই, ই
(বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি)

২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম বর্ষের সভাপতি)

৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এসসি, পি, এইচ, ডি
(২য় বর্ষের সভাপতি)

৪। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি এল্ (৩য় বর্ষের সভাপতি)

৫। মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ (সুসঙ্গ)

৬। রাজা " যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুর)

৭। " " জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)

৮। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর)

৯। " গোবিন্দচন্দ্র দাস।

১০। " অমরচন্দ্র দত্ত।

১১। " অক্ষয়কুমার মজুমদার এম, এ, বি, এল্

১২। " কেদারনাথ মজুমদার এম, আর, এ, এস্ ময়মনসিংহ
(শাখাপরিষদের সম্পাদক)

১৩। মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

১৪। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ " বোধিসত্ত্ব সেন এম, এ, বি, এল্
মুর্শিদাবাদের শাখা-পরিষদের সম্পাদক

১৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ
১৭। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল
১৮। " শশধর রায় এম্, এ, বি, এল

রাজসাহীশাখা-পরিষদের সম্পাদক

১৯। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
২০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের সম্পাদক

২১। মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ (ভাগলপুর)
২২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল্,

ভাগলপুরশাখা-পরিষদের সম্পাদক

২৩। কুমার শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী
২৪। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র বীরভূম

বীরভূম সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক

২৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন
২৬। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী
২৭। " কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল্ (ঢাকা)
২৮। " যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ঢাকা)
২৯। " রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ (বগুড়া)
৩০। " প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস (বগুড়া)
৩১। মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর)
৩২। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ (দিনাজপুর)
৩৩। রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল
৩৪। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ (যশোহর)
৩৫। " দেবকুমার রায় চৌধুরী
৩৬। " নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, বি, এল (বাখরগঞ্জ)
৩৭। " রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল (মালদহ)
৩৮। পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
৩৯। কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বর্ম্মা ঠাকুর
৪০। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ (ত্রিপুরা)
৪১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর বিদ্যারত্ন

৪২। মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম)
৪৩। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ
৪৪। " মুন্সী আবদুল করিম (চট্টগ্রাম)
৪৫। " জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (কাটোয়া) বর্দ্ধমান
৪৬। " শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালনা) ঐ
৪৭। " প্রসন্নকুমার বসু নদীয়া
৪৮। " বীরেশ্বর সেন ঐ
৪৯। " পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ (গোহাটী)
৫০। " অম্বিকাচরণ মজুমদার বি এল্ (ফরিদপুর)
৫১। " মধুসূদন জানা (মেদিনীপুর)
৫২। " কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিএল্ (বাঁকুড়া)
৫৩। " রাধাকান্ত আইচ (নওয়াখালী)
৫৪। " ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য (শ্রীহট্ট)
৫৫। " যোগেশচন্দ্র রায় এম্,এ (কটক)
৫৬। " নগেন্দ্রনাথ সেন বি,এ, (খুলনা)
৫৭। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া)
৫৮। " বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (হুগলী)
৫৯ " যদুনাথ সরকার এম্ এ (বাঁকীপুর)
৬০। " যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি,এ, (হাজারীবাগ)
৬১। " দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী (পাবনা
৬২। " পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্,এ, (২৪ পরগণা)
৬৩। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ, (সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর বর্ম্মা (ত্রিপুরা)

অনুমোদক " যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ঢাকা)

অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ ময়মনসিংহবাসীর পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়, মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং উপস্থিত প্রতিনিধি-বর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, ময়মনসিংহের শিক্ষা-প্রচার সম্পাদক মৌলবি মোসলেমউদ্দিন আহাম্মদ, শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা) শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর পত্রনবিশ বিএল্, মৌলবী আবদুল জব্বর, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এম্,এ, বি, এল্,

ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার তাহা সমর্থন করেন এবং উপস্থিত জনমণ্ডলী তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করেন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্‌, এ, মুন্সী সাহিতুল্লা বিএ, শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস (ব্যারিষ্টার) ও মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে ময়মনসিংহবাসীকে ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে অভ্যর্থনা ও পরিচর্য্যার সুশৃঙ্খলা, এবং কার্য্য-কুশলতার জন্য ধন্যবাদ করেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী তৎপরে এইরূপ সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌, এ বিএল্‌, বেদান্তরত্ন মহাশয় সম্মিলনের উদ্দেশ্য, কর্ত্তব্য ও আশার কথা ব্যাখ্যা করিয়া অভ্যাগতগণের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ বিদায় গ্রহণ করেন।

অতঃপর আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলনের স্থান স্থির না হওয়ায় স্থির করা হইল যে, সাধারণ সম্মিলন সমিতি তিন মাসের মধ্যে পঞ্চম অধিবেশনের স্থান নির্দ্ধারণ করিবেন। সভাপতি মহাশয় ইহা বিজ্ঞাপিত করিলে, বেলা ১২ ঘটিকার সময় চতুর্থ সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য পরি-সমাপ্ত হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার
সম্মিলনী সম্পাদক।

ময়মনসিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনের

আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

আয়।

১।	সম্মিলনের সাহায্যার্থ প্রাপ্ত দান	৪৮৬০৸৵০
২।	প্রদর্শনীর প্রবেশ-টিকেট বিক্রয়-লব্ধ	৩৩৯৲
৩।	ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে প্রাপ্ত সাহায্য	২২৭৲
৪।	উদ্বৃত্ত জিনিসাদি বিক্রয় লব্ধ	৯৪৸৵৯
		৫৫২৯৸৯

কৈফিয়ৎ—

আয়	... ...	৫৫২৯৸৯
ব্যয়	... ...	৪৯২১৸৵৩
		৬০৭৸৵৬

বিতং—

কোষাধ্যক্ষ নিকট আমানং ...	৬০২৸৵০
হাওলাত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫৴৬

ব্যয়।

১।	সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ, আলোক ও সজ্জীকরণ প্রভৃতি		১১৩৯।৶০
২।	রাস্তা মেরামত, ভিস্তি ইত্যাদি		৬২৲
৩।	প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থান প্রভৃতি		১৫৩৪৸/০
	(ক) খাদ্য সামগ্রী	১০২৩।৶০	
	(খ) আসবাব পত্র, পাচক ও চাকরের বেতন ইত্যাদি	৫১১।৵০	
		১৫৩৪৸/০	
৪।	ডাক ও টেলিগ্রাম		২৬৪৸৶০
	(ক) ডাক	১৭৬৷৶	
	(খ) টেলিগ্রাম	৮৮।/৬	
		২৬৪৸৶০	
৫।	যাতায়াত ব্যয়, কুলি ইত্যাদি		৭৪৬৷৶৬
	(ক) রেল ষ্টীমার ভাড়া ইত্যাদি	৫৭৲৩	
	(খ) ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১৬৪৷৶৬	
	(গ) কুলি	১০৫।৶৯	
	(ঘ) গরুর গাড়ী ভাড়া	২২৷০	
		৪৪৬৷৶৬	
৬।	মুদ্রণ ব্যয়		১৭১৸৯
৭।	আফিস ও ষ্টেশনারী		৪১৩৸৶৩
	(ক) আফিস	২৫৫৷৶৩	
	(খ) ষ্টেশনারী	১৫৮৶০	
		৪১৩৸৶৩	
৮।	প্রদর্শনী		৭০৯৷/৩
৯।	ডাক্তার বসুর বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক ক্রিয়া প্রদর্শন ব্যয়		১৩৭।৴
১০।	বিবিধ		৪১।৴
			৪৯২১৸৶৩

মন্তব্য।—(১) তহবিলের টাকা হইতে মং ২৫০৲ দুই শত পঞ্চাশ টাকা প্রয়োজনীয় পুরস্কার বিতরণে ব্যয়িত হইবে। বাকী টাকা সম্মিলনের কার্য্য বিবরণ মুদ্রণে ব্যয়িত হইবে।

(২) সম্মিলনের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হইল। চাঁদা-দাতাগণ মধ্যে যিনি জমা ও খরচের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি সম্মিলনের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের নিকট তাঁহার ময়মনসিংহস্থ বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলে অবগত হইতে পারিবেন। ইতি—

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী—কোষাধ্যক্ষ। শ্রীঅভয়চন্দ্র দত্ত—অডিটার।
শ্রীহেমাঙ্গমোহন ঘোষ—একাউণ্টেণ্ট। শ্রীরেবতীশঙ্কর রায়, শ্রীসূর্য্যকুমার সোম, শ্রীরমেশচন্দ্র সেন ও শ্রীকেদারনাথ মজুমদার—সম্পাদক।

(ক) পরিশিষ্ট।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
২। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়, বি, এল,
৩। ,, শ্যামাচরণ রায়
৪। ,, মনোমোহন নিয়োগী, বি, এল,
৫। ,, কালীশঙ্কর গুহ
৬। ,, মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ডিঃ মাঃ
৭। ,, মৌলবি জাহিরুদ্দিন আহাম্মদ
৮। ,, অনাথবন্ধু গুহ, বি, এল,
৯। ,, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ,
১০। ,, গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (হেডমাষ্টার)
১১। ,, শরচ্চন্দ্র পাল, বি, এ,
১২। ,, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ,
১৩। ,, রজনীচন্দ্র পাল, এম, এ,
১৪। ,, শশীমোহন বসাক, এম, এ,
১৫। ,, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ,
১৬। ,, নবকান্ত গুহ
১৭। ,, মৌলবি জৈজুর রহমান
১৮। ,, পণ্ডিত কিশোরীমোহন কাব্যতীর্থ।
১৯। ,, ,, দীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ
২০। ,, নিশিকান্ত ঘোষ, বি, এল,
২১। ,, সারদাচরণ ঘোষ, এম, এ, বি, এল
২২। ,, রেবতীশঙ্কর রায় বি, এল,
২৩। ,, রেবতীমোহন গুহ, এম,এ, বি, এল,

২৪। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায়, এম, এ, বি, এল,
২৫। " যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি, এ,
২৬। " নবীনচন্দ্র নাগ, বি, এল,
২৭। " প্রসন্নকুমার গুহ, বি, এল
২৮। " সারদাচরণ বিদ্যানিধি
২৯। " কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০। " পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ
৩১। " হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
৩২। " গিরিশচন্দ্র বসু
৩৩। " কৃষ্ণকুমার রায়
৩৪। " মৌলবি মহম্মদ ইছমাইল, বি, এল,
৩৫। " চন্দ্রকান্ত লাহিড়ী, এম, এ, বি, এল,
৩৬। " প্যারীমোহন কবীন্দ্র
৩৭। " হরানন্দ গুপ্ত
৩৮। " নগেন্দ্রকুমার মজুমদার
৩৯। " বৈদ্যনাথ রায়
৪০। " রামচন্দ্র সেন
৪১। " নগেন্দ্রচন্দ্র সেন, বি, এ,
৪২। " শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
৪৩। মিঃ কে, সি, নাগ
৪৪। মিঃ সিঃ দাস
৪৫। শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্ত্তী
৪৬। " হেমাঙ্গমোহন ঘোষ
৪৭। মিঃ জে, এম, দাস, এম, বি,
৪৮। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মজুমদার, বি, এ,
৪৯। " বৈকুণ্ঠনাথ সোম, বি, এল,
৫০। " ব্রজনাথ বিশ্বাস
৫১। " পণ্ডিত শিবচন্দ্র কাব্যতীর্থ
৫২। " ব্রজগোপাল বসু
৫৩। " গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন

৫৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরীন্দ্রচন্দ্র বেদান্তরত্ন
৫৫। ,, কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়
৫৬। ,, আনন্দহরি বসাক
৫৭। ,, করুণাকুমার দাস গুপ্ত
বি, এ ; এম, আর, এ, এস,
৫৮। ,, পণ্ডিত রমণীমোহন কাব্যতীর্থ
৫৯। ,, যামিনীকিশোর রায়, এম, এ, বি, এল,
৬০। ,, অক্ষয়কুমার মজুমদার, এম,এ, বি,এল,
৬১। ,, দক্ষিণাপ্রসাদ বসু. বি, এ,
৬২। ,, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, বি, এ,
৬৩। ,, রমেশচন্দ্র সেন, বি, এল,
৬৪। ,, সূর্য্যকুমার সোম, বি, এল,
৬৫। ,, মধুসূদন সরকার, এম. এ, বি, এল,
৬৬। ,, হৃদয়নাথ বসু
৬৭। ,, উপেন্দ্রচন্দ্র রায়
৬৮। ,, দীনেশচন্দ্র বসু
৬৯। ,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী, এম, এ, বি, এল,
৭০। ,, পরমেশপ্রসন্ন রায়, বি. এ,
৭১। ,, বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
৭২। ,, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি, এল,
৭৩। ,, রাজেন্দ্রকুমার উকিল, বি. এল,
৭৪। ,, বসন্তকুমার আইচ, বি, এল.
৭৫। ,, শরচ্চন্দ্র গোস্বামী
৭৬। ,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৭৭। ,, গিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৭৮। ,, অভয়চন্দ্র দত্ত
৭৯। ,, হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল,
৮০। ,, তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৮১। ,, জগদীশচন্দ্র গুহ
৮২। ,, অনাদিনাথ মিত্র (ইঞ্জিনিয়ার)

৮৩। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন
৮৪। ,, সুরেন্দ্রনাথ সেন
৮৫। ,, কামিনীকমল সেন
৮৬। ,, বিহারীলাল রায়
প্রভৃতি।

মফঃস্বল।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, বি, এ,
২। ,, কমলকৃষ্ণ সিংহ
৩। ,, রাজা প্রমোদচন্দ্র সিংহ, বি, এ,
৪। ,, ,, শিবকৃষ্ণ সিংহ
৫। ,, ,, যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
৬। ,, ,, মন্মথনাথ রায় চৌধুরী
৭। ,, ,, জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
৮। ,, কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
৯। ,, ,, শৌরীন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
১০। ,, সুধীন্দুনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
১১। ,, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
১২। ,, বিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী
১৩। ,, বিধুভূষণ আচার্য্য চৌধুরী, বি,এ.
১৪। ,, সতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
১৫। ,, হরদাস আচার্য্য চৌধুরী
১৬। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
১৭। ,, অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
১৮। ,, রমেশচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী
১৯। ,, প্রিয়কুমার আচার্য্য চৌধুরী
২০। ,, সুরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুর
২১। ,, কিরণচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী
২২। ,, গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী

২৩। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
২৪। " কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
২৫। " সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী
২৬। " রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চতুর্ধুরিণ
২৭। " ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
২৮। " প্রমদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
২৯। " বীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী
৩০। " উপেন্দ্রকিশোর চৌধুরী
৩১। " নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
৩২। " হেমচন্দ্র চৌধুরী
৩৩। " হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী
৩৪। " প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
৩৫। " যোগেশচন্দ্র ঘোষ
৩৬। " পূর্ণচন্দ্র সেন
৩৭। " ওয়াজেদ আলী খাঁ পানি
৩৮। " যামিনীনাথ রায় চৌধুরী
৩৯। " খান বাহাদুর নবাবআলী চৌধুরী
৪০। " " দেওয়ান আবদুল আলিম
৪১। " বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য
৪২। " নীলকমল ভট্টাচার্য্য
৪৩। " প্রসন্নকুমার বসু
৪৪। " রামপ্রাণ গুপ্ত
৪৫। " রসিকচন্দ্র বসু
৪৬। " হেমচন্দ্র ঘোষ, বি, এল.
৪৭। " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম, এ,
৪৮। " দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, এম,এ, বি, এল,
৪৯। " গোপালদাস চৌধুরী এম, এ,
৫০। " রায় চারুচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর.
৫১। " বি, এল, চৌধুরী, বি,এ, ডি-এস্-সি,
৫২। " রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর

৫৩। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু
৫৪। ,, সুধাংশুমোহন বসু (Bar-at-Law)
৫৫। ,, সারদারঞ্জন রায়, এম. এ,
৫৬। ,, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল
৫৭। ,, কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী
৫৮। ,, সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী
৫৯। ,, প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী
৬০। ,, যোগেশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী
৬১। ,, দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন
৬২। ,, হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
৬৩। ,, রাজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
৬৪। ,, গিরীশনারায়ণ মজুমদার
৬৫। ,, মোহিনীমোহন মজুমদার
৬৬। ,, দুর্গাদাস রায় চৌধুরী
৬৭। ,, দেওয়ান আলিম দাদ খাঁ
৬৮। ,, ,, আজিম দাদ খাঁ
৬৯। ,, মৌলবি মছলে উদ্দিন আহাম্মদ
৭০। ,, অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চৌধুরী
৭১। ,, রাজচন্দ্র রায়, বি. এল.
৭২। ,, রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী
৭৩। ,, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৭৪। ,, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৭৫। ,, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৭৬। ,, শশীভূষণ তালুকদার
৭৭। ,, মহেশচন্দ্র সেন
৭৮। ,, দেবেন্দ্রনাথ সেন
৭৯। ,, যোগেশচন্দ্র সেন
৮০। ,, বিপিনবিহারী চাকলাদার
৮১। ,, কৃষ্ণসুন্দর ভূঞা
৮২। ,, কৃষ্ণকিশোর রায়

৮৩। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়
৮৪। ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র অধিকারী
৮৫। ,, প্যারীমোহন রায় চৌধুরী
৮৬। ,, হেমচন্দ্র ভৌমিক
৮৭। ,, কামিনীমোহন ভৌমিক
৮৮। ,, যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৮৯। ,, পার্ব্বতীচন্দ্র চৌধুরী
৯০। ,, কৈলাসচন্দ্র নাগ
৯১। ,, বিজয়চন্দ্র নাগ
৯২। ,, দেবেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
৯৩। ,, হরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার
৯৪। ,, রজনীকান্ত চৌধুরী
৯৫। ,, প্রসন্নকুমার মজুমদার
৯৬। ,, ঈশ্বরচন্দ্র গুহ
৯৭। ,, কালীকৃষ্ণ ঘোষ
৯৮। ,, রমেশচন্দ্র সরকার
৯৯। ,, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১০০। ,, আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস
১০১। ,, অমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১০২। ,, হরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার
১০৩। ,, শশীমোহন দে, বি, এল,
১০৪। ,, প্রকাশচন্দ্র রায়, এম,এ. বি,এল,
১০৫। ,, অক্ষয়কুমার সেন, বি, এ,
১০৬। ,, নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়
১০৭। ,, নগেন্দ্রমোহন দে
১০৮। ,, কালীকুমার মিত্র (ডাক্তার)
১০৯। ,, প্রকাশচন্দ্র দত্ত
১১০। ,, তারকনাথ রায়
১১১। ,, মহিমচন্দ্র দে
১১২। সেক্রেটারী, বার লাইব্রেরী, টাঙ্গাইল

১১৩। সেক্রেটারী, বার লাইব্রেরী, জামালপুর
১১৪। ,, ,, ,, পিংনা
১১৫। ,, ,, ,, সেরপুর
১১৬ ,, ,, ,, ঈশ্বরগঞ্জ
১১৭। ,, ,, ,, নেত্রকোনা
১১৮। ,, ,, ,, কিশোরগঞ্জ
১১৯ ,, ,, ,, বাজিতপুর

অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মচারিগণ।

সভাপতি

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বি-এ।

সহকারী সভাপতি

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
মাননীয় খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

সম্পাদকগণ

কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
কুমার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম-এ, বি-এল,
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত শারদাচরণ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্
শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, বি-এল,
শ্রীযুক্ত রেবতীশঙ্কর রায়, বি-এল,
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম, বি-এল,
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন, বি-এল,
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, এম, আর, এ, এস

কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সভ্য।

১। মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বি, এ—সভাপতি
২। রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী——সহকারী সভাপতি
৩। কুমার ,, উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ,,
৪। মাননীয় খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ নবাবআলী চৌধুরী ,,
৫। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ,,
৬। ,, প্রথমনাথ রায় চৌধুরী ,,
৭। ,, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ,,
৮। ,, কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী——সম্পাদক
৯। ,, ,, শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ,,
১০। ,, সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী ,,
১১। ,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী, এম, এ, বি, এল ,,
১২। ,, হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ,,
১৩। ,, হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী ,,
১৪। ,, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,,
১৫। ,, সারদাচরণ ঘোষ, এম, এ, বি, এল ,,
১৬। ,, মনোমোহন নিয়োগী, বি, এল, ,,

১৭। শ্রীযুক্ত রেবতীশঙ্কর রায়, বি. এল, সম্পাদক
১৮। ,, সূর্য্যকুমার সোম, বি. এল. ,,
১৯। ,, রমেশচন্দ্র সেন, বি. এল, ,,
২০। ,, কেদারনাথ মজুমদার, এম, আর, এ, এস, ,,
২১। ,, বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী— কোষাধ্যক্ষ
২২। ,, কালীশঙ্কর গুহ
২৩। ,, শ্যামাচরণ রায়
২৪। ,, শ্রীনাথ রায়
২৫। ,, ব্রজনাথ বিশ্বাস
২৬। ,, বৈকুণ্ঠনাথ সোম
২৭। ,, হেমাঙ্গমোহন ঘোষ
২৮। ,, নিশিকান্ত ঘোষ
২৯। ,, বৈদ্যনাথ রায়
৩০। ,, গিরীশচন্দ্র কবিরত্ন
৩১। ,, শ্রীনাথ চন্দ
৩২। ,, মৌলবি মহম্মদ ইছমাইল, বি. এল,
৩৩। ,, সভাপতি—সাহিত্য-পরিষৎ (ময়মনসিংহ শাখা)
৩৪। ,, বাবু মনোমোহন সেন
৩৫। ,, অক্ষয়কুমার মজুমদার
৩৬। ,, মধুসূদন সরকার, এম. এ. বি. এল,
৩৭। ,, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি. এল.
৩৮। ,, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৩৯। ,, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৪০। ,, দীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ
৪১। ,, মোহিনীশঙ্কর রায়
৪২। ,, অবিনাশচন্দ্র রায়
৪৩। ,, নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
৪৪। ,, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
৪৫। ,, অভয়চন্দ্র দত্ত—অডিটার

'খ'—পরিশিষ্ট

অভ্যাগত প্রতিনিধি ও সাহিত্যিকগণ।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, (কলিকাতা)
,, গৌরহরি সেন ঐ
,, শশধর রায়, এম্ এ, বি, এল্ (রাজসাহী)
,, পঞ্চানন নিয়োগী, এম্ এ, (রাজসাহী)
,, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত, বি, এ, (কলিকাতা)
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, ঐ
,, আনন্দনাথ রায়—ফরিদপুর
,, রবীন্দ্রনাথ সেন—কলিকাতা
,, বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত
,, মন্মথনাথ দাস গুপ্ত—ভাগলপুর
,, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ
,, মদনগোপাল নিয়োগী
,, বনওয়ারিলাল গোস্বামী
,, প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত (বগুড়া)
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ (রঙ্গপুর)
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় (রঙ্গপুর)
,, ললিতমোহন পাল
,, শশীকান্ত সেন গুপ্ত
,, উমেশনাথ ভট্টাচার্য্য
,, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ,(কলিকতা)
,, বাণীনাথ নন্দী (কলিকাতা)
,, পশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র (কলিকাতা)
,, বিনোদবিহারী গুপ্ত ঐ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়. এম, এ (গৌহাটী)
,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য. এম, এ, (কলিকাতা)
,, জিতেন্দ্রনাথ রায়
,, মনোরঞ্জন গুপ্ত
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ঢাকা)
,, কুমারশঙ্কর গুপ্ত
,, সুরেন্দ্রনাথ বল্লভ
,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম.এ. (কলিকাতা)
,, পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ঐ
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, ঐ
,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ
,, রামকমল সিংহ (কলিকাতা)
,, সতীন্দ্রসেবক নন্দী ঐ
,, যতীন্দ্রকুমার বসু
,, বঙ্কুলাল বিশ্বাস (চাঁদপুর)
,, যতীন্দ্রমোহন সিংহ
,, শরচ্চন্দ্র দে
,, অবনীকান্ত সেন (ঢাকা)
,, প্রফুল্লচন্দ্র সেন (ঢাকা)
,, সুধীরচন্দ্র সেন (ঢাকা)
,, ভুবনমোহন দাস গুপ্ত, বি, এ, (ঢাকা)
,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (চট্টগ্রাম)
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ (চট্টগ্রাম)
,, কালীশঙ্কর সেন ঐ
,, রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী (শ্রীহট্ট)
,, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
,, নগেন্দ্রনাথ নিয়োগী
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ, "সেবক" (ঢাকা)
,, কামিনীকুমার সেন, এম, এ, বি এল, (ঢাকা)
,, বীরেশ্বর সেন (কৃষ্ণনগর)

শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ সহিদুল্লাহ্, এম্ এ, (কলিকাতা)

,, নগেন্দ্রকুমার চন্দ (ঢাকা)

,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন (কলিকাতা)

,, নিশিকান্ত ঘোষ (কৃষি-সমাচার)

,, গিরিজাকান্ত ঘোষ (ঢাকা)

,, রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় (ঢাকা-প্রকাশ)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ঢাকা)

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ

,, রাজেন্দ্রচন্দ্র আম্বলী

,, সচীন্দ্রকিশোর রায়, এম, এ, বি এল, (কুমিল্লা)

,, কৈলাসচন্দ্র সিংহ (ত্রিপুরা)

,, দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)

,, নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম, এ, বি, এল, (বরিশাল)

,, সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, এম, এ, (ঢাকা)

,, ব্যোমকেশ মুস্তফী (কলিকাতা)

,, জলধর সেন ঐ

,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বিএল, ঐ

,, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম,এ, (গৌহাটী)

কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর (আগরতলা)

শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাশীমবাজার)

কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা)

শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী (ঢাকা)

,, অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ ঐ

,, যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত ঐ

,, উপেন্দ্রচন্দ্র সেন, এম, এ ঐ

,, মথুরানাথ গুহ ঐ

,, বিজয়কুমার বসু, বি, এ, ঐ

,, হেমেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (সোপান) ঐ

শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত (ভারত-মহিলা) ঐ

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী (পূর্ব্ববঙ্গ-ব্রাহ্ম-সমাজ)

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন সেন
" অরবিন্দু রায়
" অযোধ্যানাথ চৌধুরী
" সতীশচন্দ্র ঘোষ
" ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)
" সুধাংশুমোহন গুপ্ত
" সুবোধচন্দ্র রায় (ঢাকা)
" অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, এম, এ, বি এল (ঢাকা)
" আদিনাথ সেন, এম. এ. বি, এস্.সি.
" ক্ষিতীশচন্দ্র রায়. এম. এ.
" পণ্ডিত রমেশচন্দ্র সাঙ্খ্যতীর্থ
" নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম. এ. (ঢাকা)
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঐ
" যামিনীকান্ত সেন ঐ
" শরচ্চন্দ্র সেন ঐ
" মেঘনাদ সাহা ঐ
" সতীশচন্দ্র গুহ ঐ
" ইন্দুভূষণ দত্ত, বি, এ, ঐ
" রঞ্জিতকুমার চক্রবর্ত্তী ঐ
" শশাঙ্কভূষণ রায়, বি. এ. ঐ
" সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ
" ভূপতিনাথ দাস গুপ্ত, বি, এ.
" বিনোদবিহারী দাস ঐ
" নিবারণচন্দ্র সেন গুপ্ত, বি, এ,
" সারদাপ্রসন্ন দাস
" দক্ষিণাপ্রসাদ দাস
" যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" যতীন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত
" কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন (ঢাকা)
" বিনয়কুমার সরকার, এম, এ, (মালদহ)

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ (কলিকাতা)
" আর, কে, দাস, বি, এ, ব্যারিষ্টার (ঢাকা)
" অমলেন্দু গুপ্ত ঐ
" বীরেন্দ্রনাথ বসু ঐ
" মহেন্দ্রচন্দ্র পাল
" সুকুমার চক্রবর্ত্তী
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,
" প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ,
" বিপিনচন্দ্র দাস
প্রভৃতি।

সম্মিলনের কার্য্যবিভাগ।

(গ) পরিশিষ্ট—স্বেচ্ছাসেবকগণ

এবং

(ঘ) পরিশিষ্ট—অভ্যাগতগণের বাসস্থান

গবর্ণমেণ্ট হাউস—সভাপতি মহাশয়ের বাসস্থান।

শ্রীযুক্ত সি, দাস—প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

সহকারিগণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রচন্দ্র গুহ
" যদুনাথ বিশ্বাস
" রাজেন্দ্রকুমার উকিল

স্বেচ্ছাসেবকগণ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
" ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
" প্রমদাচরণ দাস
" সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আম্বারিয়ার বাসা।

শ্রীযুক্ত অধরনাথ সেন—তত্ত্বাবধায়ক

,, যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—সহকারী

স্বেচ্ছাসেবকগণ।

শ্রীযুক্ত হরিচৈতন্য দাস

,, মথুরানাথ দাস

পাতিলাদহের বাসা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের বাসস্থান

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বি. এল.—তত্ত্বাবধায়ক

স্বেচ্ছাসেবক।

শ্রীযুক্ত রোহিনীকুমার চক্রবর্ত্তী

পাঁচআনার বাসা।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ লাহিড়ী—তত্ত্বাবধায়ক

,, দুর্গাদাস রায়

,, সুরেশচন্দ্র ঘোষ

স্বেচ্ছাসেবকগণ।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ভৌমিক

,, মনোমোহন বর্ম্মণ

আলেক্জাণ্ডার কাসল্—কাসিমবাজারের মহারাজার বাসস্থান।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গুহ, বি, এল,—তত্ত্বাবধায়ক

স্বেচ্ছাসেবকগণ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বাগচী

,, আদিত্যচরণ সেন

কলেজ বোর্ডিং।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পাল, বি, এ.—অধ্যক্ষ

,, কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
,, শ্রীনাথ রায়, বি, এল.
,, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি, এল,
,, চিন্তাহরণ মজুমদার, বি, এল,
} সহকারী

শ্রীযুক্ত শ্যামদয়াল দত্ত

,, প্রিয়নাথ গোস্বামী

,, ধরণীধর গোস্বামী

,, সুরেশচন্দ্র গুহ

,, রণদাপ্রসন্ন সোম

,, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

,, সতীশচন্দ্র দাস

,, ধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

,, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

,, বনবাসী বর্দ্ধন

দুর্গাবাড়ী—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বাসস্থান

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী, বি, এল,—অধ্যক্ষ

,, পরেশচন্দ্র লাহিড়ী } সহকারী

,, কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য } সহকারী

,, গিরীন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন } সহকারী

,, তারকনাথ চৌধুরী

,, অঘোরচন্দ্র লাহিড়ী

,, সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

,, সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

যতীন্দ্র বাবুর বাসা।

ধীরঙ্কাচরণ দত্ত রায়—অধ্যক্ষ

,, প্রসন্নচন্দ্র আইচ } সহকারী

,, মহেশচন্দ্র সরকার } সহকারী

,, সচীন্দ্রচন্দ্র রায়

,, অমূল্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

রেলষ্টেসনের অভ্যর্থনাকারিগণ

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ, বি, এল,

,, নিশিকান্ত ঘোষ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার আইন
,, বিজয়চন্দ্র দাস
,, মহিমচন্দ্র রায় (সেক্রেটারী)
,, কুলদাকান্ত দত্ত
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
,, অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, অটলবিহারী কর
,, নলিনীমোহন দাস গুপ্ত
,, দীনেশচন্দ্র সেন
,, শরচ্চন্দ্র আচার্য্য
,, নিকুঞ্জবিহারী ঘোষ
,, মহেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
,, রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তী
,, নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস

স্বেচ্ছাসেবকগণ।

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, দীনেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
,, পরেশনাথ গুপ্ত
,, অপূর্ণচন্দ্র সেন
,, সতীন্দ্রকুমার ঘোষ
,, হরেন্দ্রকুমার গুহ
,, মন্মথকুমার বর্দ্ধন
,, দীনেশচন্দ্র নাগ
,, যতীন্দ্রনাথ সেন
,, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভাণ্ডার-রক্ষা বিভাগ

শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর পত্রনবিশ—অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়
,, রসিকচন্দ্র ঘোষ
,, তারকনারায়ণ চৌধুরী
,, গিরীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
,, শ্রীশচন্দ্র গুহ
,, মোহিনীশঙ্কর রায়
,, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

স্বেচ্ছাসেবকগণ

শ্রীযুক্ত সুধেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার
,, যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
,, যোগেশচন্দ্র রায়
,, তমোনাস গুপ্ত

পেণ্ডেল বিভাগ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, বি, এল, —সম্পাদক
,, খগেন্দ্রজীবন রায়—সহকারী সম্পাদক

স্বেচ্ছাসেবকগণ

শ্রীযুক্ত রমণীশঙ্কর রায়
,, জ্ঞানশঙ্কর মজুমদার
,, মদনচন্দ্র দে
,, হরেন্দ্রমোহন মজুমদার
,, করুণাকান্ত দত্ত
,, যোগেশচন্দ্র ভৌমিক
,, অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী
,, নিশিকান্ত লাহিড়ী
,, মোহিনীমোহন রায়
,, ক্ষিতীশচন্দ্র আচার্য্য
,, সুধাংশুভূষণ রায়
,, প্রভাতচন্দ্র মজুমদার

সভার কার্য্য

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদক
,, অবনীমোহন বসু স্বেচ্ছাসেবক

অভ্যর্থনা বিভাগ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, বি এল. সম্পাদক

স্বেচ্ছাসেবকগণ

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মজুমদার
,, শ্রীশচন্দ্র ভৌমিক
,, বিমলানাথ চাকলাদার
,, উপেন্দ্রকিশোর রায়
,, যামিনীকিশোর সিংহ মজুমদার
,, গদাধর ভাদুড়ী
,, ব্রজগোপাল দত্ত রায়
,, সুরেশচন্দ্র রাউত
,, যোগেন্দ্রকুমার রায়
,, ভূপেন্দ্রচন্দ্র গুহ

কার্য্যালয়ের কাজকর্ম্ম

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন অধ্যক্ষ

স্বেচ্ছাসেবকগণ

শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর মজুমদার
,, হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
,, প্রসন্নকুমার বিশ্বাস
,, নৃপেন্দ্রনাথ গুহ
,, জ্ঞানেশচন্দ্র চৌধুরী
,, প্রফুল্লচন্দ্র সেন
,, রসিকচন্দ্র দে
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
,, আনন্দচরণ বসু

শ্রীযুক্ত নীহারকিশোর রায়

,, শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার

,, সরোজরঞ্জন গুহ

,, সুরেন্দ্রমোহন রায়

বাসস্থান পরিদর্শন

শ্রীযুক্ত রেবতীশঙ্কর রায়

,, আনন্দকিশোর চক্রবর্ত্তী

,, কুলদাকান্ত দত্ত

,, তারাশঙ্কর রায়

স্বেচ্ছাসেবকগণ

শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

,, যতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

,, নরেশচন্দ্র লাহিড়ী

,, সতীশচন্দ্র চৌধুরী

,, কুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সকল কার্য্যের সুশৃঙ্খলা

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

(ঙ)—পরিশিষ্ট

প্রদর্শনীর কার্য্যকারকগণ

প্রদর্শনী-সম্বন্ধীয় খরচ পত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী

শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিশ্বাস

,, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী

প্রদর্শনী-গৃহ সজ্জিত করার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ

,, মনোমোহন চৌধুরী

,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য্য

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস
,, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী

প্রদর্শনীর জিনিসপত্র গ্রহণ করা ও ফেরত দেওয়ার ভার

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায়
,, বিপিনচন্দ্র নন্দী
,, বিপিনচন্দ্র গোস্বামী
,, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, যোগেশচন্দ্র রায়
,, হেরম্বসুন্দর দত্ত
,, নৃপেন্দ্রচন্দ্র গুহ
,, জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, হরিশঙ্কর মজুমদার
,, নগেন্দ্রচন্দ্র দে

প্রদর্শনীর সময় টিকেট বিক্রয় করার ভার

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায়

ছাপাখানার মুদ্রণ ইত্যাদি কাজের ভার

শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর মজুমদার
,, হেরম্বসুন্দর দত্ত
,, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী

প্রদর্শনীর সভ্যগণের নাম

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী
,, কুমার হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
,, কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী
,, অক্ষয়কুমার মজুমদার, এম,এ, বি,এল,
} সম্পাদকগণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী
,, অমরচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ
,, শশিকুমার বসু
,, কেদারনাথ মজুমদার
,, রেবতীশঙ্কর রায়
,, যদুনাথ বিশ্বাস
,, তারকনারায়ণ চৌধুরী
,, রেবতীকান্ত তালুকদার
,, বিপিনচন্দ্র রায়
,, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী
,, হেরম্বসুন্দর দত্ত
,, বিপিনচন্দ্র নন্দী
,, রামকুমার ভদ্র
,, কালীশচন্দ্র বিশ্বাস
,, দীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ
,, শশিভূষণ রায়

স্বেচ্ছাসেবকদিগের তত্ত্বাবধান বিভাগ

শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসু—অধ্যক্ষ
,, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী—সহকারী

মহিলাদিগের প্রদর্শন তত্ত্বাবধান

শ্রীমতী ভক্তিসুধা ঘোষ

প্রদর্শনী বিভাগের স্বেচ্ছাসেবকগণ

শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, বিনোদবিহারী দে
,, রমেশচন্দ্র রায়
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
,, প্রফুল্লচন্দ্র সেন
,, নগেন্দ্রচন্দ্র সেন
,, জিতেন্দ্রচন্দ্র রায়
,, বীরেন্দ্রকিশোর কর

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র রায়
,, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, সুরেন্দ্র কর্ম্মকার
,, ভবেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, নগেন্দ্রচন্দ্র দে
,, মন্মথকুমার রায়
,, ত্রিগুণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, ধরণীরঞ্জন ঘোষ
,, যতীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
,, সুধেন্দ্রচন্দ্র রায়
,, সুরেশচন্দ্র দাস
,, সুধাংশুমোহন চৌধুরী
,, হরিকিশোর রায়
,, বিধুভূষণ ঘটক
,, প্রিয়ভূষণ ঘটক
,, সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য
,, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
,, ক্ষিতীশচন্দ্র সোম
,, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ
,, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত
,, মন্মথচন্দ্র চৌধুরী
,, শিবপ্রসাদ ভাদুড়ী
,, সচ্চিদানন্দ রায়
,, সুরেশচন্দ্র রায়
,, হরকুমার রায়
,, রমেশচন্দ্র রায়
,, অশ্বিনীকুমার রায়
,, আবদুল গনি
,, প্রাণেশচন্দ্র ধর
,, ধীরেন্দ্রলাল বসাক

শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রচন্দ্র রায়
,, বীরেন্দ্রকিশোর রাউত
,, রামেন্দ্রচন্দ্র রায়
,, ভূপেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
,, বিরজাশঙ্কর রায়
,, জিতেন্দ্রচন্দ্র রায়
,, সুরেশচন্দ্র রায়
,, উপেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক
,, যাদবচন্দ্র কর্ম্মকার
,, সন্তোষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
,, সতীশচন্দ্র চৌধুরী
,, বামাচরণ ঘোষ
,, সিতিকণ্ঠ আচার্য্য

চতুর্থ বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে

প্রদর্শনী।

ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি ও শিল্পসম্পদ্ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা বর্ত্তমান প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। অতি সঙ্কীর্ণ সময়ে ইহার আয়োজন করা হইয়াছে সুতরাং কার্য্যকর্ত্তাগণ সম্পূর্ণ সফলকাম হইবার আশা করিতে পারেন না।

ময়মনসিংহে প্রদর্শনীর প্রথম আয়োজন ১২৮৪ সালে করা হইয়াছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী উহার একজন অনুষ্ঠাতা ছিলেন। তৎপর হইতে ৩২ বৎসর কাল কখনও বিপুল আয়োজনে কখনও অতি সামান্যরূপে প্রদর্শনী হইয়াছে। জেলার জজ মিঃ কার্কউড ও জেলার মাজিষ্ট্রেট মিঃ ফিলিপস্, মিঃ টমসনের নেতৃত্বে যে কয়টী প্রদর্শনী হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত প্রদর্শনীতে কৃষি ও শিল্পদ্রব্য ব্যতীত ময়মনসিংহের প্রাচীন গ্রন্থ ও বর্ত্তমান সময়ের লেখকগণের গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহের জনপ্রিয় মাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড্ আজ যে প্রদর্শনী খুলিতেছেন

তাহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে।

ময়মনসিংহের শিল্পসম্পদের মধ্যে বয়ন-শিল্প প্রথম স্থান অধিকার করে। ঢাকাই মস্‌লিনের পরেই কিশোরগঞ্জের মস্‌লিন ও তঞ্জেব এপর্য্যন্ত স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিশোরগঞ্জ বাজিতপুর টাঙ্গাইল বাজিতপুর ও নলসোন্দা প্রভৃতি স্থানের শাড়ী, চাদর, ঢাকাই শাড়ী ও চাদরের অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। আমাদিগের মহিলাগণের রুচির পরিবর্ত্তন অনুসারে ময়মনসিংহের তন্তুবায়গণ শাড়ীর দৈর্ঘ্য ও নমুনা পরিবর্ত্তন করিয়া বয়ন-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতেছে। জালালিয়ার মুসলমান কারিকরগণ উত্তম ছিট প্রস্তুত করে এবং অনেকের আফিসের পোষাক ও কোটে ঐ ছিট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহে এণ্ডি পোকা হইতে প্রচুর পরিমাণে রেসম প্রস্তুত করা হইত। প্রধানতঃ কৃষকশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণের হস্তেই এই ব্যবসা ছিল। কৃষক পত্নীদের অনেকে এই রেসমী কাপড় এবং কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ দেশজাত এণ্ডি চাদর ব্যবহার করিত। পূর্ব্বে এই এণ্ডি চাদরের মধ্যে একটা সেলাই থাকিত। ফ্লাইসাট্‌লুম ব্যবহার করিয়া এখন যুগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিনা সেলাইতে চাদর প্রস্তুত করিতেছে। নেত্রকোণার অন্তর্গত সান্দিকোণায় এবং কিশোরগঞ্জ ও জামালপুরের কোনও কোনও স্থানে এই শ্রেণীর চাদর এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে ময়মনসিংহে এণ্ডি সূতা আর প্রস্তুত হয় না, আসাম হইতে ক্রয় করা হইয়া থাকে। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত পাতরাইল গ্রামের তন্তুবায়গণ উৎকৃষ্ট গরদের ও হাওয়ার চাদর প্রস্তুত করে, তাহা মুর্শিদাবাদের রেসমী কাপড় হইতে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই তন্তুবায়গণ বগুড়া ও রাজসাহী হইতে গরদের সূতা ক্রয় করিয়া আনে।

কাঁসার কাজের মধ্যে জামালপুরের অন্তর্গত ইস্‌লামপুরের বাসন প্রথম উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের খাগরাই বাসন অপেক্ষাকৃত হালকা কিন্তু গঠনে ও পালিশে ইসলামপুরকে অতিক্রম করিতে পারে না। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কাগমারি, মগরা গ্রামে উত্তম কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। কাগমারীর কর্ম্মকারেরা বর্ত্তমান সময়ে রুচির অনুরূপ নানাপ্রকার প্লেট প্রস্তুত করিয়া থাকে।

লোহার কাজের জন্য কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বাজিতপুর প্রসিদ্ধ। ২৫বৎসর পূর্ব্বে বাজিতপুরের কর্ম্মকারগণ ডাক্তারি অস্ত্র ও ছুরি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই। বৈলর ও চাড়ালজানিতে উৎকৃষ্ট দা প্রস্তুত হয়। ময়মনসিংহের সারস্বত কারখানায় ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও বাক্স প্রস্তুত হইতেছে। তাহা দেশীয় অন্যান্য কারখানায় প্রস্তুত জিনিসের তুলনায় কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। সারস্বত কারখানার একটী কারিকর স্বতন্ত্রভাবে অপর একটী কারখানা খুলিয়াছেন।

কিশোরগঞ্জ বাজিতপুরের, টাঙ্গাইল ও বেলতার সূত্রধরগণ উত্তম কাঠের কাজ জানে। ইহারা উত্তম টেবিল ও আলমারি প্রস্তুত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পশ্চিম দেশীয় ও বিক্রমপুরের শ্রমশীল সূত্রধরগণের সহিত প্রতিযোগিতায় বাজার হইতে নিষ্কাসিত হইতেছে। রামগোপালপুরের জমিদার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ময়মনসিংহে টেক্‌নিকেল স্কুল স্থাপন করিয়া কাঠের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই স্কুলে প্রথমতঃ লোহার কাজ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন তাহা নাই। এখন সামান্য রকমে লোহার কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জের ন্যাসনাল স্কুলে কাঠের ও লোহার কাজ শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে।

ময়মনসিংহের চিত্রশিল্পে মিঃ হেসের নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। প্রসেস্ ব্লকের উন্নতিকর্ত্তা মিঃ ইউ, রায়, প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ রায় ময়মনসিংহবাসী। এণ্ট্রান্স স্কুল সমূহে ড্রইং শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পর হইতে বালকদিগের মধ্যে চিত্র-শিল্পের প্রতি রুচি দেখা যাইতেছে। তদ্দ্বারা পাশ্চাত্য নমুনার চিত্র, মডেল, রিলিফ-ম্যাপ প্রস্তুত হইতেছে।

ময়মনসিংহবাসী স্বর্গীয় দুর্গাচরণ সরকার কাগজের কাজে প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন আর ইহলোকে নাই। তাঁহার হস্তের গোসাপ, গিরগিটী, কুমীর ও ফল ইত্যাদি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকটও সমাদর লাভ করিয়াছিল।

টাঙ্গাইল রসুলপুরের রমণী আচার্য্য টাঙ্গাইল প্রদর্শনীতে অটোমেটিক্ লুম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রমণী আচার্য্য ইহলোকে নাই।

সুন্দিবেত গারোপাহাড়ে জন্মে। ময়মনসিংহ পরগণায় বেতের পেটরা প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান রুচি অনুসারে বেতের কারিকরগণ বাক্স ইত্যাদি প্রস্তুত

করিতেছে। এই বেতের কাজে কিছু কিছু উন্নতি দেখা যায়। ময়মনসিংহ পরগণায় বাঁশ ও বেতের কাজ হইয়া থাকে।

ময়মনসিংহ নগরে দুইটী কারখানায় উত্তম টিনের বাক্স প্রস্তুত হয়। দুইটী দোকানে হাড়ের কাজ হয় এবং একটী কারখানায় ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল জিনিস উৎকৃষ্ট বিধায় বাজারে বেশ বিক্রয় হইয়া থাকে।

শিল্প সামগ্রীর মধ্যে মহিলাদিগের সেলাইএর কাজ চিরদিন প্রদর্শনীর শোভা বৰ্দ্ধন করিয়া আসিতেছে। এক সময় উলের কাজে ইঁহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সময় ও রুচির পরিবর্ত্তনে এখন ইঁহারা উলের কাজে তেমন মনোনিবেশ করেন না। এখন লেস্ ও ক্রোসের কাজ করা সেমিজ জামা প্রভৃতি সেলাই করা অধিকতর পছন্দ করেন। কেহ কেহ সেলাইর কল ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন।

সুগন্ধি দ্রব্যকার শ্রীযুক্ত এইচ বসু ও ওরিয়্যাণ্টাল সোপ ফ্যাক্টারীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও কালি প্রস্তুত করার কারখানার ম্যানেজার জাপান প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু ময়মনসিংহবাসী। ময়মনসিংহ নগরে কতকদিন একটী সোপ ফ্যাক্টারী ছিল; তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাসা গ্রামের কুম্ভকারগণ কৃষ্ণনগরের অনুকরণে কতকটা তদনুরূপ পুতুল প্রস্তুত করিতে পারে।

ময়মনসিংহের প্রধান কৃষি পাট। অৰ্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বে পাটের মাত্র সামান্য চাষ ছিল। টাঙ্গাইল হইতে পাটের রীতিমত চাষের প্রথম সূত্রপাত হয়। পাটের চাষে ময়মনসিংহে এখন বহু অর্থাগম হইতেছে। সেরপুর ও পিঙ্গনার পাট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ময়মনসিংহের চাউল মধ্যে গোকুলসাইল, দুধসর ও কালিজিরা, বেতি, আলাপসিং ময়মনসিং নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে জন্মে। ঈশ্বরগঞ্জে সরিষাবাড়ী ও কটিয়াদি ফতেপুরের সোনামুগ উল্লেখযোগ্য। সম্ভুগঞ্জ ও সেরপুরের বেগুন ও সেরপুরের পঞ্চমুখী উৎকৃষ্ট তরকারী।

গৌরীপুরে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ছিল কিন্তু এখন তাহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম পুনরায় বিশেষ আয়োজনে উক্ত কৃষিক্ষেত্র চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জামালপুর চৈতন্য নার্শরিতে বহু সংখ্যক দুর্লভ ফল ফুলের গাছ সংগ্রহ করা হইয়াছে। রামগোপালপুরে নানাপ্রকার বৃক্ষজাত সূত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহ ও কালিবাজারে উৎকৃষ্ট খাঁটি সরিষার তৈল হইত এখন ভেজাল হইতেছে। জফরসাহি ও টাঙ্গাইলের ঘি উল্লেখযোগ্য।

মুক্তাগাছা সেরপুরের মণ্ডা, পোরাবাড়ী, বিনানইর রসগোল্লা টাঙ্গাইল নরদহি ও সদর কাণিহারির দধি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

প্রদর্শনীর উপকারিতার কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রতি বৎসর উপযুক্ত আয়োজনে একটী করিয়া প্রদর্শনী হইলে দেশের সমূহ উপকার সাধিত হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। জেলার মাজিষ্ট্রেট ও দানশীল জমিদারবর্গের উৎসাহ ও সহৃদয়তায় কেবল ইহা সংসাধিত হইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক প্রদর্শনী।

এবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন। এই সম্মিলনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের সহিত কোন ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় নাই। তৃতীয় অধিবেশনে ভাগলপুরবাসিগণ প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের ঐতিহাসিক সম্পদ্ চয়ন করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত সাহিত্য-প্রদর্শনীর এই সন্নিবেশ ভাগলপুরে ব্যবস্থিত হইলেও এই অভিনব ভাব ময়মনসিংহ হইতেই প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল। ইহা ময়মনসিংহবাসিগণের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দ্রব্যের প্রথম প্রদর্শনী ১৩০৫ সালে এই ময়মনসিংহ নগরে অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ-সারস্বত-সমিতি এই পুণ্য অনুষ্ঠানের সূচনার পথ প্রদর্শন করিয়া দেশে এক নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করেন। ইহার ফলে ১৩০৭ সনে খুলনা সাহিত্য-প্রদর্শনী হয়। ১৩০৮ সনে কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ শিল্প-প্রদর্শনীর সহিত সাহিত্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

১৩০৫ সালের সাহিত্য প্রদর্শনীতে কেবল মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এবার এই সাহিত্য প্রদর্শনীকে প্রত্নতত্ত্ব, ঐতিহাসিক চিত্র, ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ এই চারিটী বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১ম।—**ঐতিহাসিক চিত্র বিভাগ**—এই বিভাগে সুসঙ্গ রাজধানী

হইতে সংগৃহীত বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায়ের গৃহদেবতা, প্রচীন রাজগৃহ মাধব বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, কিশোরগঞ্জ হইতে সংগৃহীত ঈশাখাঁর গুপ্ত রাজধানী, জঙ্গল-বাড়ীর চতুর্দ্দিক বেষ্টিত পরিখা, এগারসিন্ধুর দুর্গ, ইশাখাঁর কামান, প্রামাণিকের একুশ রত্ন, জলটঙ্গী, অথিতিশালার, নবরঙ্গ রায়ের দীর্ঘীকা, রাজা গাণিক্য রায়ের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন, কবি দ্বিজ বংশীদাসের মঠ, ঐতিহাসিক স্থান ও দ্রব্য সমূহের আলোক চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। টাঙ্গাইল মধুপুর হইতে জয়সিংগীরের ভগ্ন দুর্গ, নবরত্ন, যশোধর নৃপতির মদনগোপাল ও তাহার প্রাচীন রাজধানী ফলদার ভগ্নাবশেষ, রাজ গোলাবাড়ীর রাজাবসন্ত রায়ের রাজভবন, নরিলার ধ্বংসাবশেষ, আটীয়া হইতে সাহেনসার মসজিদ, করটিয়ার মসজিদ, সেরপুরের রঘুনাথজীর মন্দির, ভোগবেতালের গোপীনাথজীর মন্দির, রামগোপালপুর হইতে তাজপুর কেল্লা, বোকাইনগর কেল্লা, রোয়াইল বাড়ীর সুরম্য রাজ-ভবনের শেষ চিহ্ন প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের আলোক-চিত্র ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে

২য়।—**প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ**—এই বিভাগে প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রাদি রক্ষিত হইয়াছে। পরগণা নাসিরুজিয়ালের অন্তর্গত মোয়াজ্জমাবাদে এক সময় টাকশাল অবস্থিত ছিল। হকৃলিম মোজ্জমাবাদের টাকশালের টাকা, রাজা গৌরীনাথ সিংহ ও ব্রজনাথ সিংহ নামীয় বঙ্গাক্ষর অঙ্কিত মুদ্রা, সুসঙ্গ পাহাড়ে প্রাপ্ত প্রাচীন কালের অদ্ভুত গ্রন্থ, সুসঙ্গের রাজাদিগের ব্যবহৃত কামানের গোলা, বহু প্রাচীন কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক, দেওয়াল গাত্রের মসৃন আবরণী, ভবানীপুর ও অন্যান্য নানাস্থান হইতে সংগৃহীত প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্ত্তিসমূহ এই বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩য়।—**প্রাচীন গ্রন্থ বিভাগ**—এই বিভাগে এই জেলার প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রূপনারায়ণ দাসের ও অন্ধকবি ভবাণী দাসের চণ্ডী, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত, অনন্ত দত্তের ক্রিয়া যোগসার, কৃষ্ণদাসের বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী, রাজা রাজসিংহের রাগমলা, দ্বিজ বংশীদাসের কৃষ্ণগুণার্ণব, বৈদ্য রঘুদাসের স্বরূপ চরিত, গঙ্গানারায়ণের ভাস্কর পরাভব, জগন্নাথ দেবের হাড়মালা, মুক্তারাম নাগের কালীপুরাণ, বিষ্ণুরাম নন্দীর উদ্ধবগীতা, রাজা জগন্নাথের জগদ্ধাত্রী গীতাবলী, রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহের পদ্মাপুরাণ ইত্যাদি অন্যান্য বহু কবির গ্রন্থ ও প্রাচীন দলিলাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

৪র্থ।—ঐতিহাসিক বিবরণ-সংগ্রহ বিভাগ—এই বিভাগে এই জেলার বহুগ্রামের ও বহু শ্রেষ্ঠ পরিবারের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলি অকিঞ্চিৎকর কি না ইহার বিচার বর্ত্তমান সময়ে হইতে পারে না। এগুলি কি পর্য্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার সূচী মুদ্রিত করিয়া প্রদর্শনী কক্ষে রক্ষিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগে এই জেলার ভাষা, প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য ব্রতকথা প্রভৃতিও সংগৃহীত হইয়াছে।

এইরূপ ভাবে প্রতি গ্রামের ও প্রতি জেলার বিবরণ সংগৃহীত হইলে সমগ্র দেশের একখানি মূল্যবান ইতিহাস সঙ্কলনের পথ উন্মুক্ত হয়। ময়মনসিংহ সাহিত্য-প্রদর্শনী ইহার পথ প্রদর্শন করিতে পারিলে ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনের উপকারিতা প্রদর্শিত ও সাহিত্য-প্রদর্শনীর গৌরব রক্ষিত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

	প্রদর্শিত দ্রব্য	প্রদর্শক
১।	ব্রহ্মদেশীয় আধুলি (ময়ূরাঙ্কিত)	শ্রীযুক্ত পরেশনাথ গুহ
২।	আলাউদ্দীনখিলিজির টাকা ১টী	,,
৩।	৮৩৩ রাজাঙ্কযুক্ত তাম্র মুদ্রা	,,
৪।	তাম্র মুদ্রা—বিকানির ষ্টেট	,,
৫।	টাকা ৩টী—সাহ আলম ১ম	,,
৬।	আধুলি ২টা ,,	,,
৭।	মুনশীগঞ্জের প্রাচীন দুর্গের প্রতিকৃতি	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার
৮।	১২২০ হিজিরি সিকি ১	,, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৯।	সিক্কা টাকা ১	,,
১০।	১৭৪৩ শকের ইন্দোরের তাম্র মুদ্রা	,,
১১।	বার্ম্মিজ অক্ষরের তাম্রমুদ্রা	,,
১২।	১৮৮০ খৃঃ অঃ সারাওয়াক তাম্রমুদ্রা	,,
১৩।	সংস্কৃত রাজাবলী ষষ্ঠ অধ্যায় হস্তলিখিত কলাপ ব্যাকরণ	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন কবিভূষণ
১৪।	আখ্যাত বৃত্তি ১৭১০ শকের লিখিত	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কাব্যবিনোদ
১৫।	১৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত আয়ু কেদার চন্দ্রিকা	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন কবিভূষণ

১৬।	হস্তলিখিত কৃষ্ণচন্দ্র প্রণীত তন্ত্রসার	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কাব্যবিনোদ
১৭।	হস্তলিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের কতক অংশ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরচ পত্রে লিখিত	,,
১৮।	১২০৪ সনের লিখিত গান	,,
১৯।	চাণক্য-শ্লোক বাঙ্গলা গদ্যানুবাদসহ লিপিকর শ্রীরামরতন দাস সাং মঙ্গলাপুর, পং বরবাজু	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,,
২০।	অজ্ঞাতনাম বৈদ্যক গ্রন্থ গদ্য, পদ্য, মুষ্টিযোগ, রোগ লক্ষণ, এবং নানা প্রকার রূপা দেওয়া মাত্র সম্বলিত	,,
২১।	চৈতন্যচরিতামৃত ১১শ পরিচ্ছেদ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ১১৮৪।২৫ ফাল্গুন, লিপিকর শ্রীরাম নারায়ণ দাস	,,
২২।	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গ্রন্থ	,,
২৩।	বসন্ত বর্ণিতা (কৃষ্ণদাস)	,,
২৪।	মনঃ শিক্ষা—শ্যামদাস অজ্ঞাত নাম গ্রন্থ (কালিদাস)	,,
২৫।	জৈমিনি ভারত অশ্বমেধপর্ব্ব—গঙ্গাদাস সেন	,,
২৬।	মনসা মঙ্গল—কবি কালিদাস	,,
২৭।	রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড	,,
২৮।	কৃত্তিবাস	,,
২৯।	চৈতন্য চরিতামৃত—মঙ্গলাচরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ	,,
৩০।	মহাভারতের গদাপর্ব্ব (সঞ্জয়)	,,
৩১।	চৈতন্যচরিতামৃত খণ্ডপর্ব্ব	,,
৩২।	কবি বল্লভের রস কদম্ব	

	শকাব্দা ১৭১৫, সন ১২০০	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩৩।	টাঙ্গাইল অঞ্চলের প্রচলিত প্রাচীন গ্রীক টাকা	,,
৩৪।	মৃৎশিল্প	
৩৫।	১২৪০ সনের হস্তলিখিত জ্যোতিষ-গ্রন্থ	
৩৬।	কামিনী-কুমার	,,
৩৭।	শিখা যোগসার	,,
৩৮।	ছিন্ন গ্রন্থ	,,
৩৯।	হস্তলিখিত বিদ্যাসুন্দর	,,
৪০।	১১৭৭ সনের পদ্মাপুরাণ	শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার বিশ্বাস
৪১।	১২০৩ সনের ,,	,,
৪২।	চতুষ্কোণ রৌপ্য মুদ্রা ২	,,
৪৩।	গোলাকার রৌপ্য মুদ্রা বড় ২	,,
৪৪।	গোলাকার রৌপ্যমুদ্রা ৩	,,
৪৫।	১৭৩৯ সনের রৌপ্যমুদ্রা অষ্টকোণ ১	,,
৪৬।	১৭০৬ সনের ঐ ১	,,
৪৭।	পারসী মুদ্রা ১	,,
৪৮।	উমা-মহেশ্বর—প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ১	,,
৪৯।	পিত্তল-নির্ম্মিত হরপার্ব্বতী-মূর্ত্তি ১	,,
৫০।	রৌপ্য মুদ্রা প্রাচীন বড় ১	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর ধর
৫১।	রৌপ্য মুদ্রা ঐ মধ্যম ১	,,
৫২।	,, ঐ ছোট ১	,,
৫৩।	সারচন্দ্রিকা ভেষজ-গ্রন্থ (প্রায় দেড় শত বৎসরের লিখিত)	শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত
৫৪।	বৃহৎ নারদীয় পুরাণম্ (৭১২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত)	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কাব্যতীর্থ ভিষকরত্ন
৫৫।	সানন্দ কবিচন্দ্রকৃত রসেন্দ্র-চন্দ্রিকা (১০৯ বৎসরের প্রাচীন)	,,
৫৬।	মাধবকরনিদানম্	,,

৫৭।	গৌরচন্দ্রিকা	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কাব্যতীর্থ ভিষকরত্ন
৫৮।	সঞ্জয়ের মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব, রাজসূয় যজ্ঞ, ভারত সাবিত্রী কৃত্তিবাস রামায়ণ, বিবেকযুদ্ধ	,, নন্দকুমার গোস্বামী
৫৯।	মহাভারত, রাগমালা ও সংক্ষিপ্ত মনসা পাঁচালী	সুসঙ্গ রাজবাড়ী
৬০।	বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সভা পর্ব্ব	,,
৬১।	শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডী	,,
৬২।	গাড়ো পাহাড়ে প্রাপ্ত ১ খানি পুস্তক	,,
৬৩।	ভারতী-মঙ্গল	,,
৬৪।	জগদ্ধাত্রী-গীতাবলী	,,
৬৫।	বিধুভূষণের হস্তলিখিত গ্রন্থ	,,
৬৬।	কামানের গোলা	,,
৬৭।	মাধবপুরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কতক ইষ্টক	,,
৬৮।	প্রাচীন স্মৃতিদ্বৈতনির্ণয়ের টীকা	,,
৬৯।	১২২৯ সনের মনুষ্য-বিক্রয়ের পত্র	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়
৭০।	বিযুত পুরাণ (৭০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত)	,, চারুচন্দ্র চৌধুরী
৭১।	শ্যামাকল্পলতা (২৭৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত)	,,
৭২।	ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ	,,
৭৩।	দাস-প্রথার খত	,,
৭৪।	দাস-প্রথার কবালা	,,
৭৫।	সিপাহি বিদ্রোহের বিজ্ঞাপন	,,
৭৬।	সিপাহি বিদ্রোহের সময়ের গবর্ণমেণ্টের আদেশ-পত্র	,,
৭৭।	বিদ্যোন্নতি-সাধিনী পত্রিকা সেরপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	,,
৭৮।	সেরপুরের গ্রন্থকারদিগের নাম	,,
৭৯।	হস্তলিপির নমুনা	,,
৮০।	হস্তলিখিত কামাখ্যা-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	,,

৮১।	হস্তলিখিত নারায়ণ দেবের কৃত পদ্মাপুরাণ	শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ
৮২।	হস্তলিখিত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী (১১০৭ সনের ১৯ শ্রাবণ)	,,
৮৩।	গঙ্গাদাসকৃত মহাভারত, (১১০৯ সন ২৩ ফাল্গুন)	,,
৮৪।	হস্তলিখিত পদ্মপুরাণ, (১২৬৫ সন)	,,
৮৫।	কেবলরামকৃত দুর্গামঙ্গল, (১২৬১ সন ১৩ই ফাল্গুন)	,,
৮৬।	পাথরের সূর্য্যমূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ,, শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
৮৭।	পদ্মাপুরাণ (ক)	,,
৮৮।	পদ্মাপুরাণ (খ)	,,
৮৯।	বুকাই নগরের মসজিদের ইষ্টক	,,
৯০।	তাজপুরের মসজিদের ইষ্টক	,,
৯১।	রোয়াইল বাড়ীর ইষ্টক	,,
৯২।	তাজপুরের মসজিদের ফটো	,,
৯৩।	কেল্লা তাজপুরের হিমুদীঘির ফটো	,,
৯৪।	কড়ই শিব-মন্দিরের ফটো	,,
৯৫।	কড়ই অন্তঃপুরের ফটো	,,
৯৬।	কড়ই বার দুওয়ারির ফটো	,,
৯৭।	কড়ই কালাচাঁদ মন্দিরের ফটো	,,
৯৮।	কেল্লা বুকাই নগরের নিজামুদ্দিন আলাউদ্দিনের ফটো	,,
৯৯।	কেল্লা বুকাইনগরের বুরুজের ফটো	,,
১০০।	কেল্লা বুকাই নগরের চান্দের মন্দিরের ফটো	,,
১০১।	২৭৮ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত মৌলাজ্যাবম	,,
১০২।	রামায়ণের অন্তর্গত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ পুথি	,,

১০৩।	রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পুথি	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
১০৪।	রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পুথি	”
১০৫।	নৈষধ (দুর্গাদাস-রচিত)	”
১০৬।	নৈষধ (রামায়ণ ঘোষের হস্তলিখিত)	”
১০৭।	২১০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত তন্ত্রসার	”
১০৮।	কলাপ তন্ত্র (১৬২ শকাব্দা)	শ্রীযুক্ত চন্দ্রধর ভট্টাচার্য্য
১০৯।	বিচার-নির্ণয়, সম্বন্ধ-নির্ণয়, গোপাল-পঞ্চামৃত	”
১১০।	একাত্তর ও বিরূপাক্ষর কোষ (১৬৫৬ শকাব্দা, দুর্গাদাস শর্ম্মা)	”
১১১।	ভাগবত ১ম স্কন্ধ (১৬৭৭ শকাব্দা, লেখক আদিত্যারাম)	”
১১২।	শিবপুরাণ, ভৌমি রামদেব-সংবাদ (১৬৮৭ শকাব্দা, লেখক আদিত্যারাম)	”
১১৩।	পরিশিষ্টপ্রবোধ কলাপব্যাকরণ (১৬৭৭ শকাব্দা, আদিত্যারাম)	”
১১৪।	আহ্নিকতত্ত্ব (লেখক রামদেব শর্ম্মা)	শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার চৌধুরী
১১৫।	গোপীনাথ তপাচার্য্যকৃত পরিশিষ্ট-প্রবোধ	”
১১৬।	কলাপ ব্যাকরণের আখ্যাত-টীকা (লেখক জ্ঞান শর্ম্মা)	”
১১৭।	হিতোপদেশ ও ভেষক কাব্য	”
১১৮।	ক্রিয়াযোগসার (লেখক—হরিহর চক্রবর্ত্তী)	”
১১৯।	বিষ্ণুপুরাণ	”
১২০।	হরেন্দ্রকুমার চৌধুরিকৃত পুস্তকাবলী	”
১২১।	১১৪৮ সনের হিসাব	”
১২২।	১১১১ সনের হস্ত-লিখিত সনন্দ (ব্রজমোহন চৌধুরিকৃত)	”
১২৩।	১১৩৭ সনের মোদ নারায়ণ ইন্দ্রনারায়ণ দস্তখতি সনদ	”

১২৪। সেরপুরের রঘুনাথজী ঠাকুরের মন্দিরের ইষ্টক — শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার চৌধুরী
১২৫। ১৬৪৭।১৬২০ সনের রৌপ্য মুদ্রা — ,,
১২৬। রঘুনাথজিউর ভগ্নমন্দিরের ফটো — ,,
১২৭। ঐ — ,,
১২৮। এগার সিন্দুরের মসজিদের ইট — শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মিত্র
১২৯। দুর্ব্বাসার দর্পচূর্ণ ঐ — ,, শশিধর চক্রবর্ত্তী
১৩০। • •
১৩১। সুদাম-চরিত্র (বিপ্র পরশুরাম-বিরচিত) — ,,
১৩২। মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব — ,,
১৩৩। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব — ,,
১৩৪। লক্ষ্মণের দিগ্বিজয় — ,,
১৩৫। মহাভারতের সভাপর্ব্ব — ,,
১৩৬। সুধন্বা-বধ—(রচয়িতা গঙ্গাদাস সেন) — ,,
১৩৭। রামের স্বর্গ-আরোহণ — ,,
১৩৮। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব — ,,
১৩৯। গাড়োর ফটো — শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকিশোর বিশ্বাস
১৪০। গাড়োর বাসগৃহ ,, — ,,
১৪১। হাজং স্ত্রী, পুত্র ,, — ,,
১৪২। হাজঙ্গের তাঁত ,, — ,,
১৪৩। মণিপুরি পুরুষের ,, — ,,
১৪৪। মণিপুরী রমণীর ,, — ,,
১৪৫। মণিপুরী বাসগৃহ ,, — ,,
১৪৬। মণিপুরী রাসলীলা ,, — ,,
১৪৭। সুসঙ্গ দশভুজা ,, — ,,
১৪৮। সুসঙ্গ বাড়ীর সম্মুখস্থ অশোক-বৃক্ষের ফটো — ,,
১৪৯। সুসঙ্গ সাগর-দীঘির ফটো — ,,
১৫০। সুমেশ্বরী নদীর ফটো — ,,

১৫১।	নবরঙ্গ রাজার বাড়ীর ইট	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৫২।	১৩১৬ সনের পৌষ মাসে পঃ সুসঙ্গের অন্তর্গত বওলা গ্রাম পুকুর খননকালে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী
১৫৩।	পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বিলিক ম্যাপি ১	শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত
১৫৪।	রিলিপ ম্যাপ	,, পীতাম্বর নাগ
১৫৫।	ভারত-মহিলা মাসিক পত্রিকা (বৈশাখ ১৩১৭। ১৩১৮ সনের বাঁধাই)	শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত
১৫৬।	সোপান —মাসিক পত্রিকা (১৩১৭।১৩১৮ সনের বাঁধাই)	,,
১৫৭।	সতী-শতক	শ্রীমতী নির্ম্মলাসুন্দরী চৌধুরাণী
১৫৮।	,,	,,
১৫৯।	কেরি সাহেবের কৃত ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান (১৮১৮ খৃঃ)	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১৬০।	দিগ্দর্শন (মাসিক পত্র চতুর্থ ভাগ) (১৮১৮ খৃঃ)	,,
১৬১।	পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ (ছিন্ন)	,,
১৬২।	পশ্বাবলি (১৮৩৬)	,,
১৬৩।	,, (১৮৩৮)	,,
১৬৪।	মনোরঞ্জন ইতিহাস	,,
১৬৫।	ইষ্টেস সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ	,,
১৬৬।	ইংরেজী বাঙ্গলা গল্প (নাম-বিহীন)	,,
১৬৭।	কবিকঙ্কণ চণ্ডী (মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি-বিরচিত)	,,
১৬৮।	প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা ১৪টি	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর রায়
১৬৯।	ঐ তাম্রমুদ্রা ১৫টি	,,
১৭০।	ত্রেতাযুগের রামের সময়ের মুদ্রা ২টি	শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ
১৭১।	চারইয়ারি টাকা ২টি	,,

১৭২।	বাদসাহী আমলের টাকা ২টি	শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ
১৭৩।	নবাবী টাকা ১টি	,,
১৭৪।	ময়ূরাঙ্কিত টাকা ১টি	,,
১৭৫।	১১৭০ সনের দুর্গারাম সার্ব্ব-ভৌমিকের বরাবর ব্রহ্মোত্তর দলিল	,,
১৭৬।	দাসদাসী বিক্রয়ের কাওয়ালা	,,
১৭৭।	১২০০ সনের পলাতক দাসের জিম্মা দলিল	,,
১৭৮।	১১৬২ সনের দুর্গারাম সার্ব্বভৌমিকের বরাবরে মুক্তাগাছার গঙ্গারাম আচার্য্যের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর দলিল	,,
১৭৯।	১১৬১ সনের দুর্গারাম সার্ব্বভৌমিকের বরাবরে মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী মহাশয়ের ইজারাই বন্দোবস্ত	,,
১৮০।	হেমন্ত চৌধুরি-প্রণীত পদামঞ্জরী	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার
১৮১।	শ্রীচন্দ্রধর ভট্টাচার্য্য বিরচিত সংস্কৃত-খণ্ডন-নিরসনম্	
১৮২।	প্রাচীন মন্দিরের লিপি নকল ২খানা	,,
১৮৩।	প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা	শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ
১৮৪।	নিক্তি-মার্কা পয়সা	,, রোহিণীকুমার ভট্টাচার্য্য
১৮৫।	শ্রাদ্ধপ্রয়োগ	,, গগনচন্দ্র শর্ম্মা
১৮৬।	কবিবর বংশীদাসকৃত কৃষ্ণগুণ-বর্ণনা	রামনাথ চক্রবর্ত্তী
১৮৭।	,, ,, পদ্মপুরাণ	
১৮৮।	,, ,, বাটীর প্রাচীন মঠ	
১৮৯।	ভূগর্ভপ্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি	,, ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী
১৯০।	১০৭০ বঙ্গাব্দের জঙ্গলবাড়ীর সনন্দ-পত্র	,, গগনচন্দ্র বিশ্বাস সারে চারি আনির বাসা
১৯১।	প্রাচীন মুদ্রা (রৌপ্য ১, তাম্র ১)	মিঃ জোসেফ খ্রীষ্টিয়ান
১৯২।	ব্রহ্মোত্তর দলিল	কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
১৯৩।	আরব দেশের ১৬৪১ খৃঃ পঞ্চতন টাকা ১টি	

১৯৪। বাদসাহ মহম্মদ
সাহ গাজীর রাজ্যাভিষেকের
৪র্থ বৎসরের ১টি মুদ্রা কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

১৯৫। সাহ আলম বাদসাহ গাজীর
ষষ্ঠ বৎসরের ১টী মুদ্রা „

১৯৬। সাহ আলম বাদসাহ
সন ১০০৪ হিঃ ২টি (১৭৮৭ খৃঃ) „

১৯৭। সাহ আলম বাদসাহের রাজ্যাভিষেকের
ঊনবিংশ বৎসরের মুর্শিদাবাদী ৫টি মুদ্রা „

১৯৮। সাহ আলম বাদসাহ সন ১১৭২ হিঃ
১৭৫৫ আরকট টাকশালের ১টি মুদ্রা „

১৯৯। সুলতান আবদুল হামিদ খাঁ
সন ১২৭৭ হিঃ, ১৮৫৮ খৃঃ ১টি মুদ্রা „

২০০। সাহ আলম বাদসাহের রাজ্যাভিষেকের
সপ্তবিংশ বৎসরের ১টি মুদ্রা „

২০১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮০৮ খৃঃ ২টি মুদ্রা „

২০২। সাহ আলম বাদসাহের রাজ্যাভিষেকের
সপ্তবিংশ বৎসর ৪টি মুদ্রা „

২০৩। ফরাসী দেশের তৃতীয় নেপোলিয়নের „
সময় ১৮৫৫ খৃঃ ১টি মুদ্রা

২০৪। ব্রিটিশ উত্তর বর্ণিও ১৮৭৮ সালের ১টি মুদ্রা „

২০৫। পুরাতন মুদ্রা ১টি „

২০৬। দোবের আমলের পয়সা ১টি „

২০৭। তাম্রখণ্ড ৪টি „

২০৮। আকবরী ৯৮৮ হিঃ ১৫৭১ খৃঃ ১টি „

২০৯। বাদসাহ সাজাহান গাজি (১০৬২ হিঃ
১৫৭১ খৃঃ) ১টি মুদ্রা „

২১০। আকবরী ৯৮৮ হিঃ পাচিয়ারী টাকা ২টি „

২১১। আকবরী পঞ্চতন (৯১৩ হিঃ, ১৪৯৬ খৃঃ) ১টি „

২১২। সাজাহান বাদসার সময়ের ১টি পুরাতন মুদ্রা „

২১৩। মহম্মদ সুলতান গাজি
(সন ১১১২ হিঃ, ১৬৯ খৃঃ) মুদ্রা ১টি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

২১৪। নরুদ্দিন বাদসাহ, ৮ম বর্ষ, মুদ্রা ১টি „

২১৫। বাদসাহ সাজাহান, ঊনবিংশ বর্ষ, মুদ্রা ১টি „

২১৬। শ্রীশ্রীরাজেশ্বর সিংহ, ১৮৭৬ শক, ১১৬৩
বাঙ্গালা, অষ্টকোণ স্বর্ণমুদ্রা ১টি „

২১৭। শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মুদ্রা ২টি „

২১৮। ভুটান দেশের মুদ্রা ১টি „

২১৯। শিবদুর্গা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাণিক্য কুমার
দেব স্বাধীন ত্রিপুরা মুদ্রা
১৬৮২ সন, ১১৬৭ সন বাং „

২২০। উমো রূপেয়া ১ „

২২১। ইয়েস জাপানি রৌপ্যমুদ্রা ১ „

২২২। জয়পুরী মোহর ১ „

২২৩। বাদসাহ সাজাহান ১ „

২২৪। বাদসাহ আলম ১২০০ হিঃ,
১১৯৩ খৃঃ, ১ „

২২৫। ১১৬৪ সনের মোকররি পাট্টা ১ „

২২৬। ১১৮৪ সনের জামালপুরের
দেবোত্তর দলিল ১ „

২২৭। ব্রহ্মোত্তর ফর্দ্দ ১

২২৮। পত্র-কৌমুদী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

২২৯। অমর-শতক „ প্রসন্নকুমার ন্যায়পঞ্চানন

২৩০। স্মৃতিতত্ত্ব „ গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন

২৩১। রূপার বিষ্ণুমূর্ত্তি (ফটো-সংগ্রহ) „ নগেন্দ্রচন্দ্র দেব

২৩২। হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক প্রেমামৃ „

২৩৩। হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক পারিজা শ্রীযুক্ত শশিধর চক্রবর্ত্তী

২৩৪। হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক
সত্যনারায়ণের পাঁচালী

২৩৫। রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন

২৩৬। ভারত-সাবিত্রী — শ্রীযুক্ত শশিধর চক্রবর্ত্তী

২৩৭। ময়মনসিংহের প্রচলিত গ্রাম্যভাষা — ”

২৩৮। প্রাকৃত-প্রকাশ বিবরণ — শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২৩৯। প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত ইতিহাস — ,, উপেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

২৪০। কৃষ্ণ-গুণার্ণব — ,, গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২৪১। সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ — ”

২৪২। ভাষাজ্ঞান-সাধন-গঠনম্ — শ্রীযুক্ত বিভূচরণ বটব্যাল

২৪৩। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক — ,, যদুনাথ রায়

২৪৪। অমরুশতক ও প্রাকৃত রামধন — ,, রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার

২৪৫। বিদগ্ধমুখমণ্ডল (ধর্ম্মদাস কবিকৃত)
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, কুমার-সম্ভব — ,, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য

২৪৬। পাথরের বাসুদেব মূর্ত্তি — রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্যচৌধুরী

২৪৭। ১৭৬১-৮১ সনের সাহ আলমের
প্রথম সময়ের প্রচলিত মুদ্রা — ,, ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী

২৪৮। পদ্মাপুরাণ ১৭২৯ শকাব্দে লিখিত — ,, নন্দকুমার রায়

২৪৯। দোলযাত্রা ইত্যাদি (শকাব্দা ১৬০০,
বঙ্গাব্দা ১৮০৫) — জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী

২৫০। জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দ — ”

২৫১। সেরপুরের ষোল আনির
জমীদারবর্গের দস্তখত (১৩২ বৎসরের) — ”

২৫২। দেবোত্তর সনন্দপত্র (১২২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত) — ”

২৫৩। দাসদাসী বিক্রয়ের প্রথা
(১২৯ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত) — ”

২৫৪। ৺ভীমনারায়ণ চৌধুরি-প্রদত্ত সনন্দ পত্র — ”

২৫৫। সেরপুরের ভূতপূর্ব্ব জমীদার
প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর মনুষ্য-
বিক্রয়ের নকল (১০০ বৎসরের) — ”

২৫৬। আর্য্যনারী, কুসুম-কোরক,
কুসুম-স্তবক—অতি পুরাতন
হস্তলিখিত পারসী গ্রন্থ দেওয়ান হাফেজ — শ্রীযুক্ত দেওয়ান আজিমদাদ খাঁ সাহেব

২৫৭।	সাহ আলম বাদসাহের মোহর ১	শ্রীযুক্ত দেওয়ান আজিমদাদ খাঁ সাহেব
২৫৮।	চারিয়ারি মুদ্রা ১	”
২৫৯।	গোপীনাথের পঞ্চরত্নের ও দোলমঞ্চের ফটো বাঁধান	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
২৬০।	রামেশ্বর নন্দীর ভিটা ও নবরঙ্গ বাজার খনিত নলদীঘীর ফটো বাঁধান ১	”
২৬১।	পুরাতন ইট কয়েকটি	”
২৬২।	আটিয়া মসজিদ- উত্তর-দৃশ্য	শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুহ
২৬৩।	আটিয়া মসজিদ	”
২৬৪।	আটিয়ার সমাধিস্থল	”
২৬৫।	আলোয়ার মন্দির	”
২৬৬।	পল্লীবিবরণ-সংগ্রহ	”
২৬৭।	ময়মনসিংহ জিলার পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ (প্রায় ৮০০ গ্রামের বিবরণ)	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার

প্রদর্শক—শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

১। সরকার বাজুহার অন্তর্গত পরগণা খালিয়াজুরির ভূমি বিক্রয় কবালা, তারিখ ১১৯২ বাঙ্গালা, পরগণা সন ১১৯৪, ১৫ই আশ্বিন। মূল্য ১৮৸০ (বর্ত্তমান মূল্য ২০০০৲) নিং গয়াপ্রসাদ ওম স্থানে রামশরণ ওম।

২। কবচ বা মনুষ্য বিক্রয় বা আত্ম-বিক্রয় কবালা। পণ্ডিত দাস নিজের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাসহ ৪ জন রামশরণ চৌধুরীর নিকট ৮৲ মূল্যে আত্ম-বিক্রয় হয়। ১১৯৩ পরগণা সন ১১৯৪, ২৭শা আষাঢ়, প্রাচীন তুলট কাগজ।

৩। কবচ—মোহন দেও প্রভৃতি তিন ভ্রাতা ও ভগ্নি ২৫৲ টাকাতে রামশরণ চৌধুরীর নিকট আত্মবিক্রীত হইল। ১১৯৩। ১১৯৫ পং সন ২৫ মাঘ।

৪। একখানা দলিল, তারিখ ১১৯৮, ১লা মাঘ লিখিতং রামশরণ সদারাম দাস ও খেরুরাম দাস। এই তিন জন শ্যামরায় জীবিত কালে দত্তক পুত্র রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষ্যস্বরূপ দলিল সম্পাদন করিয়াছেন।

৫। একখানা চিঠি ১২০০—২৪ ভাদ্র, লেখক হরিনারায়ণ সেন।

৬। একখানা চিঠি—লেখক হরিনারায়ণ সেন ১২০০—১২ ভাদ্র শ্যাম চৌধুরীর মাতা ঠাকুরাণীর নিকট।

৭। চিঠি—রঘুনাথ শর্ম্মা হইতে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র রায়, তারিখ নষ্ট, পত্র জীর্ণ।

৮। ১২০৪ সনের ১৫ই ফাল্গুন রাজচন্দ্র চৌধুরী বরাবর-লেখক শ্রীহরিনারায়ণ সেন।

৯। চিঠি—তাং ১২০০, ১৩ চৈত্র। লেখক রাধাকৃষ্ণ দাস-দে বরাবর শ্রীসোভারাম ওম প্রভৃতি।

১০। বাজার খরচ ফর্দ্দ তাং ১২০৪। ৩০শে কার্ত্তিক।

১১। চিঠি ও তৎপৃষ্ঠে বাজার খরচ— তাং ১২১৩।

১২। ১২১৪ সনে রাজচন্দ্র চৌধুরী বরাবরে বিনন্দরাম দেওয়া চাকুরীর সরখত।

১৩। ১২১৪ সনের চিঠি শ্রীশ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত বরাবর।

১৪। শতাধিক বৎসরের পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিঠি, লেখক কাশীশ্বর শর্ম্মণঃ।

প্রা ন হস্তলিখিত গ্রন্থ

প্রদর্শক—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহ।

পুথি	কাহার ভণিতা	পত্রাঙ্ক			লেখক	তারিখ
ঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী	উলানিবাসী দ্বিজ					
	দুর্গাপ্রসাদ	[illegible]	..	২৪ । ২৫	চন্দ্রকিশোর দাস	১২৩৮
উত্তরাকাণ্ড	কৃত্তিবাস	[illegible]	..	৪০ । ৪২	শেষ পাতা নাই	
পদ্মাপুরাণ	নারায়ণদেব প্রভৃতি	[illegible]	..	২০ । ২২	নারায়ণ দেবের বংশধরগণের গৃহে প্রাপ্ত	১২৬৩

দ্বিজবংশীদাস ও জানকীনাথ দাস প্রভৃতিরও ভণিতা আছে ।। এই গ্রন্থের ৫ম পাতের প্রথম পৃষ্ঠায় নারায়ণদেবের পরিচয় আছে

পুথি	কাহার ভণিতা	পত্রাঙ্ক			লেখক	তারিখ
[illegible]ার বন্ধন	নারায়ণদেব	২ পৃষ্ঠা	৩২ চরণ		ঐ	১২৫৯

নারায়ণদেবের গৃহের প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া লিখিত।

পুথি	কাহার ভণিতা	পত্রাঙ্ক			লেখক	তারিখ
তরণী সেনের যুদ্ধ	দ্বিজ অনন্তরাম	[illegible]	..	২৪	রামধন দাস	১২৫[illegible]
ভগবদ্গীতা	সঞ্জয়	[illegible]	..	১৪ । ১৬	জয়কৃষ্ণ নন্দী	১২১[illegible]
শুকতত্ত্বসার	” ”	[illegible] পৃষ্ঠা	..	৪০ । ৪৪	রামধন দাস	১২৫[illegible]
ভাস্কর পরাভব	গঙ্গারাম	১১ পৃষ্ঠা	..	৯০ । ৯২	কবির নিজ হস্ত লিখিত	১১৫৮ [illegible]

ভণিতা---মোণকরা [illegible] যদি ভাস্কর মইল। মনস্তুবাদ উড়াইয়া কবি গঙ্গারাম কইল ॥

পুথি	কাহার ভণিতা	পত্রাঙ্ক			লেখক	তারিখ
[illegible]য়ভাগ ব্যবস্থা	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য	৪৭ পাতা			৩৭ পাতা পর্যান্ত বাঙ্গালা, অবশিষ্ট সংস্কৃত।	

(প্রাচীন কাগজে পুস্তকাকারে লিখিত, নির্ঘণ্ট ও "গ্রন্থারম্ভে প্রণাম করিতেছি" আছে। লেখকের পরিচয় আছে। সন তারিখ নাই।

নিমাইসন্ন্যাস	বাসুদেব ঘোষ	৬	..	১৩ চরণ	বিষ্ণুরামনন্দী	১২০৯
	নরোত্তম দাসেরও ভণিতা আছে					
পদ্মাপুরাণ	দ্বিজ বংশী ও নারায়ণদেবের পরিচয় আছে।					অসম্পূর্ণ
নৈষধ-চরিত	দ্বিজ অনন্তরাম	৭৮	..	১০ । ১২	রামগোবিন্দ নাগ	১২৪০
জ্যোতিষ-সংগ্রহ	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১০৪ পৃষ্ঠ				পুস্তকের আকারে লিখিত	১২২৩

এই গ্রন্থের ১০৫ হইতে ১১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সংস্কৃত বচন। ইহার পর ৫ পৃষ্ঠা, গদ্য চিঠিপত্রাদি। গ্রন্থের প্রথম ভাগে নির্ঘণ্ট পত্রাদি ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

ক্রিয়াযোগসার	অনন্ত দত্ত	৬৯	..	২৮ চরণ	হরিনারায়ণ দত্ত ৩১শে বৈশাখ শুক্রবার	

ভণিতা— কহেন অনন্ত দত্তে সেজ রঘুনাথ সুতে রামকৃষ্ণরায়ের অনুজ।

ভারত সাবিত্রী	সঞ্জয়	১০ পৃষ্ঠা	..	২০ । ২২	রাজকৃষ্ণ নন্দী	১২২৭
ঐ	ঐ	১৯ পৃষ্ঠা	..	২০	বিষ্ণুরাম নন্দী	১২০৮

ইহাতে শ্লোকসংখ্যা অধিক ও এক স্থানে দাসগোপের ভণিতা আছে।

বিরাট পর্ব্ব	সঞ্জয়	৪৩	..	৪৮ চরণ	রাজকৃষ্ণ নন্দী	১২১০
দ্রোণপর্ব্ব	ঐ	৪৫	..	৩০	জয়কৃষ্ণ নন্দী	১২২৭
উদ্ধব-গীতা	বিষ্ণুরাম নন্দী	২৯	..	১৪ চরণ	কবির নিজ হস্তে লিখিত	১৬২৪

ভণিতা—শ্লোক ছন্দে রচিল গুণরাজ খানে। পয়ার ছন্দে রচিল বিষ্ণুরাম নন্দী মজুম॥

ভগবদ্ভক্তি রত্নাকর × ১০ ,, ২৪ চরণ হরেকৃষ্ণ দাস ১১৬৩

মণিহরণ গুণরাজ খাঁ ২২ পৃষ্ঠা ,, ২৬ ,, ,, ১২২৫

সুন্দরা কাণ্ড অদ্ভুত আচার্য্য ৫৫ ,, ২৬ ১১৯০

লবকুশের উপাখ্যান গঙ্গাদাস সেন, ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে।

সভাপর্ব্ব কাশীদাস বহু প্রাচীন গ্রন্থ (অসম্পূর্ণ।)

গীত মালসী দুর্গাপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, দ্বিজ গুরুদাস প্রভৃতির রচিত ১৪ পৃষ্ঠা

যোগশঙ্কর পুঁথি ২ পাতা পাওয়া গিয়াছে

কাশী বর্ণনা কাশী দর্শন করিয়া তাহার বিষয় গদ্যে লিখিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র গ্রন্থ, লেখকের নাম নাই, শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

পদ্মাপুরাণ নারায়ণ দ্বিজ বংশী } অসম্পূর্ণ

ঐ দ্বিজ বংশী

কৃষ্ণগুণার্ণব দ্বিজ বংশীদাস ২৯৫ পাতা পর্য্যন্ত আছে, ২ পৃষ্ঠা লিখা

ভণিতা— দ্বিজ বংশীদাস আনন্দে হরি গায়। তিন লোক গীতা এই বিরাশী অধ্যায়।

দুর্গাপুরাণ মুক্তারাম নাগ ১২৪ ২ পৃষ্ঠা লেখা ২৮ চরণ কবির নিজ হস্তলিখিত গ্রন্থ। ১১৮০

পদ্মাপুরাণ নারায়ণ দেব ২য় পৃষ্ঠা মুক্তারাম নাগের ভণিতা আছে। অসম্পূর্ণ

ঐ বৈদ্য জগন্নাথ, কৃপারাম দত্ত, দ্বিজ জানকী, বংশীদাস প্রভৃতির ভণিতা আছে।

ক্রিয়াযোগসার রামেশ্বর নন্দী ১৪২ পাতা ২ ,, ১৮। ২৯ কাশীনাথ নন্দী ১২০

পরিচয়— রামভদ্রতনয় নন্দী রামেশ্বর নাম, হাজরাদী বসতি স্থান নন্দীপুর গ্রাম। জগন্নাথের ভণিতাযুক্ত ১১৯৮

সভাপর্ব্ব	সঞ্জয়	৭৭ পৃষ্ঠা	পাতা পর্য্যন্ত আছে।			
শৈলপর্ব্ব	ঐ	২৫	২	১৬	রাধাকান্ত দাস	১৩৩৫
মোহমুদ্গর		২০	২	১৮	লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা	
উদ্যোগপর্ব্ব	সেখ রাজিব	১৪	২	৩৬	গোবিন্দপ্রসাদ দাস	১২০২
শক্তি (সৌপ্তিকপর্ব্ব)	সঞ্জয়	১৫	২	১৬	রাধাকান্ত দাস	১২২১
নৈষধ	লোকনাথ দত্ত	৪১	২	৪৪	শুকদেব দত্ত	১২১১
ভারত-সাবিত্রী	দ্বিজ গৌরীদাস	৮	২	৩০	মৃত্যুঞ্জয় বল	১২২৩
জিজ্ঞাসা পত্রিকা	*	*	*	*		*
স্বর্গারোহণ	সঞ্জয়	২৮	২	৩০,৪০	গোবিন্দদাস	১২২০
স্বপ্নাধ্যায়	*	৩	২	৪০	প্রসন্নচন্দ্র দাস	১১৬২
আশ্রমিক পর্ব্ব	কাশীরাম দাস	৩৬	২	১২	রাধাকান্ত দাস	১২৪৯
সৌপ্তিকপর্ব্ব	ঐ	১৯		অসম্পূর্ণ		
ঐষিকপর্ব্ব	ঐ	১৭	২	১৪		১২৬৮
সত্যনারায়ণ	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	১৭	২	১৬		১১৯৭
স্ত্রীপর্ব্ব	সঞ্জয়	১	অসম্পূর্ণ			
ঐ			ঐ		অতি প্রাচীন	

নৌকাকাণ্ড	„	৯	২	২০	গৌরমোহন দত্ত	১২২৭
রামা যুদ্ধ	গোপীনাথ	১৬৩	২	২০	রাধাকান্ত দাস	১২২৭
পদ্মাপুরাণ	দ্বিজ বংশীদাস	অসম্পূর্ণ				
মোহমুদ্গর	পরশুরাম দাস	১২	২	৩২	দীপনারায়ণ দেব দাস	১২০২
অরণ্যকাণ্ড	কৃত্তিবাস	২৬	২	৪৪	মধ্যের পাতগুলি অতি প্রাচীন	১২১৬
রামবনবাস	„	১৩	২	৩২	„ „ „	
বিদ্যাসুন্দর	ভারতচন্দ্র	অসম্পূর্ণ				
সত্যনারায়ণ	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	১	২	২৪	„ „ „	
শ্রীকৃষ্ণবিজয়	গুণরাজ খাঁ		১১ পৃষ্ঠা পর্যান্ত			
গঙ্গাযাত্রা মাহাত্ম্য	লক্ষ্মীকান্ত দাস	১	২	১০	„ „	১১২৩
স্ত্রী পুরুষ লক্ষণ	অসম্পূর্ণ	অতি প্রাচীন	১১৯	সত্যদেবের পাচালী অতি প্রাচীন অক্ষর অস্পষ্ট।		
মণিহরণ	গুণরাজ খাঁ	১০	২	২৪	ব্রজকিশোর দে	১২২৯
চৈতন্য বিষয়ক	নরোত্তম দাস	১২	২	২০	রামলোচন ঘোষ	১২০৬
ভ্রমর গীতা	যদুনাথ দাস	৯	২	১৪	„ „	
কর্ণমুনির পারণা (গোবিন্দ মঙ্গল)		১৪		৩২	„ „	
সহস্রধারা	অক্ষর বুঝা যায় না; অতি জীর্ণ গ্রন্থ।					
মহামগধ চরিত্র	„	১৬	২	১৬	„ „	১২২১

বীরবাহু বধ	*	২০	২	২০	*	১২১৭
লক্ষ্মী চরিত্র	*	৩			জয়লোচন দে	১২৪০
মঙ্গলচণ্ডী	*	১১			ঐ	১২৪০
শতস্কন্ধ বধ	*	২৬	অতি প্রাচীন			
সীতা উদ্ধার	কাশীরাম দাস	৮	৩	৩৬		১২৪০
বিদ্যাসুন্দর	ভারতচন্দ্র	অসম্পূর্ণ।	১৩২	বিরাটপর্ব্ব	সঞ্জয়	১০০ পাত, পর্য্যন্ত।
শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন	যাদবিন্দু দাস	৮	২	২৪	জয়লোচন দে	১২৪০

ভণিতা—রাধার কলঙ্ক কৃষ্ণ করিলেন দূর। যাদবিন্দু দাসে কহে করিল প্রচুর ॥

শরীর নির্ণয় (অসম্পূর্ণ)

পদ্মাপুরাণ নারায়ণদেব ২৬২ পাত সম্পূর্ণ গ্রন্থ ১১৯৬।

পদ্মাপুরাণ দ্বিজ বংশী ও নারায়ণ দেব ২০৮ সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

পদ্মাপুরাণ দ্বিজ বংশীদাস নারায়ণদেব

পদ্মাপুরাণ দ্বিজ বংশীদাস সংক্ষিপ্ত ২০৬ পৃষ্ঠা।

পারিজাত হরণ দ্বিজ পরশুরাম।

রামায়ণ উত্তর কাণ্ড * *

প্রহ্লাদ চরিত্র। লক্ষ্মীচরিত। মণিহরণ (নষ্টচন্দ্র উপাখ্যান) হরগৌরী সংবাদ। শান্তিশতক।

প্রদর্শিত আলোক চিত্রের তালিকা।

(চ)—পরিশিষ্ট।

(পূর্ব্বে প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে, ৪১—৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

(ছ)—পরিশিষ্ট।

শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয়ের অভ্যর্থনা কবিতা।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাং নমঃ।

মহামান্য ভূপতিবৃন্দ এবং সভ্য মহোদয়গণ! এতাদৃশী মহতী সভার উদ্বোধনের ভার মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করা কতদূর সুসঙ্গত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতেও অসমর্থ। যাহা হউক, সহৃদয় মহোদয়গণ আমার দোষ ত্রুটি ক্ষমা পূর্ব্বক নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করুন, ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা।

অম্লানং মৌলিমালোল্লুলিতকপিলরুগ্ধূলিলুব্ধালিজালম্
ব্যালোলোরালকালালকমমলকলালাঞ্ছনং যদ্বিলোক্য।
লেখালীলালিতালম্প্রবলবলকুলোন্মূলিনা শৈলরাজে
প্রহ্লন্না লীলয়া বো দলয়তু কলিলং লোলদৃক্ তচ্ছিবাস্যম্॥

গীতিচ্ছন্দঃ।

শান্ত জলধিসম গগন সুবিস্তৃত জিনি কত মরকতছত্র
গ্রহকুলসংযুত সৌর জগৎস্থিত রতন মাল্যসম তত্র।
মালা মধ্যমণি তুল্য সুসজ্জিত উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধরিত্রী
অগণিত-গিরিনদ-বিপিনসমন্বিত অগণিতজনপদধাত্রী।
চন্দ্রসূর্য্যকর-রঞ্জিত-মঞ্জুল জলধর-বেষ্টিত-অঙ্গে
সুন্দর সুবৃহৎ কন্দুকসন্নিভ সতত বিঘূর্ণিত রঙ্গে।
বর্ণিত অবনি কমলদলসন্নিভ বিভক্ত বহুতর অংশে
পূর্ণ-বিবিধমত-বর্ণসমন্বিত-মনুজ-বিহগপশুবংশে।
সর্ব্বশীর্ষমণি ধর্ম্মরত্নখনি ভারত ভবতলরাজ্ঞী
বিভব-বিবর্ণন কি শক্তি মম কহ অশক্ত কত কবি বাগ্মী।
রবিকর-রঞ্জিত মঞ্জু-তুহিনযুত হিমগিরি-মুকুট অমূল্য
বিমল-সরিৎকুল অমলমালাসম, জলনিধি কাঞ্চি অতুল।
উক্ত বর্ষবর বিভক্ত পুনরপি শত শত সুন্দর অংশে
পুণ্য-গাঙ্গজল বিধৌত সুবিমল বঙ্গ সকল অবতংসে।
সুজলসুফলযুত ষড়ঋতুবন্দিত মলয়-সুগন্ধিত অঙ্গ
শত শত নতি মম তব পদ সন্নিধি জননি অমৃতময়ি বঙ্গ।

বিপুল বঙ্গখানি উজলি বিমলমণি-ময়মনসিংহস্মৃতিকে
প্রফুল্লফুলময় অতুলা উপবন বিরচিল বিধি সুবিশিষ্টে।
ব্রহ্মপুত্র নদ বিধৌত করি পদ চলিত সতত চিত্তহর্ষে
স্নিগ্ধ মৃদুলতম অনিল সুনির্ম্মল শান্তি-অমৃত অভিবর্ষে।
রম্য হর্ম্ম্যময় অতুল নগরবর সুরপুর সদৃশ পবিত্র
শত শত মন্দির নৃপতি বসতিগৃহ শত শত বিপণি বিচিত্র।
পরম পরিষ্কৃত নগরবর্ত্ম যত সলিলসিক্ত অতি রম্য
প্রচলিত তদুপরি অশ্বশকটকুল নরকুল কান্ত সুসৌম্য।
অনুপম উপবন বাসিত চৌদিশি ফুল্ল কুসুম ধরি বক্ষে
পরম-সুসজ্জিত সৈনিক শত শত সতত নগর পরিরক্ষে।
কথিত নগরবর উজলি অধিকতর চিরবিস্মিত করি সব বিশ্ব
চতুর্থ বার্ষিক বিপুল সম্মিলন মিলিত অত্র নব দৃশ্য।
ক্ষুদ্র নিরতিশয় অযোগ্য নিশ্চয় অস্মৎকৃত পরিচর্য্যা,
লভহ সভাগণ দর্শি আত্মগুণ অনুগত-দত্ত সপর্য্যা।
লহ লঘু অর্চ্চন গণ্য-মান্যগণ করহ ভক্তজন ধন্য
লইলেন যদ্বিধ যদুকুল-ঈশ্বর বিদুর-সমর্পিত অন্ন।
অপূর্ব্ব অশ্রুত সমিতি সংগঠিত ধনি-গুণি-মিশ্রণ জন্যে
পবিত্র হইল জগৎত্রয় নিশ্চয় অনুপম নির্ম্মলপুণ্যে।
অধম অকিঞ্চন কি সাধ্য বর্ণিব পারিব জগৎপ্রসিদ্ধ
অসংখ্য নতি করি কহিব কথঞ্চিৎ মতি গতি মম অবিশুদ্ধ।

অমৃতকণিকা-ছন্দঃ

অয়ি অতুলন সমিতি-সদন
অরুণ-বরণ অঙ্গ,
অচপল জল উপরি অচল
কনক-কমল রঙ্গ।
ব্রততি নিচয় ফুল-ফলময়
নব-কিসলয়পূর্ণ,
ঝলিত দুলিত অতি সুললিত
গৃহ উজলিত তূর্ণ।

কনক রজত রচিত খচিত
কত অতুলিত মঞ্চ,
স্থিত তদুপর যত নৃপবর
জিনি দিনকর পঞ্চ।
গুণিগণ যত মুনি ঋষি মত
চরিত সতত কান্ত,
সুরগুরুসম মন অনুপম
হৃদয় পরম শান্ত।
সরল বদন সরল নয়ন
কলুষদলন বৃদ্ধ,
অতি অনুপম ধরম করম
প্রকৃতি পরম শুদ্ধ।
অতুল সমিতি কি মম শকতি
উচিত ভকতি দর্শি,
ক্ষমহ সুজন মম কুরচন
নিজ গুণ মন বর্ষি।

তোটকচ্ছন্দঃ।

করি সংনতি সংস্তুতি অষ্টমনে,
অভিনন্দি বিবন্দি সভাস্থ জনে।
পরিষৎ প্রতি সম্প্রতি যুক্তকরে,
করি উক্তি অভীপ্সিত কার্য্যতরে।
উভ বঙ্গ পুনশ্চ মহন্মিলনে,
করবদ্ধ বিশুদ্ধ সুকার্য্য-গুণে,
চিরশান্তি সমুন্নতি সর্ব্বজনে,
কর অর্পণ সজ্জন সদ্বচনে।

"সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদি-দিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরম্
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মান্দাকিনী মেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে।"

ওঁ শান্তিঃ

শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী

(জ)—পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন তৃতীয় অধিবেশনের (ভাগলপুরের) সভাপতি
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের অভিভাষণ।

বঙ্গসাহিত্য—১৩১৭ সাল।

নানাকারণে ১৩১৭ সালে বঙ্গদেশের সাহিত্যবীরগণ সম্মিলিত হইতে পারেন নাই, ১৩১৮ সালে নববর্ষারম্ভেই তাঁহারা মিলিত হইলেন; কিন্তু আমার বড়ই মনঃকষ্টের বিষয় যে, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন চিকিৎসকগণ আমাকে সম্মিলন-স্থলে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমি এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সাহিত্যবীরগণের সহবাসজনিত সুখ অনুভব করি এবং তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া জ্ঞানলাভ করি। দূরত্বানিবন্ধন যাইতে না পারায় আমি শোকসন্তপ্ত হইয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বিশেষতঃ সম্মিলন সম্বন্ধে আমার একটি কর্ত্তব্যও আছে, কিন্তু বিধাতা আমাকে সে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইতে বাধ্য করিলেন।

১৩১৭ সাল বঙ্গসাহিত্যের সুবৎসর বলিয়া আমার মনে হয় না। পূর্ব্বে বহু বৎসরের মধ্যে এরূপ অধিকসংখ্যক সাহিত্যিকের বিয়োগ ঘটে নাই। চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর রায় বাহাদুর সি, আই, ই, কবিবর রজনীকান্ত সেন বি এল, শিশিরকুমার ঘোষ, পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ধীরেন্দ্রনাথ পাল এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল প্রভৃতি সাহিত্য-রথিগণ বঙ্গদেশকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। জননী বঙ্গবাণীর এই সকল বিশিষ্ট ভক্তগণকে এই উপলক্ষে আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। বারাণসীর বিখ্যাতনামা সুধাকর দ্বিবেদীও আজ পরলোকগত।

বর্ত্তমান সাহিত্যসেবাসম্বন্ধে একটি কথা আমার মনে হইতেছে; তাহার উল্লেখ করাও প্রয়োজন মনে করিতেছি। বর্ত্তমান কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাপারে সাহিত্যসেবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এই দেশব্যাপী আন্দোলনে যাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধি বা অবিবেচনাবশতঃ সাহিত্যের অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের অপরাধের ফল প্রকৃত সৎসাহিত্যসেবীদিগকেও ভোগ করিতে হইতেছে। ন্যায়ান্যায় আশঙ্কায় সঙ্কুচিত থাকায় সহজ সরল

সাহিত্যরসস্রোতের অকুণ্ঠিত গতি পদে পদে বাধা পাইতেছে। এই দিক্ দিয়া, বঙ্গসাহিত্যের এক অংশে প্রকৃত সাহিত্যবৃত্তির স্ফুরণের বিশেষ অন্তরায় ঘটিতেছে। রচনার পদ্ধতি জটিল হইতেছে, ভাষা অসরল হইতেছে, ভাব খর্ব্ব হইতেছে, এক কথায় বঙ্গীয় সাহিত্যের একাংশে পূর্ব্বের সে অনায়াসগতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যাপারের সম্পর্কে, আরো এক ভাবে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে উভয় বিভাগের সাহিত্যের ভাষার তারতম্য বড় বেশী ছিল না- যাহা ছিল, তাহাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছিল। একই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উভয় বিভাগবাসীই এক হইয়া উঠিতেছিল। গ্রন্থরচনাভঙ্গী একই নিয়মের অধীনে থাকিয়া নিয়মিত হইতে-ছিল; উভয় খণ্ডই এক Text Book Committeeর (বিদ্যালয়ের পুস্তক-নির্ব্বাচন সভা) অন্তর্গত থাকায় বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থাবলী উভয়ত্রে একই নিয়মের বশবর্ত্তী ছিল। এই সকল ও অন্যান্য নানা কারণে বঙ্গভাষা দিন দিন উন্নতি ও পুষ্টির পথে অগ্রসর হইতেছিল। আধুনিক রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে ভাষার এই সাধারণ শ্রীবৃদ্ধির পথ বহুল পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের জন্য দ্বিতীয় Text Book Committee প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই পথ আরও স্থায়িভাবে অবরুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গের বহু পূর্ব্বে একবার এইরূপ দ্বিতীয় আর একটি Text Book Committee প্রতিষ্ঠা করিবার কথা হয়। সে সময় Sir Alfred Croft বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা ছিলেন। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, ভাষাবিভাগজনিত বঙ্গভাষার ক্ষতি হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি এবং অন্যান্য দূরদর্শী ইংরাজ ও দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা সমর্থন করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও তখন আপনার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এই অন্যায় প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহার সুফলও হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, যে গুরুতর যুক্তিনিবন্ধন তখন উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, সে যুক্তি এক্ষণে বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা হইয়াছে; তবে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এখনও একই আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষার প্রতি সুদৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সুখের বিষয়, এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বঙ্গের প্রায় যাবতীয় সাহিত্যরথিগণ বিভক্ত বঙ্গের বাধা বহন করিয়াও অবিভক্ত ভাবে একই স্থানে পূর্ব্ববঙ্গের এই সুপরিচিত সাহিত্যকেন্দ্রে সমবেত হইয়াছেন। আজ

এই সমগ্র সাহিত্যিকমণ্ডলীর নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই আশঙ্কাময় পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও একপথাবলম্বী হইয়া বঙ্গভাষা পরি-রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনকল্পে যথাবিহিত উপায় অবলম্বনে উদ্যোগী হন। বঙ্গবাসিগণ একত্র থাকিতে কৃতসংকল্প থাকিলে এবং ভাষার একতা রাখিতে যত্নবান্ হইলে বঙ্গবিভাগে সাহিত্যের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই ত আশঙ্কা ও অভাবের কথা। 'স্নেহঃ পাপমাশঙ্কতে'—তাই হয় ত উল্লিখিত দিক্‌টাই আরম্ভে অধিক মনে পড়িতেছে। এই বারে আশার কথা ও আনন্দের কথা বলিব। বিগত বৎসরে বঙ্গভাষা সাহিত্যসাধনার পথে কত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, নিম্নলিখিত বিস্তারিত আলোচনা হইতেই সমবেত সুধীবর্গ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

১৩১৭ সালে বঙ্গসাহিত্যের বহু বিভাগেই কতকগুলি ভাল ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। জীবন-চরিত-বিভাগে দুইটি নূতন ব্যাপার আরম্ভ হই-য়াছে। ভারতবর্ষে অনেকগুলি মুসলমান সাধু-সন্ন্যাসীর সমাধি আছে। এই সকল মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিলে, অনেক সদ্‌গুণের আদর্শ পাওয়া যায়। এত দিন বাঙ্গালাভাষায় এই সকল পীর-ফকিরের জীবন-চরিত লিখিবার কোন চেষ্টা ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে 'তাপসমালা' নামে ঐ সকল মহাত্মার জীবন-চরিত বাহির করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কয়েক খণ্ড বাহির হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়। এ বৎসর বগুড়ানিবাসী মুন্সী হামিদ আলি 'মোসলেম কর্ম্মবীর-চরিতমালা' নামে কয়েক জন মহাত্মার জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রীও 'ভারতের শিক্ষিতা মহিলা' নাম দিয়া বৈদিক কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত কয়েক জন শিক্ষিতা মহিলার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই শ্রেণীতে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-প্রণীত 'প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের বৃত্তান্ত' বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাসের 'নারীরত্নমালা,' দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'আর্য্যনারী' প্রভৃতি গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিলেও এরূপ ধরণের গ্রন্থের সংখ্যা যত বর্দ্ধিত হয়, ততই মঙ্গল। মুসলমান মহাপুরুষ-গণের জীবনচরিতের ন্যায় এবার 'চৈনিক ঋষি সি' নামে চীনদেশীয় এক সাধুর জীবন-চরিতও প্রকাশিত হইয়াছে। সৈয়দ শরাফৎ আলির চরিত 'হজরৎ মহম্মদের জীবন-চরিত' গ্রন্থখানি এবৎসরকার জীবনচরিত-বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে আনন্দের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, মুসলমান খলিফাদিগের জীবনচরিতমালা প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে এবং

তৎসংক্রান্ত 'আবু বকর' নামে প্রসিদ্ধ প্রথম খলিফার জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিবিধানকল্পে মুসলমান সহযোগীদের অধিকতর উৎসাহ আগ্রহ ও আনন্দের কথা। গত বৎসরে অনেকগুলি মুসলমান লেখককে বঙ্গভাষার সেবাব্রত গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আশান্বিত হইয়াছি। এই উপলক্ষে নবগ্রামনিবাসী মৌলবি সেখ আবদুল জব্বর মহাশয়েরও নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'আদর্শ রমণী' তন্মধ্যে অন্যতম। মোসলেম লীগের নাগপুর কনফারেন্সে হিন্দী ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার স্থানে উর্দ্দু প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু সুখের বিষয় যে, বঙ্গদেশে অনেক মুসলমান গ্রন্থকার বাঙ্গালাভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উর্দ্দু এখানে প্রচলিত হইলে, বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। জীবন-চরিত পাঠে বাঙ্গালী-পাঠকের যে আগ্রহ বাড়িতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কারণ, এই বৎসরেই নগেন্দ্রবাবুর রাজা রামমোহন রায়ের সুপ্রসিদ্ধ জীবনচরিতখানির পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই বিভাগে ৺দেবেন্দ্রনাথ দাসের আত্মজীবনচরিত স্বরূপ 'পাগলের কথা' নামক পুস্তক, গুরুদাস বর্ম্মণ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরিত' ও শ্রীবঙ্কবিহারী ধর-রচিত 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত' পুস্তক কয়খানিও বেশ হইয়াছে।

নাটকশ্রেণীতে এ বৎসর কতকগুলি সামাজিক প্রহসন বাহির হইয়াছে। প্রহসনের লেখক ধীরবুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শী এবং নাট্যরচনাপটু হইলে উল্লিখিত সামাজিক প্রহসন দ্বারা সামাজিক দোষ সংশোধনের আশা করা যায়, নতুবা কতকগুলি নিষ্ফল রচনায় সাহিত্য ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গত বৎসরের প্রকাশিত প্রহসনগুলির মধ্যে "চটকদার" নামবিশিষ্ট গ্রন্থ থাকিলেও তৃপ্তিপ্রদ রচনা দেখিলাম না। নাটকের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাজা' নামে উপনিষদের গূঢ়-রহস্য বিবৃত করিয়া একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শঙ্করাচার্য্য,' শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', শ্রীযুত ভবনাথ সরকারের 'বিধিলিপি', শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'দীনবন্ধু', শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বাঙ্গালার মসনদ' এবং শ্রীযুত রাধিকাপ্রসাদ দত্তের 'রণময়ী' প্রধান। দুই তিন বৎসর হইতে এই বিভাগে ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যা

বাড়িয়া গিয়াছে। নাটকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া লিখিত হয় বটে, কিন্তু অনেকগুলিতেই ঐতিহাসিক ঘটনার বিপর্য্যয় এবং নাটকত্বের অভাব দেখা যায়। গভর্ণমেণ্টের এ দিকে আপাততঃ যেরূপ তীব্র দৃষ্টি পড়িয়াছে, ঐতিহাসিক নাটক রচনার চেষ্টা প্রতিহত হইবে বলিয়া মনে হয়। বীরেন্দ্রনাথ রায় সুপ্রসিদ্ধ মুসলমানী সন্ন্যাসিনী উম্মলখয়ের রাবেয়ার জীবন-চরিত অবলম্বনে 'রাবেয়া' নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন। এইরূপ নূতন নূতন বিষয় অবলম্বনে নাট্যসাহিত্য পুষ্ট করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে।

উপন্যাস-বিভাগে নাম করিবার মত ভাল গ্রন্থ বড় বেশী প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের 'নরদেবী বা মায়া', দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'রাণী ভবানী' ও 'রাজা রামকৃষ্ণ' এবং ৺দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'শম্ভুরাম' এই কয়খানি মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ 'মণিভদ্র' নামে বৌদ্ধধর্ম্মমূলক একখানি উপাদেয় উপন্যাস লিখিয়াছেন। ছোট ছোট গল্পসংগ্রহের মধ্যে পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের 'ভক্তের জয়' খানি সর্ব্বপ্রধান। জলধর সেনের 'পুরাতন পঞ্জিকা', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেশী ও বিলাতী,' সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্ররেখা,' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুষ্পপাত্র' ও ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রণীত 'ঘরের কথা' এই শ্রেণীতে উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস শ্রেণীতে বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণ কয়েকখানি প্রাদেশিক ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। 'ময়মনসিংহের বিবরণ'-প্রণেতা কেদারবাবু ঢাকার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভবানন্দ সিংহ পূর্ণিয়া জেলার প্রাচীন ইতিহাস লিখিয়াছেন, পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী 'গৌড়ের ইতিহাস' দুই খণ্ড অতি সুন্দর রচনা করিয়াছেন। কুমুদনাথ মল্লিক 'নদীয়া-কাহিনী' নামে নদীয়া জেলার বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা সীতারাম রায় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জমীদারগণের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বীরভূম রাজবংশের ইতিহাস লিখিতেছেন, দুর্গাদাস লাহিড়ী বাঙ্গালা ভাষায় পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে এরূপ আর একখানি সুবৃহৎ ইতিহাসের সংবাদ আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি, বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাহাদুরের আনুকূল্যে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ইতিহাস রচিত হইতেছে। এই গ্রন্থ অতি বিপুলায়তন ও বহু তত্ত্বপূর্ণ হইবে।

শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য-কৃত 'হিন্দুরাজনীতি' এবং কামিনীকুমার ঘটক-রচিত 'কুলবোধিনী' পুস্তকদ্বয়ও বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য।

দুর্গাচরণ সান্ন্যাল ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে 'ভাষাবিজ্ঞান' নামে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন।

সমাজতত্ত্ব বিভাগে দুই জন চিন্তাশীল লেখকের দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-প্রণীত 'সমাজতত্ত্ব', অপরখানি ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত "জাতিভেদ"। বর্ণতত্ত্বের আলোচনায় কয়েক বৎসর বঙ্গসাহিত্যে বড় ক্ষিপ্রকারিতা দেখা যাইতেছে। গত বৎসরের কায়স্থ, বৈশ্য, সুবর্ণবণিক্, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতির ন্যায় নমঃশূদ্র, কপালী এবং সূত্রধরেরা আপনাপন জাতির উন্নতিকল্পে নানা পুস্তক, পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রিকাদি প্রকাশ করিয়া এই বিভাগে বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন।

'কায়স্থ-পত্রিকা', 'তিলিবান্ধব', 'কর্ম্মকারবন্ধু' 'সচ্চাষি-সুহৃৎ' 'নমঃশূদ্র,' 'মাহিষ্য-বন্ধু' ও 'যোগিসখা' প্রভৃতি সাময়িক পত্র এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতিষশাস্ত্র-বিভাগে শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী "শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামে ঐ নামীয় প্রাচীন জ্যোতিষগ্রন্থের সটীক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ ন্যায়বাগীশকৃত 'তর্কবিজ্ঞান' ন্যায়শাস্ত্র বিভাগ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম্মতত্ত্ববিভাগে শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের 'সনাতনী', আশুতোষ দেব-প্রণীত "মনুষ্য ইহলোকে ও পরলোকে," ভাগবতদাস-প্রণীত 'বেদান্তের আমি', ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল-প্রণীত 'আশ্রমচতুষ্টয়', কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত 'উপনিষদের উপদেশ ২য় খণ্ড', শ্রীক্ষিতিমোহন সেন-সঙ্কলিত 'কবীর,' শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-কৃত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ২য় ভাগ,' শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মা-কৃত 'পুরাণদর্শনসূত্রের উপক্রমণিকা' ও রমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতীকৃত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার পদ্যে বঙ্গানুবাদ' গ্রন্থগুলিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীঘাপতিয়ার বিদ্যোৎসাহী কুমার শরৎকুমার রায় এবং লালগোলার সাহিত্যবন্ধু রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর 'ভারতীয় শাস্ত্রপীটক' নামে ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী-শ্রেণীভুক্ত হইয়া এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত

হইতেছে। 'মাধ্যন্দিন শতপথব্রাহ্মণের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,' 'শ্রীভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ চলিতেছে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ে মিলিয়া উপনিষদ্‌গুলি সানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন, উপনিষদ্‌সংগ্রহ নামে উহার ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তিকা হিসাবে হেমেন্দ্রনাথ সিংহ-রচিত 'আমি,' 'জীবন ও হৃদয় ও মনের ভাষা'র নাম করা যায়।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কৃত 'শ্রীমন্ত সওদাগর' আর একখানি উল্লেখ-যোগ্য রচনা।

কাব্যবিভাগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলি' নামে একখানি উৎকৃষ্ট গীতিপুস্তক রচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শঙ্খ', ৺রজনী-কান্ত সেনের 'আনন্দময়ী', 'অভয়া' ও 'বিশ্রাম', শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী-প্রণীত 'রেখা', শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থরেণু' কোষকাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট রচনা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি বহুভাষার সৎকবির বহু খণ্ডকবিতার সুন্দর অনুবাদ। বহুকাল হইতে বাঙ্গালার কাব্যবিভাগে কোষকাব্য ও গীতিকাব্যের প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে। গল্প রচনা করিয়া বা বিষয়বিশেষ অবলম্বনে কাব্যরচনা অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। নবীন কবি সুখরঞ্জন রায় 'শুক্লা' নামে একখানি এই শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাব্যখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে বলা যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় দেশে প্রাচীন সাহিত্য-প্রচারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। তাহার ফলে প্রতি বৎসরেই আমরা প্রাচীন সাহিত্যের কয়েক-খানি নূতন গ্রন্থ পাইয়া থাকি। এ বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখা হইতে দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়', বঙ্গবাসি-কার্যালয় হইতে ক্ষেমানন্দের 'মনসা-মঙ্গল' ভাগবতাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' নিত্যগোপাল গোস্বামি-সঙ্কলিত 'কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য গ্রন্থাবলী', দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ', দ্বিজ রামপ্রসাদের 'কৃষ্ণলীলামৃত' ও 'মীরাবাইয়ের কড়চা' প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ শরীফের এক উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ৺চন্দ্রনাথ বসু-প্রবর্ত্তিত বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ, জৈমিনী ভারতের অনুবাদ এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র শাস্ত্রীর সটীক অনুবাদ শ্রীমদ্ভাগবত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি সম্পূর্ণ হইলে

উপাদেয় গ্রন্থ হইবে। উড়িয়া কবি কর্ণেল-রচিত সুবৃহৎ ছয় পালা সত্যনারায়ণ-পাঁচালী এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত কয়েক জন বিভিন্ন কবির রচিত সত্যনারায়ণ-পাঁচালী গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে।

ভ্রমণবিবরণ-বিভাগে গত কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালা গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বাঙ্গালী বড় জোর দেশের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়—বিদেশ-যাত্রী বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী নহে, সুতরাং ভ্রমণবিবরণমূলক গ্রন্থে সাহিত্য ও সমাজের যে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, সেরূপ ভ্রমণবৃত্তান্ত বাঙ্গালী গ্রন্থকারের নিকট বড় বেশী পাইবার আশা নাই, শিক্ষার ব্যপদেশে বাঙ্গালী ছাত্রেরা ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে গিয়া থাকেন। কোন কোন ছাত্র স্ব স্ব শিক্ষাস্থানের যাতায়াতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, এ শ্রেণীর সাহিত্যে সেইগুলি প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। এই হিসাবে গত বৎসর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'জাপান', মন্মথনাথ ঘোষ-প্রণীত 'জাপান প্রবাস' নামক গ্রন্থ পাইয়াছি। সুবিদ্বান ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রমণকারী, ইতিপূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে 'চীনভ্রমণ' উপহার দিয়াছেন, এবারে তাঁহার কাছে 'বিলাত ভ্রমণ' পাইয়াছি। এতদ্ভিন্ন গত বৎসর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সেতুবন্ধ-যাত্রা', গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা হইতে আসাম', প্রাণ-কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রনাথ-দর্পণ', ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর 'ভারত-ভ্রমণ' এবং প্রভাতচন্দ্র দোবের 'দার্জ্জিলিং' নামে কয়েকখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, শেষোক্ত পুস্তকদ্বয় বিপুলায়তন ও বহুচিত্রবিশিষ্ট এবং নানা জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ। আর এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের উপাদেয় গ্রন্থ গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানি বিপিনচন্দ্র পালের "জেলের খাতা"; এ খাতায় তিনি যে সকল হিসাব নিকাশের কথা কহিয়াছেন, তাহা লোকে মনোযোগ দিয়া পড়িলে, অনেক অপব্যয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

স্বাস্থ্যবিভাগে ডাক্তার চুনীলাল বসুর 'খাদ্য', ডাক্তার কালীপ্রসন্ন সিংহের 'আমিষ ও নিরামিষ ভোজন' এবং যোগেন্দ্রমোহন ঘোষের 'ব্রহ্মচর্য্য' পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসাবিভাগে এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদীয় ও বাইও-কেমিক চিকিৎসা-প্রথা অনুসারে গত বৎসরে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'বৃহৎ পশু-চিকিৎসা' নামক গ্রন্থ বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। চারুচন্দ্র ঘোষ-কৃত "বেরি-বেরি" পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

শিল্প ও ব্যবসায়-বিভাগে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "ব্যবসায়ী" ও শীতলচন্দ্র দত্ত-প্রণীত "শিল্পবান্ধব" পুস্তকদ্বয় এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ধনাগমশূন্য বঙ্গদেশে আদরযোগ্য, সন্দেহ নাই। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে গত পূর্ব্ব বৎসর একটি প্রস্তাব হইয়াছিল, ভাষার পুষ্টির জন্য এবং ভাষাশিক্ষার জন্য বঙ্গভাষার সাহায্যে অন্যান্য ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। সুখের বিষয়, গত বৎসরেই এ দেশে সেই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইয়াছে। ঢাকাবাসী মুন্‌সী মহম্মদ হোসেন বঙ্গভাষায় প্রাথমিক উর্দ্দু ব্যাকরণ এবং মালদহের মৌলবি আবদুল গণি 'বঙ্গ-আরবী ব্যাকরণ' ও ত্রিপুরানিবাসী ঠাকুর রাধামোহন দেববর্ম্মা 'ত্রৈপুর কথামালা' রচনা করিয়াছেন।

সঙ্গীত-সাহিত্যে নানাবিধ গীত-সংগ্রহ ব্যতীত গত বৎসর হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত 'গোপাল উড়ের টপ্পা' প্রকাশিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে প্রাচীন কবির গান, প্রাচীন কবির পদাবলী, কীর্ত্তন গান, ঢপ-সঙ্গীত, কীর্ত্তন-সঙ্গীত প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে, তজ্জাও অনেকগুলি সংগ্রহ হইয়াছে। নিরক্ষর কবির গান, জারির গান, সারার গান প্রভৃতিও কিছু কিছু সংগ্রহ হইয়াছে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় ভাদু ও ঝুমুর গানের এখনও বিশেষ প্রচলন আছে। এতদিন এইগুলি সংগ্রহের কোন চেষ্টা হয় নাই। গত বৎসর তিন চারখানি ভাদু-সঙ্গীত ও চার পাঁচখানি ঝুমুর-সঙ্গীত সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

গত পূর্ব্ব বৎসর কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "ধ্বংসোন্মুখ বঙ্গীয় হিন্দুজাতি" নামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। গত বৎসর পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ' নামে সেই নিবন্ধের প্রতিবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মূর্ত্তিপূজা', কুমার অনাথকৃষ্ণ দেবের 'দুর্গাপূজায় বলি ও জীববলি', ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলাপ' এই তিনখানি সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য পুস্তকেরও নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সরল ভাষায় উচ্চ বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রচারার্থ কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সকল বক্তৃতার অনুষ্ঠানকল্পে যে প্রবন্ধে মুখবন্ধ করিয়াছিলেন, 'মায়াপুরী' নামে সেই উপাদেয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতি ও সংস্কারকল্পে গত বৎসর ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

'বঙ্গীয় নাট্যশালা' নামে এক খানি উৎকৃষ্ট সমালোচনা পুস্তক লিখিয়াছেন। নাট্যামোদী ও নাট্যব্যবসায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির এখানি একবার পড়া উচিত।

বহু ভাষায় কথোপকথন শিক্ষার জন্য প্রভাতচন্দ্র মজুমদার 'হরবোলা' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজী, হিন্দী, ব্রহ্মী, চীন, তামিল, তেলেগু ও বাঙ্গালা ভাষার ছোট ছোট বাক্য রচনার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। বিনয়কুমার সরকারের 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা' উল্লেখযোগ্য।

রহস্যাত্মক রচনার মধ্যে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফোয়ারা' ও আশুতোষ মিত্রের 'জ্যাঠামহাশয়' নামে যে দুখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সেই দুখানিই উপভোগ্য হইয়াছে, বলিতে পারা যায়।

শিশুপাঠ্য সাহিত্যে এবার কতকগুলি সুন্দর পুস্তক রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ললিতবাবুর 'গল্প ও ছড়া', অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-রচিত 'চণ্ডী', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝুমঝুমি', যোগীন্দ্রনাথ সরকার-প্রকাশিত 'লঙ্কাকাণ্ড,' 'সাবিত্রী-সত্যবান,' 'শকুন্তলা' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

এই ত গেল বঙ্গভাষার নানা বিভাগে প্রকাশিত পুস্তকাবলার কথা। মাসিক সাহিত্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাগজের নাম করা যাইতে পারে। যতগুলি উৎকৃষ্ট পত্রিকা আছে, তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বামাবোধিনী'র জীবন অতি দীর্ঘ, তৎপরেই ভারতী, নব্যভারত, সাহিত্য, উদ্বোধন, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, অর্চ্চনা, সাহিত্য-সংহিতা প্রভৃতি পুরাতন পত্রিকাগুলি এবং মানসী, বাণী, সুপ্রভাত, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি নূতন পত্রিকাগুলি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রবন্ধ-গৌরবে ও সুসৌষ্ঠবে ইহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। 'ভিষগ্‌দর্পণ,' 'কৃষক,' 'মহাজন-বন্ধু,' ও 'শিল্প ও সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ আদর লাভ করিয়া থাকে। মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত যশোহরের 'হিন্দুপত্রিকা,' ঢাকার 'ব্রহ্মবাদী' ও "ভারত-মহিলা," বীরভূমের "বীরভূমি," কাসিমবাজারের "উপাসনা" কাশীর "ধর্ম্মপ্রচারক" প্রভৃতি মাসিকপত্রও উল্লেখযোগ্য। শিশুশিক্ষার উপযোগী "মুকুল" এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মধ্যে কলিকাতার বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, হিতবাদী ও বসুমতীর সমকক্ষ পত্র আর নাই। তৎপরে কলিকাতার হিন্দুস্থান, সময়, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং মফঃস্বলের এডুকেশন গেজেট, চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ঢাকাপ্রকাশ, শিক্ষা-সমাচার, চারুমিহির, বরিশাল-হিতৈষী, কাশীপুর-নিবাসী,

জ্যোতিঃ, পরিদর্শক, বীরভূমবার্ত্তা, নীহার, বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী, পল্লীবাসী, প্রসূন, নওয়াখালী-সম্মিলনী, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, চব্বিশ পরগণা-বার্ত্তাবহ, খুলনাবাসী, যশোহর, কল্যাণী, পল্লীবার্ত্তা, গৌড়দূত, মালদহ-সমাচার, জাগরণ, মেদিনীপুর-হিতৈষী, রত্নাকর, হিন্দুরঞ্জিকা, প্রতীকার, মুরশিদাবাদ-হিতৈষী, পাবনা-হিতৈষী, প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার সংবাদপত্র দ্বারা লোক-শিক্ষার এবং শিক্ষা-প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে।

উপসংহারকালে আর একটি মাত্র কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। এই ময়মনসিংহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা আজ কয়েক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার কার্য্য সুশৃঙ্খলেই চলিতেছে। ইহার প্রতি এখানকার লোকের কতকটা শ্রদ্ধাও জন্মিয়াছে বলিতে হইবে, নতুবা ইহা বাঁচিয়া থাকিয়া আজ এই বিরাট সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিতে পারিত না; কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, এখানকার ধনী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের আরও সাহায্য এবং আরও সহানুভূতি ইহার আবশ্যক। শাখাগুলি যাহাতে মূল পরিষদের প্রবর্দ্ধমান গৌরব রক্ষা করিয়া স্ব স্ব কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, সাহিত্য-সংস্কার, সাহিত্য-রক্ষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে পারে, শাখার পরিচালকগণের সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মূল-পরিষদের সভাপতিরূপে এ সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা বলিবার অধিকার আমার বোধ হয় আছে। সাহিত্য-পরিষৎ যে শুভ ব্রত লইয়া নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও ক্রমশঃ যেরূপ শক্তিশালিনী ও কার্য্যকুশলা হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গদেশের বাহিরে, এমন কি, ভারতবর্ষের বাহিরেও যেরূপ ইহার সদস্য সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ইহা দিন দিন সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে এখন বিভিন্ন দিক্ হইতে আশ্রয় দিয়া, অবলম্বন দিয়া, ইহার রক্ষাবিধান ও বিস্তৃতিসাধন করা দেশের প্রত্যেক হিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি ও সে জন্য তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি। দেশের বর্ত্তমান ও অভি-নব সকল প্রকার সাহিত্য-চেষ্টার সহিত যাহাতে পরিষদের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা দেশের লোকের কর্ত্তব্য মনে করি। ইহা করিতে পারিলে পরিষৎ একদিন সাহিত্য-বিষয়ে আশানুরূপ শক্তিশালিনী হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। শাখা-পরিষৎগুলিও যাহাতে এইরূপে স্ব স্ব কেন্দ্রে সাহিত্য-চেষ্টার নেতৃত্ব করিতে পারে, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

ময়মনসিংহ এরূপ একটি প্রবর্দ্ধমান অনুষ্ঠান হাতে পাইয়াও যদি তাহাকে প্রকৃত পথে চালিত করিয়া ইহার গৌরব রক্ষা এবং স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে, ময়মনসিংহকে নিন্দার ভাজন হইতে হইবে। আশা করি, এই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রভাবে আজ যে উৎসাহ, যে একতা এবং একক্রিয়তা দেখিতেছি, তাহা স্থায়ী হইবে এবং তাহা শাখা-পরিষৎটিকে অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

আজ এখানে ময়মনসিংহের অধিকাংশ জমিদার, ধনী এবং গণ্যমান্য প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত। আমি প্রত্যেককে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনাদের আশ্রয়ে পরিষদের এই শাখাটি যাহাতে পরিষদের গৌরব রক্ষা করিয়া আপনাদেরও মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষা করিতে পারে, তৎপ্রতি আপনারাই দৃষ্টি রাখিবেন। এই অনুরোধটিকে আমার ব্যক্তিগত অনুরোধরূপে গণনা করিয়া লইয়া ইহা রক্ষার ব্যবস্থা করিলেও আমি একান্ত বাধিত হইব। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি রোগ-পীড়িত হইয়া আজ আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলাম না, সে জন্য আপনারা আমার উপর বিরক্ত হইয়া আমার এই অনুরোধটি উপেক্ষা করিবেন না। আসুন, সমগ্র বঙ্গের সমস্ত সন্তান এক ভাষা-জননীর ক্রোড়ে বসিয়া, তাঁহার স্নেহে বিবর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহাকে সকল দিক্ হইতে উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তুলি এবং সমগ্র জগতের নিকট তাঁহাকে শোভাময়ী, বরণীয়া এবং আদরণীয়া করিয়া তুলি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে, নিয়মগুলি বর্ত্তমান সম্মিলনে বিবেচিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইবে।

(ঝ)—পরিশিষ্ট।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সুসঙ্গাধিপতি

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি, এ,

মহাশয়ের অভিভাষণ।

"নানা বেদ পুরাণ দর্শনকথা বিজ্ঞান কাব্যস্মৃতি
ছন্দো ব্যাকরণাভিধানগণিতালঙ্কারপারংগতাঃ।
যস্যাস্তে তনয়া গুণৈকনিলয়া বাণীপ্রিয়া সন্তত্বং
শ্রীমদ্‌ভারতমাতরং ভগবতীং তাং রত্নাগর্ভাস্তুজে॥"

যাঁহার কৃপাবিন্দু—

"বাচালং বিকলং খলং শ্রিতমলং কামাকুলং ব্যাকুলং
চণ্ডালং তরলং নিপীতগরলং দোষাবিলঞ্চাখিলম্॥"

করে, তাহারই মঙ্গলময় ইচ্ছায় বঙ্গের বাণীপুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যের চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ মানসে, বঙ্গের সুদূর প্রান্তস্থিত মানস-সরোবরোত্থিত পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্ত্তী, এই ক্ষুদ্র ময়মনসিংহ নগরীতে আগ্রহান্বিত ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সমবেত হইয়াছেন; ইঁহাদের সমাগমে এই নগরী অদ্য পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অদ্যকার এই মিলন ময়মনসিংহের ভবিষ্য ইতিহাসে একটী চিরস্মরণীয় দিবস বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহের পক্ষে এই প্রকার ভাগ্যোদয় আর কখনও হয় নাই। মিলনক্ষেত্র মাত্রই চিরকাল ভারতে তীর্থক্ষেত্ররূপে ঘোষিত হইয়াছে। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি ঋষি-দিগের মিলনস্থান ভারতের পবিত্র তীর্থ। সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের অনেকেই বহুক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও, এক মহান্ উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা আজ কি দিয়া তাঁহাদের সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করিব, কি উপকরণে অতিথি সৎকার করিব তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; তবে এইমাত্র জানি যে "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা" সেই ভরসাতে হীনসম্বল হইয়াও, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি উপহারসহ ভক্তবৃন্দের অভ্যর্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি; ভরসা করি আমাদের এই উপহার উপেক্ষিত হইবে না। বহুতর যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও আমার উপর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির

পদ অর্পিত হওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি; কিন্তু আমি এই বরণীয় পদোচিত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব কি না, তাহা বলিতে পারি না। সমগ্র ময়মনসিংহবাসীর পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগত ভাবে হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া মহোদয়গণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলনীর শুভ উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া আমাদের সর্ব্ব-প্রকার ত্রুটি মার্জ্জনা করুন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনী আজ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, অতএব ইহার এখনও শৈশবাবস্থা। যাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছায় বিগত তিনবর্ষ ক্রমান্বয়ে বহরমপুরে, ভাগলপুরে ও রাজসাহীতে ইহার বাৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহার অপার করুণাবলে বর্ত্তমান অধিবেশনের কার্য্যও সুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সম্মিলনী ক্রমে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করতঃ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবেন। বাণীবিদ্যাবিধায়িনী, শ্বেতপদ্মাসনা, বীণাপুস্তক-রঞ্জিতহস্তা সর্ব্বশুক্লা বাগ্‌দেবী আমাদের কার্য্যের সহায় হউন।

যে বঙ্গভাষা বহুকাল উপেক্ষিতা হইয়া দীনহীন বেশে বঙ্গগৃহে বিরাজমানা ছিলেন, তিনি সম্প্রতি কোন অদৃশ্য মন্ত্রশক্তিবলে উদ্বোধিতা হইয়াছেন; চারিদিক হইতে কি যেন একটা উৎসাহের প্রবল উদ্দীপনা আসিয়া নিদ্রিতা ভাষাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এখন আর তিনি দীনা, কৃশা ও উপেক্ষিতা নহেন, তিনি ক্রমে হৃষ্টপুষ্টা লাবণ্যময়ী ও সর্ব্বাভরণভূষিতা হইয়া আমাদের সমক্ষে বরাভয় হস্ত লইয়া তাঁহার লাবণ্যছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করতঃ কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছেন। আসুন আমরা সকলে তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণত হই, তিনি আমাদের প্রতি কৃপানেত্রে চাহিবেন এবং আমাদের অশেষ কল্যাণবিধান করিবেন। ভাই বঙ্গবাসিগণ! তোমরা সকলে তাঁহার গলদেশে নানারত্নবিভূষিত কণ্ঠহার পরাইয়া দাও, তিনি জগতের সমক্ষে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীরূপে দণ্ডায়মানা হউন এবং আমরাও তাঁহাকে দেখিয়া দুর্লভ মানব জন্ম সফল করি।

বঙ্গভাষার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্রোতস্বতী সমূহ, কোনটী বা নির্ম্মল বারিরাশি বহনকরতঃ, কোনটী বা নানাবিধ আবর্জ্জনাপূর্ণ পঙ্কিল জলরাশি ধারণ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে অথবা প্রবল তরঙ্গভঙ্গ বিস্তার করতঃ বঙ্গসাহিত্যরূপ বিশাল সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, এইগুলির সমস্ত সুস্বাদুতোয়া নহে, তথাপি

সকলেরই গতি সাগরাভিমুখী। সাহিত্যসাগরেও নানাবিধ রত্ন ও নক্র কুম্ভীরাদি বর্ত্তমান, কিন্তু সাহিত্যের অতলস্পর্শ জলধিগর্ভ হইতে নিপুণ-রত্নগ্রাহীর ন্যায় বহুমূল্য রত্নরাজি আহরণ করতঃ সুশোভন মাল্য গ্রথিত করিয়া বঙ্গভাষার গলদেশে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন ও মহিয়সী করিয়া তুলাই আমাদের কর্ত্তব্য, ইহা করিতে পারিলেই আমাদের জাতীয় গৌরব রক্ষিত হইবে এবং সম্মিলনীর জন্মগ্রহণেরও সার্থকতা হইবে।

বঙ্গসাহিত্য ও ভাষা কতকালের এবং তাহার মূল প্রস্রবণ কোথায়, এ সমস্ত তত্ত্বের অনুসন্ধানপ্রয়াস আমার অধিকার বহির্ভূত, অতএব অদ্য এ বিষয় কোনও আলোচনা সমীচীন নহে। মহাকবি জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী হইতেই যে চিরকোমলতাময়ী সুললিত বঙ্গভাষা ক্রমে উন্মেষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অপরিসীম প্রতিভাদ্বারা যে তাহা ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতঃপর কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, দাশরথি রায়, নিধুবাবু প্রভৃতি কবিগণ এবং রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারিচাঁদ সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত গুপ্ত, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার সরকার, প্রভৃতি মহামনস্বী বঙ্গ-সন্তানগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং প্রতিভাবলে বঙ্গভাষা আজ মোহনমূর্ত্তিতে আমাদের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার এই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া জগৎবাসী বিমুগ্ধ হইয়াছে এবং আমাদের আশা হইয়াছে এবং আমাদের আশা হইতেছে তিনি অচিরাৎ ভাষা জগতে অতি বরণীয় স্থান অধিকার করিবেন।

ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, বাঙ্গালী হইয়া যিনি বঙ্গভাষার আলোচনায় হতশ্রদ্ধ, তিনি নিতান্ত হতভাগ্য। এতাদৃশ ব্যক্তি অন্য বহু গুণান্বিত হইলেও তিনি প্রশংসার্হ নহেন। বর্ত্তমানকালে আমরা যে প্রবল পরাক্রান্ত, পরমবিদ্যোৎসাহী ও অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন জাতির শাসনাধীনে বাস করিতেছি, তাঁহার কৃপায় পৃথিবীর নানাভাষার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলেই আমরা ঐ সমস্ত ভাষার রত্নরাজি আহরণ করতঃ বঙ্গভাষার রত্নভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারি। এই সুযোগ

অবহেলায় হারাণ আমাদের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হইবে না। পক্ষান্তরে অমৃতনিস্যন্দিনী অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, জগন্মোহিনী সংস্কৃত ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে আমাদিগকে পরিণামে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। উক্ত ভাষার রত্নসমূহ সংগ্রহ করতঃ পৃথিবীর কত জাতি ধনী হইতেছেন, পক্ষান্তরে সেই সমস্ত আমাদের গৃহকোণে ধূলিধূসরিত অবস্থায় হতাদরে ক্রমে বিলয়দশা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সময় থাকিতে সতর্কতাবলম্বন সর্ব্বথা বিধেয়। পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহার বৃদ্ধিসাধন-চেষ্টাই সুধীজনসম্মত। পরধনে সমৃদ্ধ হওয়া তত সহজসাধ্য নহে।

বঙ্গভাষায় বহু কাব্য নাটক, উপন্যাস, প্রহসন প্রভৃতি রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু নিতান্ত লজ্জা ও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে তন্মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থের রুচি এতই বিকৃত যে তদ্দ্বারা ভাষার অঙ্গ পুষ্ট না হইয়া পক্ষান্তরে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইতেছে এবং দেশেরও মহা অনিষ্ট হইতেছে। সময়োচিত ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ক্রমে ভাষার দুর্ব্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহার দুরবস্থারও একশেষ হইবে। ভরসা করি সম্মিলনী উপযুক্ত ভেষজ-প্রয়োগের চেষ্টা করিবেন। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভৈষজ্যতত্ত্ববিষয়ক ও গণিতাদি শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গ-ভাষায় বিরলপ্রচার। সুখের বিষয় অধুনা এবম্বিধ গ্রন্থাদি প্রচারের সময়োচিত প্রয়াস দেখা যাইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ বটে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিত্তত্ত্ব, রত্নতত্ত্বাদি বিষয়ে কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু বঙ্গের কোনও কোনও সুসন্তান এসকল বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশেও মনোনিবেশ করিয়াছেন, ভরসা হয় অচিরে বঙ্গভাষার এ সমস্ত অভাব পূর্ণ হইবে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতে হইলেই কতকগুলি পারি-ভাষিক শব্দ সঙ্কলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ও সাহিত্য সভা" প্রভৃতি বোধ হয় এবিষয়ে সমুচিত চেষ্টা করিবেন এবং করিতেছেন।

প্রাচ্য-জ্ঞান (পারমার্থিক জ্ঞান) ও পশ্চাত্য বিজ্ঞানের (জড়বিজ্ঞান, গণিত ও শিল্প শাস্ত্রাদির) সমন্বয় সাধন দ্বারাই সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং সভ্যতার বোধ হয় ইহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রকার চেষ্টা যত সত্বর ফলবতী হওয়া সম্ভবপর পৃথিবীর অপর কোন

জাতির পক্ষে তাহা তত অনায়াসসাধ্য নহে। আমার মনে হয় বাঙ্গালীই এই সমন্বয়ের প্রথম পথ-প্রদর্শক হইবেন এবং ভারতবর্ষে বঙ্গভাষাই এ সম্বন্ধে অগ্রগণ্য হইবে। অদ্য যে মহাত্মাকে আমরা সভাপতির পদে বরণ করিতে আহ্বান করিয়াছি এবং যাঁহার ছাত্রগণ মধ্যে আমি অন্যতম বলিয়া একটু গর্ব্ব করিতেও সাহসী হইতেছি, সেই স্বনাম-ধন্য, বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, স্বোদ্ভাবিত অপূর্ব্ব যন্ত্র সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ভারতের সনাতন বেদবাক্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে তিনি জগতের সমক্ষে ইহাও দেখাইয়াছেন যে হিন্দুর প্রতিভা নির্ব্বাণোন্মুখ হইলেও অদ্যাপি তাহা একেবারে ভস্মীভূত হয় নাই, তাহাতে জ্ঞানের ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে তাহা পূর্ব্ববৎ পুনঃ সমুজ্জ্বল হইবে এবং তাহার পবিত্র ও স্নিগ্ধ রশ্মিজালে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিতে পারে। "একং সদ্বিপ্রাবহুধা বদন্তি" এই বৈদিক বাক্যের সত্যতা ক্রমেই পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া তাঁহাদিগকেও বিস্মিত করিয়াছে। বঙ্গের সুসন্তানের এই কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিবে।

এইজন্যই বলিতে সাহসী হইয়াছি যে বঙ্গবাসীই সর্ব্বাদৌ জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয় প্রদর্শনের পন্থা দেখাইবেন। সেদিন বোধ হয় বহুদূরবর্ত্তী নয়, যেদিন পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই গভীর বেদবাক্য মেঘমন্দ্র স্বরে প্রতিধ্বনিত হইবে এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিগণ যে এক সময়ে জ্ঞানের উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হইবে এবং সমগ্র জগত বিস্ময়ে তাঁহাদের চরণে ভক্তিভাবে প্রণত হইবে।

আজিকার আনন্দের দিনে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য সম্রাট ৺রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যদিও নশ্বর দেহে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই, তথাপি তাঁহার অমর আত্মা মানব চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে আমাদের এই সম্মিলনীর উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না এবং আমাদের উপর অমোঘ আশীর্ব্বাদরাশি বর্ষণ করিতেছেন না তাহা কে বলিতে পারে? চন্দ্রকান্তের প্রতিভার স্নিগ্ধো-জ্জ্বল রশ্মিজাল চিরতরে তিরোহিত হইলেও, তাহার কিরণছটায় যে বঙ্গের প্রতিগৃহ আলোকিত হইয়াছে তাহা নিভিয়া যাইবে না। রজনীকান্তের বীণা নীরব হইলেও তাঁহার বাণী আজও আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে

পশিয়া” প্রাণ মন আকুল করিতেছে। চন্দ্রনাথের গভীর গবেষণার গম্ভীর ধ্বনি অদ্যাপি আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইঁহারা সকলেই শান্তি-ধামে চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যশোরাশি চিরকাল তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিবে; অতএব এই আনন্দের দিনে তাঁহাদের জন্য আর অশ্রুপাত করিয়া তাঁহাদের আত্মার অকল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছা করি না। “জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্য হি” এই ভগবদ্‌বাক্য মনে রাখিয়া শোক-সম্বরণ করতঃ ভগবানের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে অচিরে ইঁহাদের স্থান ও অভাব পূর্ণ হউক, ভগবান্ আমাদের কাতর প্রার্থনা অবশ্য শুনিবেন।

আমি অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করতঃ আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি, এইজন্য সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যের তরুমূলে সুশীতল বারি সেচন মানসে যে সমস্ত মহাজন সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং প্রযত্নে এই তরু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতঃ অচিরে মুকুলিত হউক এবং তাহা কালে সুদৃশ্য পুষ্পে বিশোভিত এবং সুমধুর ফলভরে অবনত হইয়া তাহার স্নিগ্ধছায়া দানে বঙ্গ-সন্তানগণকে অপার শান্তি প্রদান করুক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। বাণীচরণাশ্রিত বাণী পুত্রগণের মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনেই আমাদের অধিকারমাত্র, ফলাফল তাঁহারই হাতে। আসন গ্রহণ করার পূর্ব্বে “অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু” বলিয়া পুনরপি সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি, এবং উপসংহারে নিবেদন করিতেছি যে—

“যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥”

(ঞ)—পরিশিষ্ট।

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত-রচিত

অর্ঘ্য।

স্বাগত সজ্জনবর্গ—জননীর সুকৃতি সন্তান।
প্রভাতের স্বর্ণ রশ্মি, বিহঙ্গের ললিত সুতান,
প্রফুল্ল প্রসূনপুঞ্জ, মলয়ের মৃদুল হিল্লোল,
সিন্ধুর উত্তাল গীতি, তটিনীর মধুর কল্লোল
অক্ষমের মুক্ত হৃদি, দরিদ্রের কুটীর প্রাঙ্গণ
তোমা সবাকারে আজি করিতেছে হর্ষে আবাহন।
এস আজ এস সবে।

নব বর্ষ এল আজি দ্বারে
নবীন আশ্বাস আশা সুখ শান্তি আনন্দ ঝঙ্কারে
পূর্ণ করি বসুন্ধরা, অভিনব কর্ম্ম-কোলাহল
জাগাইয়া দিকে দিকে সত্য স্নিগ্ধ গৌরব উজ্জ্বল
একনিষ্ঠ সাধনার সনে! সর্ব্ব দৈন্য দ্বিধা-লাজ
বিশ্বের হৃদয়-পুষ্প পরিহরি' অসঙ্কোচে আজ
বিকশি উঠিল যেন অনুপম সৌন্দর্য্য সুধায়—
বন্দিবারে তোমা সবে! অফুরন্ত করুণা-ধারায়
প্লাবি' সারা মনোপ্রাণ হে উদার পূজার্হ মণ্ডলি!
এস সবে এস আজ!

জীবনের মহার্হ অঞ্জলি—
সাজাইয়া অর্ঘপূটে, বিরচিয়া পুণ্য হোমাগার,
সহস্র ব্যাকুল চিত্ত প্রতীক্ষায় আছে অনিবার,—
আজি হেথা মাতৃযজ্ঞ ভারতীর অর্চ্চনা উৎসব
মুক্তকরে দিতে হবে অন্তরের গোপন বৈভব
শ্রীপদ পঙ্কজে মার! কে কুড়াবে পবিত্র সমিধ্
অবনি আনিবে কেবা, হব্য দিতে ব্যগ্র কার হৃদ্,

কে জ্বালিবে হোমানল, কে করিবে কুসুম চয়ন
বেণু-বীণা-শঙ্খ-ভেরী-কারা আজ করিবে বাদন
এস সবে এস হেথা। ধর্ম্মে কর্ম্মে ছোট বড় বলি
বিন্দুমাত্র ব্যবধান নাহি রবে ভ্রান্তবশে দলি'
কাহারো কোমল প্রাণ আজি হেথা সোদর সবাই
মায়ের পূজারী ভৃত্য। প্রাণে প্রাণে অমৃত বিলাই'
গাঢ় আলিঙ্গন সুধু!

হে আচার্য্য ঋত্বিক্ প্রধান
মহান্ উদাত্ত-স্বরে আজ তুমি গাহিবে কি গান
কোন পূত দিব্য মন্ত্রে করিবে গো আহুতি অর্পণ
সু শাশ্বত ধ্রুব-বাণী লক্ষ চিত্তে জাগাবে স্পন্দন
সকলি অজ্ঞাত মোর। শুধু দেব ভক্তি নম্র-শিরে
এনেছি হৃদয়-অর্ঘ উৎসর্গিতে পুলকাশ্রু নীরে।
বিশ্ব জননীর পদে অক্ষমের পূজা আয়োজন
ক্ষুদ্র শেফালির কলি, লহ তুমি কর নিবেদন
মাতৃযজ্ঞে কৃপা করে, জননীর অযোগ্য সেবক
হউক কৃতার্থ ধন্য।

হে বিরাট ত্রিলোক পাবক!
সকল অশুভে করি সুখপ্রদ পবিত্র মঙ্গল
তোমার প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ উদ্ভাসিয়া অবনী মণ্ডল
সাফল্যের বার্ত্তা লয়ে, যজ্ঞ-চরু করি আহরণ,
আজি হেথা হউক প্রকাশ! মাতৃপূজা নিকেতন
তপোবনে হোক পরিণত! হে অনাদি নারায়ণ
চির শান্তি তৃপ্তিসুখে শুদ্ধ করি মুমুক্ষ জীবন
নব শক্তি-চেতনায় অন্ত-হীন আশীষ তোমার
অলক্ষিতে অভিষিক্ত করে দিক অন্তর সবার।

(ট)—পরিশিষ্ট।

সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু, এম্‌-এ, ডি-এস্‌সি, সি, এস্‌, আই, সি, আই, ই,

মহাশয়ের অভিভাষণ।

বিজ্ঞানে সাহিত্য।

জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্য্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্য্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড় এলোমেলো মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিম্বা কাঁদিতেছে। মৃদু স্পর্শ ও মৃদু আঘাত; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্ল ভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্ত্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্ত্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সঙ্কোচ। আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ—সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ—হাসির পরিবর্ত্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবল মাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাসগত, কতকটা খামখেয়ালী। এইরূপ বহুবিধ ভিতর বাহিরের আঘাতবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তিবলে বহুবৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি।

জন্মলাভসূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি, তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞান-সেবকের স্থান আছে?

এই সভা বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য-সম্মিলন। ভারত-সাগর যখন আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাসিত মেঘকে আকাশে সঞ্চিত করিয়া তোলে, তখন সে আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তখন তাহার বক্ষের উপর বাতাস বহিতে থাকে এবং একদিন তাহার এই মেঘসঞ্চয়কে সে আপনার বঙ্গ-উপকূলে পাঠাইয়া দেয়। অবিরাম বায়ু তাহাকে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে থাকে, দেখিতে দেখিতে দেশদেশান্তর সফলতায় ভরিয়া উঠে।

তেমনি বাঙ্গলা দেশের চিত্তসাগর হইতে যে সকল উচ্ছ্বাস নানা আকার ধরিয়া এখানকার আকাশে সঞ্চিত হইতেছে, সে কি কোন দিক্‌প্রান্তে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাঙ্গলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্ব্বত্র গভীর ভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, এই সাহিত্য-সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। অলঙ্কার-শাস্ত্রে সাহিত্যকে কোন্ বিশেষ শ্রেণীতে স্থান দিয়াছে তাহা লইয়া এখানে আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এখানে মনে হয়, যেন আমরা সাহিত্যকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দর অলঙ্কার মাত্র নহে— আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

এই সাহিত্য-সম্মিলন-যজ্ঞে যাঁহাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাঁহাকে সুহৃদ্ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন-সভার প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন, তাহা নহে; সাহিত্যের একটি উদার মূর্ত্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

আপনারা জানেন, পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজকে স্বতন্ত্র

রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে ; তাহার ফলে নিজকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ-প্রথায় উপকার করে—তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয় ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না ; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপর দিকে, বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এককে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।

আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সঙ্কীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

ফলতঃ জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।

এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য-সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ, আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে ? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি, তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে পারে ?

কবিতা ও বিজ্ঞান।

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে

পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায়, সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাষে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায়, সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন, মনে করিয়াছেন, সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদ্‌কে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিকের দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে, সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া নাই। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি, অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই—কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয়, তাহা একান্ত বন্ধুর এবং

পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক্ হইতে যেখানে না মেলে, সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী দাবী করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান, এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখন কোন অংশে দুর্ব্বল করিয়া রাখেন না। কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যেরই মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোক-রশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে, এবং সেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে, তখন মুহূর্ত্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন, এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।

অদৃশ্য আলোক।

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণ স্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম-রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি কেবল মাত্র তাহার সম্বন্ধেই দু-একটী কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙ্গে রঞ্জিত আলোকসমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটী রং তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই সসীম আলোকের সাত সমুদ্র পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্তনীয় অদৃশ্য অলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্ম্মানীর অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-উর্ম্মি-সঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোক দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক

ধারণাই ভুল, যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা একদিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচবর্ত্তল দ্বারা দূরে অক্ষীণ ভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎবর্ত্তল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহু দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। ফলতঃ দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য অলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটী সপ্তকমাত্র আমাদের দৃশ্যেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্যরাজ্য। আমরা কতটুকু দেখিতে পাই? নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। দুঃসহ এই জ্যোতির ভার, অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই, সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস।

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেইজন্য রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদ রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ্‌জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেন্ডাবসন বলেন যে কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাত দৃশ্যভাবে কিম্বা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর-প্রমুখ উদ্ভিদ শাস্ত্রের

অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে বৃক্ষ স্নায়ুহীন, আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরে বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোন সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয় পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে প্রচলিত। আমাদের জীবনলক্ষ্মী উদ্ভিদ-জীবনের কোন ভার গ্রহন করেন নাই। উদ্ভিদজীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এপর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। প্রধানতঃ এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস।

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয়, বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্ত্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় তাহা যদি ধরিতে ও মাপিতে পারি।

জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে—যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা 'নাড়ার' উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারে সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোন প্ররোচনায় কাগজ কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাতত অসম্ভব কার্য্যে কোন উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া

লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানা-বিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার একান্ত শোচনীয় তাহার সন্দেহ নাই। এক-লিপি সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুন্ন হইবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত—অশিক্ষিত কিম্বা অর্দ্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ।

সে যাহা হউক মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক—প্রথমত গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান, দ্বিতীয়ত গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে আজ্ঞাপালন করান অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষ্যে আজ আমি সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি, এই জন্য বিচিত্র আকারের চিমটি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায়, তাহার কোন মূল্য নাই—ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

এখন বুঝিতে পারিতেছি তাড়াহুড়া করিলে, কিম্বা অতিরিক্ত আঘাত করিলে প্রকৃত কোন উত্তর পাওয়া যায় না। সকাল বেলা, আমাদের মত তাহাদের একটা জড়তা আইসে। সুতরাং উত্তর কতকটা অস্পষ্ট। দ্বিপ্রহরের গরমের সময় দুই চারিটা উত্তর দিয়া গাছ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যেদিন ঝড় কিম্বা অন্য দৈব-দুর্যোগ ঘটে সে দিন গাছ মৌনভাব ধারণ করে। এসব বিরক্তির কারণ ত্যাগ করিয়া শুভ দিন ও ক্ষণ নিরূপণ করিলে, বহুঘণ্টাব্যাপী সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়।

গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকট যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের

স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোন হাত থাকিবে না, কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।

গাছের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের ইতিহাস উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য। সে জন্য জানিতে চাই তাহার উপর প্রত্যেক অনুকূল, প্রত্যেক প্রতিকূল ঘটনার ছাপ—তাহার সহিত আলো ও অন্ধকারের ক্রীড়া, তাহার উপর পৃথিবীর টান ও ঝটিকার আঘাত। কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের সাড়া! এই স্থির এই নিশ্চলবৎ প্রতীয়মান জীবনপ্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রিয়া চলিতেছে। কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?

এই যে তিল তিল করিয়া বৃক্ষশিশুটী বাড়িতেছে, যে বৃদ্ধি চক্ষে দেখা যায় না, মুহূর্ত্তের মধ্যে কি প্রকারে তাহাকে পরিমাণের মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে পারিব? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়? আহার দিলে কিম্বা আহার বন্ধ করিলে কি পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইতে কত সময় লাগে? ঔষধ সেবনে কিম্বা বিষ প্রয়োগে কি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যাইতে পারে কি? বিষের মাত্রা প্রয়োগে কি ফলের বৈপরীত্য ঘটে?

তারপর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনরূপ সাড়া দেয় তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে কত সময় লাগে? সেই অনুভব-কাল ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্ত্তিত হয়? সেই সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারা যায়? তারপর বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পৌঁছে? স্নায়ুসূত্র আছে কি? যদি থাকে তবে স্নায়বীয় প্রবাহ কিরূপ বেগে ধাবিত হয়। কোন্ অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহের গতি বৃদ্ধি হয়, কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় নিবারিত অথবা নিরস্ত হয়? আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে? সেই গতি ও সেই গতির পরিবর্ত্তন কোন প্রকারে কি স্বতঃ লিখিত হইতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্পন্দনশীল পেশী আছে উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃস্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে যখন মৃত্যুর প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয় সেই নির্ব্বাণ-মুহূর্ত্ত কি ধরিতে পারা যায়? এবং সেই মুহূর্ত্তে কি বৃক্ষ কোন একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?

এই সব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস বিবিধ যন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হইলেই গাছের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হইবে।

"যদি গাছ তাহার লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত।" কিন্তু এই কথা ত দিবা-স্বপ্ন মাত্র. এই কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য, কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্ম্মে পরিণত করিতে চাহি তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আব্দার এবং ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছে না। কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতা সঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া যায় তখনই প্রকৃতি-দেবী সাধকের নিকট আবির্ভূতা হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা।

সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহা সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে সেস্থান হইতে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর! মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশ জনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, সমস্ত

দুঃখ ধৈর্য্যের সহিত তাহারা বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতি লাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে—কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।

তরুলিপি যন্ত্র।

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্ব্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নির্ণীত হইবে; তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের একভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্ম্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান্ দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদেরই কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এ দেশীয়। এখন গাছের সাড়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু চারিটা কথা বলিব।

গাছ, লাজুক কি অলাজুক।

তৎপূর্ব্বে তরুজাতিকে যে লাজুক ও অলাজুক—সসাড় ও অসাড়—বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে সেই কুসংস্কার দূর করা আবশ্যক। সব গাছই যে সাড়া দেয়, তাহা বৈদ্যুতিক উপায়ে দেখান যাইতে পারে। তবে কেবল লজ্জাবতী লতাই কেন পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়, সাধারণ গাছে দেয় না কেন? ইহা বুঝিতে হইলে ভাবিয়া দেখুন যে আমাদের বাহুর এক পাশের মাংসপেশীর সঙ্কোচনদ্বারাই হাত নাড়িয়া সাড়া দেই। উভয় দিকেরই মাংসপেশী যদি সঙ্কুচিত হইত তবে হাত নড়িত না। সাধারণ বৃক্ষের

চতুর্দ্দিকের পেশী আহত হইয়া সমভাবে সঙ্কুচিত হয়, তাহার ফলে কোন দিকেই নড়া হয় না। কিন্তু একদিকের পেশী যদি ক্লোরোফরম দিয়া অসাড় করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণ গাছের সাড়া দিবার শক্তি সহজেই প্রমাণিত হয়।

অননুভূতি কাল নিরূপণ।

জীব যখন আহত হয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সাড়া দেয় না। ভেকের পায় চিমটি কাটিলে সাড়া পাইতে ন্যূনাধিক সেকেণ্ডের শত ভাগের একভাগ সময় লাগে। ইংরাজী ভাষ্যে, এই সময়টুকু লেটেণ্ট পিরিয়ড্। "অননুভূতি সময়" ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইল।

বাহিরের অবস্থা অনুসারে এই অননুভূতি কালের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। মৃদু আঘাত অনুভব করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করিতে বেশী সময়ের অপব্যয় হয় না। আর যখন শীতে জীব আড়ষ্ট থাকে তাহার অননুভূতিকাল তখন দীর্ঘ হইয়া পড়ে। পুনরায় আমরা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখন অনুভূতি করিবার পূর্ব্বকাল একান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এমন কি, সে সময়ে কখন কখন একেবারেই অনুভব শক্তি লোপ পায়। গাছের অনুভূতি সম্বন্ধে একই প্রথা। লজ্জাবতীর তাজা অবস্থায় অননুভূতিকাল সেকেণ্ডের শতাংশের ছয় ভাগ—উদ্যমশীল ভেকের তুলনায় কেবলমাত্র ছয় গুণ বেশী। আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে স্থূলকায় বৃক্ষ দিব্য ধীরে সুস্থে সাড়া দিয়া থাকে। কিন্তু কৃশকায়টি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বসে। মনুষ্যলোকেও ইহার সাদৃশ্য আছে কি না আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শীতে গাছের অননুভূতিকাল প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আঘাতের পর গাছের প্রকৃতিস্থ হইতে প্রায় পোনের মিনিট লাগে। তাহার পূর্ব্বে আঘাত করিলে অননুভূতি সময় প্রায় দেড় গুণ দীর্ঘ হয়। অধিক ক্লান্ত হইলে অনুভূতি শক্তির সাময়িক লোপ হয়, তখন গাছ একেবারেই সাড়া দেয় না। এ অবস্থাটি যে কিরূপ অবস্থা, আমার দীর্ঘ বক্তৃতার পর তাহা আপনারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

সাড়ার মাত্রা।

সময় ভেদে একই আঘাতে সাড়ার প্রবলতার তারতম্য ঘটে। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, সকালবেলা রাত্রির নিশ্চেষ্টতাজনিত গাছের একটু জড়তা থাকে। আঘাতের পর আঘাতে সে জড়তা চলিয়া যায় এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়িতে থাকে; সেটা যেন জাগরণের অবস্থা। গরম জলে স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা শীঘ্রই দূর হয়। দু প্রহরের সময় এ সব উল্টা হইয়া যায়; ক্লান্তিবশতঃ সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য সময় দিলে সেই ক্লান্তি চলিয়া যায়। আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে, সাড়ার মাত্রাও বাড়িতে থাকে; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। এ বিষয়ে মানুষের সহিত গাছের প্রভেদ নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শীতকালে ঘা খাইলে যেমন সারিতে আমাদের অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। গ্রীষ্মকালে যাহা পোনের মিনিটে সারিয়া যায় তাহা সারিতে শীতকালে আধ ঘণ্টার অধিক লাগে।

বৃক্ষে স্নায়বীক প্রবাহ।

জন্তুদেহে এক স্থান আঘাত করিলে আঘাতের ধাক্কা স্নায়ুদ্বারা দূরে পৌঁছে। স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমত, স্নায়বীয় বেগ বিবিধ অবস্থায় হ্রাস বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতায় বেগ বৃদ্ধি এবং শৈত্যে বেগ হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যুৎপ্রবাহে স্নায়ুতে কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। যতক্ষণ স্নায়ু দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে থাকে ততক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রেরণ এবং বন্ধ করিবার সময় কোন বিশেষ স্থলে উত্তেজনা এবং অন্যস্থানে অবসাদ উপলক্ষিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিবার মুহূর্ত্তে যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যাগ করে সেইস্থলেই স্নায়ু হঠাৎ উত্তেজিত হয়। এতদ্ব্যতীত যদি স্নায়ুর কোন অংশে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা যায় তবে সেই অংশ দিয়া আর কোন সংবাদ যাইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিলে অমনি রুদ্ধ পথ খুলিয়া যায়, স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।

যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষদেহেও যে স্নায়বীয় সংবাদ প্রেরিত হয় তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে ধরা যাইতে পারে এবং একই কলের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহাও নির্ণীত হয়। স্নায়বীয় বেগ বৃক্ষদেহে, ভেকদেহ তুলনায় মন্থর, কিন্তু নিম্নজাতীয় জন্তু হইতে দ্রুত। বৃক্ষে উষ্ণতায় স্নায়ুবেগ প্রায় সাতগুণ বর্দ্ধিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহে প্রারম্ভকালে

বৃক্ষস্নায়ুর এক স্থানে উত্তেজিত অন্য স্থলে অবসাদিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা বৃক্ষের স্নায়বীয় ধাক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়। স্নায়ু সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে, সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা, জীব ও উদ্ভিদে যে এ সম্বন্ধে কোন ভেদ নাই তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

স্বতঃস্পন্দন।

জীবদেহের অংশবিশেষে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ পেশী আছে যাহা আপনা আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। কোন ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। কিন্তু জীব-স্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিদেও এইরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়; তাহার অনুসন্ধানফলে সম্ভবত জীব-স্পন্দন-রহস্যের কারণ প্রকাশিত হইবে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন। হৃদয় জানা কথাটি শারীরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি, কবিতার অর্থে নহে। সমস্ত ব্যাংটিকে লইয়া পরীক্ষা সুবিধাজনক নহে এজন্য তাঁহারা হৃদয়টিকে কাটিয়া বাহির করেন, পরীক্ষা করেন কি কি অবস্থায় হৃদয়গতির হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলেই স্পন্দনক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয় কিন্তু ঢেউগুলি খর্ব্বকায় হয়। শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ভৈষজ্য দ্বারা হৃদয়ের স্বাভাবিক তাল বিভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইথর প্রয়োগে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফরমের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিবিধ বিষপ্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য রহস্য এই যে, কোন বিষে হৃদয়স্পন্দন সঙ্কুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিস্পন্দিত হয়। বিষের এইরূপ পরস্পরবিরোধী গুণ জানিয়া এক বিষ দ্বারা অন্য বিষ ক্ষয় হইতে পারে।

জীবের স্বতঃস্পন্দন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি প্রধান ঘটনা বর্ণনা

করিলাম। উদ্ভিদেও কি এই সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়? নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া গাছও যে স্পন্দনশীল, তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাইয়াছি।

বনচাঁড়ালের নৃত্য।

বনচাঁড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পত্রগুলি আপনা আপনি নৃত্য করিতেছে। লোকের বিশ্বাস যে, হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। গাছের সঙ্গীতবোধ আছে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু বনচাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোন সম্বন্ধ নাই। তরু-স্পন্দনের স্বতঃলিপি পাঠ করিয়া, জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেছি।

প্রথমত পরীক্ষার সুবিধার জন্য বনচাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে, স্পন্দন-ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নল দ্বারা উদ্ভিদ রসের চাপ দিলে স্পন্দনক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত-গতিতে চলিতে থাকে। তার পর দেখা যায় যে, উত্তাপে স্পন্দনের সংখ্যা বর্দ্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইথার প্রয়োগে স্পন্দন-ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়, কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাব মারাত্মক। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যে ভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, কোন কোন উদ্ভিদপেশীতে আঘাত করিলে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল, তাহা নহে; উদ্ভিদ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এইরূপে আহার-জনিত বল, বাহিরের আলোক, উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয়, তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে, সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি, প্রকৃত পক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরুচ্ছ্বাস। যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায়, তখন স্বতঃ-স্পন্দনেরও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পর বাহিরের উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছ অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি উথলিয়া উঠে, কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা বাহিরের উত্তেজনার কাঙ্গাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙ্গা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেক কাল সাড়া দেয় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বনচাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ।

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থার জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতার আবশ্যক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অবস্থা স্বতঃস্পন্দনেরই একটি উদাহরণবিশেষ। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থাভিলাষী সাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন, কোন্ পথ—কামরাঙ্গা অথবা বনচাঁড়ালের পদাঙ্কানুসরণ—তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

পরিপূর্ণ অবস্থাই যে স্বতঃস্পন্দনের কারণ, তাহা বিবিধ মানবিক ব্যাপারেও দেখা যায়। শিশু যখন মাতৃদুগ্ধ এবং স্নেহাতিশয্যে পরিপূর্ণ হয়, তখন তাহার হাত-পার স্বতঃস্পন্দন দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করে।

মৃত্যুর সাড়া

উদ্ভিদের জীবনে পরিশেষে এরূপ সময় আইসে, যখন কোন আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত, মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের কথা। মৃত্যুর রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে, তখন গাছের জীবন তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল আকুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বৈদ্যুত প্রবাহ মুহূর্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্তিত হয়—লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি

পরিবর্ত্তিত হয়—ঊর্দ্ধগামী রেখা নিম্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীর মর্ম্মের কথা আজ তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইল। এতদিন তরু-লতার সহিত মানুষের জীবনগত আত্মীয়তার সংবাদ কেবল কবিকল্পনার আভাষে প্রচারিত হইতেছিল. আজ কঠোর বিজ্ঞান, কল্পনারও অতীত অনেক-গুলি সংবাদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিল।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, "বৃক্ষ-জীবন যেন মানব-জীবনেরই ছায়া।" কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয়, সেটা যৌবনসুলভ অতিসাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইল।

উপসংহার।

আমি সম্মিলন-সভায় কি দেখিলাম. উপসংহারকালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্দ্ধ অন্ধকারে বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্ত্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্ম্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানা প্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি. কখন শিল্প-কলায়, কখন সাহিত্যে, কখন বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম, এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, আমাদের দেশের বিশ্বকর্ম্মা বাঙ্গালী-চিত্তের

মধ্যে যে কাজ করিতেছেন, তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, এ আমাদের দেশের চির-কালের সংস্কার। দেবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষও সৃজন করিতে পারে এবং সংহারও করিতে পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে, তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্ব্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী, তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের নিজের মধ্যে কাজ করিতেছে। আমাদের জীবনে আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনী শক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্র ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভা-স্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহারস্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।

(ঠ)—পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলী।

১। এই সম্মিলন "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন" নামে অভিহিত হইবে।

২। সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী-জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধানদ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্য নির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩। সম্মিলনের অধিবেশন প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। সাধারণতঃ কোন্ বৎসর কোন্ স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনেই স্থির করিতে হইবে।

৪। সম্মিলনের সমস্ত কার্য্য বাঙ্গালা-ভাষায় নির্ব্বাহিত হইবে, তবে যদি কেহ বাঙ্গালা-ভাষায় স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম হন, তবে সভাপতি মহাশয় ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছামত ভাষায় তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতে দিতে পারিবেন।

৫। এই সম্মিলনের সমস্ত কার্য্য পরিচালনের জন্য প্রতি বৎসর অন্যূন ষাটি জন ব্যক্তিকে লইয়া "সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে। প্রতি বৎসর সম্মিলনের শেষ বৈঠকে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য উক্ত সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।

৬। এই সম্মিলনের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ উক্ত সদস্যগণ অথবা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা সম্মিলনের সেই অধিবেশনেই কিংবা তাহার পর এক মাসের মধ্যে আপনাদের মধ্য হইতে দশ জনকে নির্ব্বাচন করিবেন এবং ঐ দশজন সদস্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া "সম্মিলন পরিচালন-সমিতি" নামে সম্মিলনের যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিবেন। আবশ্যক হইলে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন।

(ক) সম্মিলন-পরিচালন সমিতি পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতির নিয়মানুসারে চলিবে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকই 'সাধারণ-

সম্মিলন-সমিতি' এবং 'সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি' এতদুভয়ের সম্পাদকতা করিবেন।

(খ) কোন সম্মিলনের সভাপতি তাঁহার সভাপতিত্বে নির্ব্বাচনের সময় হইতে পরবর্ত্তী সম্মিলনের অধিবেশনে অন্য সভাপতির নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সভাপতি থাকিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতিরূপে গণ্য হইবেন। তাঁহাদের অভাব হইলে, উপস্থিত সদস্যবর্গের মধ্যে যে-কেহ সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

৭। যে বৎসর যে স্থানে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই স্থানের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ পূর্ব্ব-সম্মিলনের অধিবেশনের পর তিন মাস মধ্যে সম্মিলন-সম্বন্ধীয় স্থানীয় সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিবেন।

৮। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হইবে ;—

(ক) সম্মিলনের সময়-নির্দ্ধারণ।

(খ) সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য সাহিত্যসেবীদিগকে ও সাহিত্য-সমিতিসমূহকে নিমন্ত্রণ।

(গ) উপস্থিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা, বাসাদির ব্যবস্থা এবং তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহ।

(ঘ) সম্মিলনের সভাপতি-নির্ব্বাচন।

(ঙ) সম্মিলনের আলোচ্য বিষয় ও কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ।

(চ) সম্মিলনের সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যবস্থা।

(ছ) অধিবেশনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্মতি লইয়া নানাস্থানে প্রচলিত সংবাদপত্রে নির্দ্ধারিত সময় ঘোষণা।

(জ) অধিবেশনের অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে আলোচনার জন্য বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ ও প্রস্তাবাদি পাঠাইতে সাধারণকে আহ্বান।

(ঝ) যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই প্রদেশ-সম্বন্ধীয় স্থানীয় তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও বিবরণাদি সংগ্রহ।

(ঞ) সম্মিলনের সম্পূর্ণ কার্য্য-বিবরণ প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনার্থ

সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে অধিবেশনের পর দুই মাস মধ্যে প্রেরণ ও তাহা প্রকাশার্থ অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা।

অভ্যর্থনা-সমিতি এই সমস্ত কার্য্য-সম্বন্ধে ও আলোচ্য-বিষয়াদি নিরূপণে সম্মিলন পরিচালন-সমিতির সহিত আবশ্যক মত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন।

৯। অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক যাঁহারা প্রবন্ধ-রচনার জন্য আহূত হইবেন বা তথ্য-সংগ্রহে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রচনা ও সংগৃহীত বিষয়াদি সম্মিলনের অধিবেশনের অন্ততঃ একপক্ষ পূর্ব্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

১০। অন্যূন দুই দিন এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যদি প্রয়োজন হয় এবং সময়ের সুবিধা থাকে, তবে দুই দিনের অধিক দিনও অধিবেশন হইতে পারিবে; তবে তাহা প্রথম হইতেই বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

১১। অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত সভাপতি উপস্থিত সভ্যগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণকে লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন করিবেন। এই সমিতি আলোচ্য বিষয়গুলির সময়োচিত আলোচনা ও আবশ্যক হইলে সম্ভবমত পরিবর্ত্তনাদি করিতে পারিবেন।

১২। কার্য্যের সুবিধার্থ এই সম্মিলনের কার্য্য আলোচ্য বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে। প্রয়োজন ও সুবিধা হইলে, একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে;—

(ক) সাহিত্য-শাখা (কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি)।

(খ) ইতিহাস-শাখা (ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি)।

(গ) গণিত ও বিজ্ঞান-শাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি)।

১৩। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি উক্ত তিন বিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহের ভার কতকগুলি বিশেষজ্ঞের প্রতি দিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন—

(ক) প্রাপ্ত প্রবন্ধ ও রচনাদি হইতে সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচন করিবেন।

(খ) পাঠ্য প্রবন্ধের আকার বিবেচনায় পাঠের সময় পরিমিত করিয়া দিবেন।

১৪। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইবে,—

(ক) পূর্ব্ব-সম্মিলনে নির্দ্ধারিত প্রস্তাব এবং স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতি বা অপর কোন সমিতি কিংবা কোন বিশেষ কার্য্য-সম্পাদনের উদ্দেশে সম্মিলনের বৈঠকে গঠিত কোন বিশেষ সমিতির প্রতি যে সকল কার্য্য-ভার অর্পিত হইবে, সেই সমস্ত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ও পরবর্ত্তী সম্মিলনে তাহাদের ফলাফল জ্ঞাপন।

(খ) সম্মিলনের অধিবেশনের পর ছয় মাস মধ্যে তাহার কার্য্য-বিবরণ মুদ্রণ-ব্যবস্থা।

১৫। অভ্যর্থনা-সমিতি ও কার্য্যের ভার-প্রাপ্ত অপরাপর সমিতি আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী সম্মিলনে উপ-স্থাপিত করিবার জন্য আগামী অধিবেশনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদককে পাঠাইয়া দিবেন।

১৬। এই সম্মিলনের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে প্রাদেশিক সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি-সংক্রান্ত ও তদ্বিধ অন্যান্য দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শনীর আকারে প্রদর্শিত হয়, সে জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি যত্ন করিবেন।

১৭। এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত দ্রব্যাদি যাহাতে সুরক্ষিত হয়, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি অভ্যর্থনা-সমিতির সাহায্যে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

১৮। আবশ্যক হইলে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি একযোগে এই সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু সে সমস্ত অব্যবহিত পরবর্ত্তী সম্মিলনের অধিবেশনে অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে।

১৯। কোন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে এই সম্মিলনে আলোচনা হইবে না।

(ত)—পরিশিষ্ট।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্যগণ।

এই সমিতির সদস্যগণের নামের তালিকা কার্য্যবিবরণের প্রথম ভাগে ১৮—২০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। যাঁহাদের নাম বাদ পড়িয়াছিল কেবল তাঁহাদেরই নাম নিম্নে মুদ্রিত হইল।

৪৩। শ্রীযুক্ত বৈকণ্ঠনাথ সোম

৪৪। ,, ব্রজনাথ বিশ্বাস

৪৫। ,, শ্রীনাথ চন্দ

৪৬। ,, অক্ষয়কুমার মজুমদার, এম্‌-এ, বি-এল্‌,

৪৭। ,, মধুসূদন সরকার।

৪৮। ,, রেবতীমোহন গুহ

৪৯। ,, নবকান্ত গুহ

৫০। ,, শরচ্চন্দ্র পাল

৫১। ,, গিরীশচন্দ্র কবিরত্ন

৫২। ,, সৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

৫৩। ,, নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

৫৪। ,, জে, মজুমদার।

৫৫। ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

৫৬। ,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

সহঃ সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

(থ)—পরিশিষ্ট।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ-রচিত

সম্মিলন

১

ব্রহ্মপুত্র বসে আছে গভীর ধেয়ানে,
চঞ্চলতা গেছে, রুদ্ধ নীরব নিথর!
আপনার মূর্ত্তি লয়ে আপনার মনে
আপনার স্থিরতায় আপনি কাতর।

২

দিন গেছে ভুলে কত আপনার গতি
নিশা গেছে ভুলিয়া আপন
ব্রহ্মপুত্র বক্ষে তার অসংখ্য সন্ততি
তরী লয়ে একি ভাবে করে বিচরণ।

৩

বিশাল বিরাট্ বপু হয়ে গেল ক্ষীণ।
ভাবিতে ভাবিতে যুগধারা
প্রাণের মমতা তার হয়েছে বিলীন
জলরাশি আজি অশ্রুহারা।

৪

শুধু আছে স্মৃতি তার অস্তিত্ব মহান্
অস্তিত্ব ডুবেছে কালস্রোতে,
ব্রহ্মপুত্র সঙ্গীহারা শুষ্ক তার প্রাণ
ভুলে গেছে আপনার ব্রতে।

৫

দূরে আছে ভাগিরথী মিলনের আশে
প্রাণপূর্ণ তরঙ্গ তাহার
রাণীর হৃদয়-মূর্ত্তি কোন্ দূর দেশে
ঢাকিয়া রেখেছে অন্ধকার

৬

সহসা ফুটিয়া উঠে স্ফুলিঙ্গের প্রায়
অন্তর্ভেদী অনন্ত যাতনা
ব্রহ্মপুত্র অন্বেষণে চারিদিকে চায়
গানে ছোটে মরম বেদনা।

৭

পুণ্যপুঞ্জ অশ্রুরাশি ঢালিল আকাশ
—ত্রেতার সে নিয়ে এল কথা
মাতৃহত্যা পাপে ক্ষীণ দেব শ্রীনিবাস
পাপমুক্ত হয়েছিল যথা।

৮

আমরা সেরূপ আজ বহু অপরাধী
মায়ের মর্য্যাদা গিয়ে ভুলে,
মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাধি
আসিয়াছি নদ পাদমূলে।

৯

হে দেব! আশ্রয় দাও, ভিখারী সন্তান
জ্ঞানশূন্য চিনে নি জননী
প্রাণরূপা জাহ্নবীর তাই অপমান
পুত্র অপরাধে ক্ষীণা রাণী।

১০

দুয়ের মিলন আজ দেবতার সাধ
ভাই ভাই তাই আজ সমবেত হেথা,
অনন্তে ছুটিয়া যাক্ এ স্রোত অবাধ
ব্রহ্মপুত্র জাহ্নবীর মিলনের গাথা!

১১

যাহারা মিলন দেছে, নমি আমি তাহাদের পায়
হে ভ্রাতঃ সন্তান তুমি
যে আজ আকুল প্রাণে
ঘুচায়েছে জনকের জননীর দায়।

(দ)—পরিশিষ্ট।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, লিখিত।

ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা যে কয়টি সুফল লাভ করিয়াছি তাহার মধ্যে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ অন্যতম। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সম্মুখে যে অভিনব জগতের বার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্টিলাভ করিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় ও সৌষ্ঠববান্ করিয়া তুলিয়াছে।

এদেশে যখন ইংরাজী শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন আমাদের মাতৃ-ভাষার এমন অবস্থা ছিল না যাহাতে শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার স্থান ঊর্দ্ধে ধারণ করিতে পারা যাইত। তখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই ইংরাজীর সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকারিরূপে বিরাজ করিতেছিল। আজ বাঙলা ভাষা বিকাশ লাভ করিতে করিতে যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে বি, এ, পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত বিষয়ের মধ্যে একটী অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত করিতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব হানি হয় নাই। কিন্তু এখনও আমাদের ভাষা সম্পদ এত বৃদ্ধি পায় নাই যে উন্নত বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উচ্চ শ্রেণীতে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ই একমাত্র বাঙলা ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বাঙলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালীর পক্ষে প্রধান ভাষা রূপে বিবেচনা করিয়া তাহার পঠদ্দশার সকল স্তরেই ইহাকে মুখ্য ভাষার গৌরব প্রদান করিবেন কিনা—ইহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা ঠিক যে আমরা ইচ্ছা করিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে আমাদের সকল শ্রেণীর সর্ব্ব প্রকার শিক্ষার মৌলিক অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের সাহিত্যের দারিদ্র্য এবং অনুপযোগিতাই ইহাকে সকল শিক্ষার সাধনীভূত করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়।

বাঙলা সাহিত্যের কোন সেবকই একথা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃতির সাহায্যে আমরা যে পরিমাণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি তাহাকে

আমাদের কর্ম্মশক্তি ও সাধনার দ্বারা বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিয়া, দরিদ্র ও সঙ্কীর্ণ সাহিত্যকে ক্রমশঃ নানা বিষয়ক ও উচ্চ চিন্তাপ্রকাশক করিয়া তুলিতে হইবে। সাহিত্যসেবিগণের ব্যক্তিগত বা সাময়িক চেষ্টার ফল অপেক্ষা করিয়া আর আমরা বসিয়া থাকিতে পারিনা। প্রয়োজন বোধ করিলে রাষ্ট্রনীতিক পণ্ডিতগণ যেমন সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া নিরক্ষরকে সুশিক্ষিত, এবং ধনহীন সমাজকে সম্পদ্‌বান ও ঐশ্বর্য্যশালী করিতে প্রয়াসী হন, আমাদিগকেও এখন প্রয়াস করিয়া, সংরক্ষণনীতির সাহায্যে প্রকৃতির কার্য্য এবং সাহিত্যিকগণের ব্যক্তিগত উদ্যমকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতে হইবে। কি উপায়ে এবং কত দিনে আমাদের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে ফরাসী, জার্ম্মান ও ইংরাজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে—ইহাই আমাদের এখন বিবেচনার বিষয় হইয়াছে। যাহাতে আমাদের সাহিত্যসেবা এখন হইতে এই একমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে সাহিত্যিকগণের সাধনা ও আদর্শ সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে "এণ্ডাউমেণ্ট" ও ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিয়া অনন্যকর্ম্মা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত মাসিক অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপে তাঁহাদের সাহিত্যসাধনা সহজ ও নিরুদ্বেগ করিতে পারিলেই বাঙ্গলা সাহিত্য সংরক্ষিত হইয়া শীঘ্রই উন্নত হইতে পারিবে। যদি বাঙ্গালা সাহিত্য সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়গণের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি আকৃষ্ট করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং ইঁহাদের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী যুবক নিশ্চিন্ত হইয়া সমবেতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থগুলি আমাদের জাতীয় সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে : প্লেটো, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, গীজো, হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গবেষণা আমাদের স্বকীয় ভাষার ভিতর দিয়াই লাভ করিতে পারি ; এবং অল্প কালের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ও জাতীয় হইয়া উঠিতে পারে।

অনেক সময়ে য়্যাকাডেমীর প্রভাবে এবং পরিপোষকগণের পরিচালনায় সাহিত্য স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারাইয়া কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। কোন সমাজকে অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যে যেমন অনেক সময়ে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে "কমিশন" বা অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে সেইরূপ অর্থসাহায্যে একটী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে মাত্র। ইহার ফলে কয়েক জন উপযুক্ত সাহিত্যিককে অনন্যকর্ম্মা করিয়া দিয়া সাহিত্যে তাঁহাদের সম্পূর্ণ সময় ও সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে।

পদার্থবিজ্ঞান, সমালোচনা, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক যে কয়খানি উচ্চগ্রন্থ মানবের সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা অত্যধিক নহে। কোন দেশেই কেবলমাত্র স্বজাতীয় পণ্ডিতগণের মৌলিক গবেষণা অবলম্বন করিয়াই শিক্ষাকার্য্য সমাধা হয় না। বিশ্বসাহিত্যের উপযুক্ত গ্রন্থগুলি সকল ভাষায় অনূদিত এবং তাহাদের আলোচ্য বিষয়গুলি সঙ্কলিত হইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছে। সুতরাং সেই কয় খানি গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া অনুবাদ ও সঙ্কলন আরম্ভ করিলে আমাদের বাঙ্‌লা সাহিত্য অতি সত্বরই অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সমকক্ষ হইতে পারে। এই অনুবাদ ও সঙ্কলনের ফলে কেবল যে সেই গ্রন্থগুলিই বাঙলা সাহিত্যে স্থান পাইবে এমন নহে, আনুষঙ্গিকভাবে আমাদের মাসিক সাহিত্য এবং সমালোচনাও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশের ভাবুকেরা বহু দূর ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও বর্ত্তমানের নগণ্য আরম্ভের মধ্যেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা স্বভাবতই আশা করিতে পারি যে, যে কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের ফলে অতি অল্প কালের মধ্যেই সাহিত্য প্রবল হইয়া উঠিবে তাহার জন্য আমাদের ধনিসম্প্রদায় এবং ভূম্যধিকারিগণ ভূমি ও স্থায়ী সম্পত্তি দান করিতে উৎসাহী হইবেন।

আমাদের দেশে অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ ১৫০৲ টাকায় কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। এইরূপ পাঁচজন অধ্যাপকের দশবৎসরব্যাপী, অথবা দশজন

অধ্যাপকের পাঁচবৎসরব্যাপী সমগ্র প্রয়াস ও শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদিগকে সহায়তা করিবার জন্য কয়েক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক। বৎসরে প্রত্যেক অধ্যাপক অন্ততঃ দুই খানি করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। এই সমুদয় গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা সংশোধন ও সংস্করণ করাইতেও অর্থের প্রয়োজন হইবে। মোটের উপর, যদি দশলক্ষ টাকা মূল্যের জমিদারী সাহিত্য-সংরক্ষণের জন্য সাহিত্য-পরিষৎকে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ইহার আয় কেবল মাত্র দশ বৎসরের জন্য ব্যয়িত হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ আমাদের কার্য্যের জন্য আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কেবল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মাত্র নগদ খরচ করিতে হইবে। তাহার পরে আর সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না। ইহার ফলে যে শক্তি জাগরিত হইবে তাহার দ্বারাই সাহিত্য স্বয়ং গন্তব্যপথ স্থির করিয়া লইয়া স্বাধীনভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে।

আর যদি এইরূপ জমিদারী লাভের আশা দুরাশা মাত্র হয়, অথবা একসঙ্গে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নগদ প্রাপ্তি একেবারে অসম্ভবই হয়, তাহাতেও সামান্য ভাবেই সাহিত্য-সংরক্ষণ-কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গ্রন্থের লিখন, সংশোধন ও মুদ্রনের জন্য যদি ১৫০০-২০০০৲ টাকা করিয়া ধার্য্য করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যেই কার্য্যের ফল বুঝিতে পারা যাইবে।

কিন্তু সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের দ্বারা যে সুফল লাভের আশা করা যাইতেছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অল্প কালের মধ্যেই প্রচুর অর্থব্যয় করিবার উৎসাহ ও সামর্থ্য বাঞ্ছনীয়। জাতীয় জীবনে সাহিত্যের স্থান হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধনিসমাজ একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করুন।

দ্বিতীয় দিনের পঠিত প্রবন্ধ।

(ক) ময়মনসিংহে সাহিত্য চর্চ্চা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম্, আর, এ, এস্,

(ময়মনসিংহ)।

বিগত এক শতাব্দী মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্য যে বিপুল উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা বাঙ্গালী জাতির বিশেষ গৌরবের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গে এই উন্নতির সূচনা হইয়াছিল। যে সকল অনুকূল অবস্থা আশ্রয় করিয়া ইহার অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে—আমি এই স্থানে তাহার আলোচনা করিব না। কিন্তু যাঁহাদিগের প্রতিভার গুণে আমাদিগের মাতৃভাষার এবং আমাদের দেশীয় সাহিত্যের এইরূপ সুষ্ঠব হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের কৃপা না হইলে আমরা ময়মনসিংহে সাহিত্যিক-গণের এরূপ সম্মিলন দেখিতে পাইতাম না। আমার বামে ও দক্ষিণে সম্মুখে ও পশ্চাতে যে সাহিত্যপ্রাণ সেবকগণ উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহের মঙ্গল-কোলাহলে এই শুভ ব্যাপার মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে যাঁহারা এই উপলক্ষে সমবেত হইয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে বিনয় ও ভক্তির সহিত বন্দনা করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য চর্চ্চার যে নব আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়া-ছিল, তাহার রশ্মিরেখা ময়মনসিংহে পতিত হইতে অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইয়াছে। কিন্তু এই আলোক-রেখার আরম্ভ এখানে নহে। ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে কিশোরগঞ্জের নারায়ণ দেব হইতে ইহার সূত্রপাত গণনা করা যাইতে পারে। টাঙ্গাইলের রূপনারায়ণ ঘোষ, অন্ধ কবি ভবানী দাস, আরাধন বাগছি, কেবলচন্দ্র বসু, বৈদ্য রামানন্দ, সদরের সদানন্দ মুন্সী, নেত্র-কোণার রাজা জগন্নাথ সিংহ, রাজা রাজসিংহ এবং কিশোরগঞ্জের মাধবাচার্য্য, রামেশ্বর নন্দী, অনন্ত দত্ত, কৃষ্ণ দাস, দ্বিজ বংশী দাস, বৈদ্য রঘুদাস, গঙ্গা নারায়ণ, জগন্নাথ দাস, বিষ্ণুরাম নন্দী, মুক্তারাম নাগ যে সময়ে যে ভাবে কাব্য সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নারায়ণ দেব পশ্চিম বঙ্গের কৃত্তিবাসের সমসাময়িক। তাঁহাদের পুণ্য আত্মা সকল আজ এখানে বিদ্যমান থাকিয়া ময়মনসিংহবাসীকে সাহিত্য সেবায় এক নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন।

১৮৫৮ সালে জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যের এক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। জেলা স্কুলে "মনোরঞ্জিকা" সভায় এবং হার্ডিঞ্জ স্কুলে "বিদ্যা বিমল চন্দ্রিকা" সভায় বালকদিগের সাহিত্যের প্রথম সেবা আরম্ভ হয়। সেরপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরীর এবং অন্যান্য কতিপয় সাহিত্যসেবকের যত্নে প্রতিষ্ঠিত "বিজ্ঞাপনী" ময়মনসিংহে বাঙ্গালা ভাষার যে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন বৃদ্ধগণের মুখে আমরা তাহার ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাই। বিজ্ঞাপনীর বহু স্তম্ভে উহার সম্পাদক জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর লিপিকুশলতার পরিচয় রহিয়াছে। স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়-সম্পাদিত 'বিদ্যোন্নতি সাধিনী', হিন্দুধর্ম্ম সভার মুখপত্র "আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" প্রথম যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিয়াছিল। সাময়িক পত্র "বাঙ্গালি," সংবাদপত্র "ভারতমিহির" ময়মনসিংহে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নবজীবন আনয়ন করিয়াছিল। বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, অনাথবন্ধু গুহ, পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ, কবিবর দীনেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘটক, ব্রজনাথ বিশ্বাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র, যাদবচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত যে সাহিত্যিক উৎসাহ জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়ে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। ভারত-মিহিরে অনাথবন্ধুর প্রবন্ধ সপ্তাহে সপ্তাহে সিদ্ধ-মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিত।

চারুবার্ত্তার প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এই অধিবেশনে উপস্থিত; তাঁহার সমক্ষে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার লিপিকুশলতার প্রশংসা করিতেছি। 'চারুবার্ত্তার' অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ বসুর সুমিষ্ট ভাষা আমাদিগের কর্ণে এখনও যেন সুধাবর্ষণ করিতেছে। সুসঙ্গের "আর্য্যপ্রদীপ," "আর্য্যপ্রভা" ও "কৌমুদী" বাঙ্গালা সাহিত্যের সামান্য পরিচর্য্যা করে নাই। মহারাজা সূর্য্যকান্ত-পৃষ্ঠপোষিত কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "নির্ম্মাল্য" অতি অল্প দিনে সাময়িক-সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার-সম্পাদিত "স্বদেশ সম্পদে" শিল্প ও বিজ্ঞানের আলোচনা হইত। ময়মনসিংহের "আরতি" একখানি বহুদিনের মাসিক পত্র। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ-সম্পাদিত "চারুমিহির" একমাত্র সাপ্তাহিক পত্র। সুসঙ্গের মহারাজা বাহাদুর আমাদিগের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরও সংস্কৃত সাহিত্য এবং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্ন করিয়া আসিতেছেন। এই জেলার মুসলমান সমাজেও সাহিত্য-চর্চ্চা চলিয়াছে। টাঙ্গাইল অঞ্চলের "আহামদি" প্রেস

হইতে এক সময় "আহামদি" নামক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত। কিছু দিন পূর্ব্বে নেত্রকোণার অন্তর্গত টেঙ্গাপাড়া হইতে কতিপয় মুসলমান সাহিত্যসেবক কর্ত্তৃক "উদ্দেশ্য মহৎ" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। করটীয়া হইতে "আখবার ইসলামিয়া" বাহির হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে ইসলামপুর মুসলমান সমাজ হইতে "হানিফি" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমানে "শিক্ষা-প্রচার" নামক একখানি পাক্ষিক-পত্র বাহির হইতেছে।

সাময়িক এবং সংবাদপত্রে ময়মনসিংহে বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ সাধনা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসভা, স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরীর এবং স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-প্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য সমিতি" শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দাস-প্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য সভার" এবং "সারস্বত সমিতিতে" তদপেক্ষা অল্প সেবা হয় নাই। শাখা-সাহিত্য-পরিষদ আজ চারি বৎসর যাবৎ তাহার ক্ষীণ হস্ত হইলেও মাতৃভাষার যে উজ্জ্বল প্রদীপ ধরিয়া রাখিয়াছেন সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকগণ তাহা স্মরণ করিয়া আজ এই বিদ্বজ্জন সমাগমে এক অতুল আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতেছেন।

বাঙ্গালা বক্তৃতা দ্বারা এই নগরে সাহিত্য-চর্চ্চার সামান্য সহায়তা হয় নাই। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বক্তৃতায় বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও সামর্থ্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কাব্য ও সঙ্গীত অতি দ্রুত-গতিতে সাহিত্যকে উন্নতির শিখরে তুলিয়া দেয়। ভিন্ন জেলাবাসী হইলেও এক সময় "মানস বিকাশ" প্রণেতা স্বর্গীয় কবি দীনেশচরণ বসু, সারস্বত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, হেলেনা কাব্য প্রণেতা আনন্দচন্দ্র মিত্র, স্বপ্নবিলাস ও রাই উন্মাদিনী প্রণেতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি এ জেলার সাহিত্যে এক নব সঞ্জিবনী শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।

দীনেশচরণের—

"তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা।"

আনন্দ মিত্রের -

"ভারত শ্মশান মাঝে তুইরে বিধবা বালা।"

কবিতা ও সঙ্গীতের স্বর-লহরী চৈত্র-তাপ-দগ্ধ "চোক গেল" পাখীর উদাস স্বরে সমানীত এক উদাস ভাব গানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেয়।

গদ্য সাহিত্যে স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র লাহিড়ীর "কুলকালিমা"র ভাষা ও জ্ঞান গভীরতা সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। আমি অতঃপর শ্রেণী বিভাগ করিয়া ময়মনসিংহের কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিব।

কাব্য—পদ্মাপুরাণ, চণ্ডী, দুর্গামঙ্গল, বিষ্ণুভক্তি, রত্নাবলি, রাগমালা, কৃষ্ণ গুণার্ণব, দুর্গাপুরাণ, কালীপুরাণ, মহারাষ্ট্র পুরাণ, কুসুম কোরক, ফুলের ডালা, কবিকাহিনী, যোগ-বিয়োগ, মিত্রকাব্য, হেলেনা কাব্য, চন্দন, কস্তুরী, ফুলরেণু, প্রেম ও ফুল, রণরাও, আশাকাবা, দশানন বধ মহাকাব্য, পদ্মা গীতিকা, দীপালি, আরতি, গৌরাঙ্গ, মানস প্রবাহ, শরশয্যা, রঙ্গিনী, সঙ্গিনী, রুক্মিণী, প্রতাপাদিত্য, শুক্লা, স্বপ্নভঙ্গ, প্রীতি ও পূজা ইত্যাদি—

বিজ্ঞান—সে কালের কথা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শুশ্রূষা ইত্যাদি।

উপন্যাস—গায়ত্রী, অহল্যা, লহরী, অরূপা, হরিবল্লভের স্নেহ, ভক্তিলীলা, বিষাদসিন্ধু, কালাপাহাড়, বিষাদপ্রতিমা প্রভৃতি।

দর্শন—বিজ্ঞান ও দর্শন, ফেলোশিফের লেকচার।

সঙ্গীত—গান, প্রিয়সঙ্গীত, সঙ্গীত মুকুল।

জীবন চরিত—বুদ্ধদেব চরিত, মহম্মদ চরিত, নানক রাজা ও রাণী, হজরত মহম্মদ, হাজি মহম্মদ মহসিন, সতীশতক, সারস্বত কুঞ্জ প্রভৃতি।

সন্দর্ভ—ভীষ্মদেব, ছাত্র জীবন, বিধবা, আর্য্যধর্ম্মতত্ত্ব, উপাসনা, উন্মাদিনী নারীজাতি, শিকার কাহিনী, মৃগয়া, তত্ত্বোপদেশ, অবিদ্যার দশ আইন, ইন্দ্রপ্রস্থ।

ইতিহাস-ভূগোল—সেরপুরের বিবরণ, বংশানুচরিত, মোগল বংশ, রিয়াজিৎ সিলাটিন, কায়স্থ বংশাবলী, কুলকালিমা, আফগান বিবরণ, ময়মনসিংহে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, মক্কা সরিফের ইতিহাস, মদিনা সরিফের ইতিহাস, জারুজালেমের ইতিহাস, ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ প্রভৃতি।

ময়মনসিংহের সাহিত্য-চর্চ্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

শিক্ষা সাহিত্যের অগ্রে পদক্ষেপ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি জেলাস্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের এক নব-জীবনের সূত্রপাত হয়। আজ ময়মনসিংহে ২১টি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়। তদুপরি যে আনন্দমোহন কলেজের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বিশাল মণ্ডপে সমবেত হইয়াছি,

সেই আনন্দমোহন কলেজ বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার সামান্য সহায়তা করিবে না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান হইয়াছে, ইহাতেও আমাদিগের ভাষা এক নূতন শক্তি লাভ করিবে। নারায়ণ দেব হইতে যে সাহিত্যগঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছে, সংবাদপত্রে সভামঞ্চের এবং বাগ্মীগণের কণ্ঠে যাহার পরিপুষ্টি হইয়াছে, আমরা আজ তাঁহারই প্রসাদে এই বিপুল সাহিত্য-সম্মিলনের আনন্দ উপভোগ করিতেছি। এই সম্মিলনের ফল বহুদূর ব্যাপী। আশা করি এই সম্মিলন হইতে ময়মনসিংহের সাহিত্য চর্চ্চায় এক নব বল সঞ্চারিত হইবে, এবং ময়মনসিংহের সাহিত্যিকগণ এক নবজীবন লাভ করিবেন।

মাইকেল ফ্যারাডে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, লিখিত।

১। সংক্ষিপ্ত জীবন।

ঊনবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা শতাব্দীর মত শতাব্দী। শুধু এই শতাব্দীটা বাদ দিলে বিজ্ঞানের ইতিহাস কাণা হইয়া যায়; আর এই শতাব্দীতে এমন এক মহাজনের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাঁহাকে বাদ দিলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানেতিহাস অন্ধ হইয়া যায়। তাহার নাম মাইকেল ফ্যারাডে।

প্রত্যহ কত ব্যক্তি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্ম বা প্রেম বা জ্ঞান-রাজ্য বিস্তারের জন্য অবতীর্ণ হইতেছেন কয়জন? ফ্যারাডে এই রকমের একজন অবতার ছিলেন। প্রত্যহ, কত ব্যক্তি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতেছে, কিন্তু দেহত্যাগে মৃত্যু সংঘটিত হয় নাই, এরূপ তাহাদের মধ্যে কয়জন? ফ্যারাডে এই অর্থে এখনও অমর। মানুষের নিকট যতদিন বিজ্ঞানের আদর আছে, ততদিন ফ্যারাডের মৃত্যু নাই।

ফ্যারাডের জীবন-বৃত্তান্ত যথাযথ বিবৃত করিতে পারি এরূপ স্পর্দ্ধা রাখি না। মহাজনের নাম কীর্ত্তনের প্রয়াসে যে পুণ্য আছে, আমরা কেবল সেই পুণ্যের প্রয়াসী।

লণ্ডনের নিকটে (এখন উহারই অঙ্গীভূত) নিউইংটন নামক একটী স্থান আছে। এই স্থানে ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে মাইকেল ফ্যারাডে জন্ম গ্রহণ করেন,

১৮৬৭ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ছিয়াত্তর বৎসরে জ্ঞান-রাজ্যের পরিধি কত দ্রুত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব? ফ্যারাডে তাঁহার পিতার তৃতীয় সন্তান, পিতা জেমস্ সাহেব কর্ম্মকার (Blacksmith) ছিলেন। ফ্যারাডের ১৯ বৎসর বয়ক্রমকালে তাহার মৃত্যু হয়। মাতা মারগারেট কৃষকের কন্যা ছিলেন। স্বামীর লোকান্তর প্রাপ্তির পর পুত্রগণই তাঁহার অবলম্বন ছিল। ফ্যারেডের ৪৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মাইকেলের আত্মীয়গণ মধ্যে প্রায় সকলেরই ব্যবসা উপজীবিকা ছিল, কেহ কামার, কেহ ছুতার, কেহ দোকানদার, কেহ জুতা-নির্ম্মাতা ইত্যাদি।

স্কুল কলেজের শিক্ষা ফ্যারেডের অতি সামান্যই হইয়াছিল, তাহা এক রকম কিছু নয় বলিলেই চলে। কথিত আছে, শৈশবে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা রবার্টের সঙ্গে কিছুদিন স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

উচ্চারণের জড়তা দোষেই হউক, অথবা বয়সের অল্পতা প্রযুক্তই হউক, তিনি র উচ্চরণ করিতে পারিতেন না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রবার্টকে উবার্ট বলিয়া ডাকিতেন। মাইকেলের এই প্রকৃতিগত ত্রুটি তাহার শিক্ষয়িত্রীর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একখানা আধ্লা ফেলিয়া দিয়া রবার্টকে বলিলেন "একখানা বেত কিনে আন্ত দেখি, ফ্যারেডে তোকে রবার্ট বলে কিনা?" রবার্ট আধ্লাখানি সবেগে দেওয়ালের গায়ে ছুড়িয়া ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীতে মাতার নিকট নালিশ করিলেন। স্নেহময়ী মাতা তৎক্ষণাৎ স্কুলে আসিয়া দুই ভাইকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গেলেন।

ইহার পর ফ্যারাডে কিছুদিন জ্যাকব সাহেবের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। লেখা পড়া যে বিশেষ কিছু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে রাস্তায় রাস্তায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মার্ব্বেল খেলিয়া ও কোন্দল করিয়া সময় কাটাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে।

১৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ফ্যারাডে তত্রত্য রিবো সাহেবের পুস্তকের দোকানে দপ্তরীর (Book binder) কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই দিন ফ্যারাডের জীবনের একটী স্মরণীয় দিন। ৮ বৎসর কাল তিনি বই-বাঁধান কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এই বই-বাঁধান কার্য্য তাঁহার মনে জ্ঞান-তৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। স্কুলে যাহা পারে নাই, এই বই-বাঁধান ব্যবসা তাহা পারিয়াছিল। কেন পারিয়াছিল, বলিতেছি। বাঁধাইবার জন্য রিবোর দোকানে কত শত

রকমের পুস্তক আসিত—কত সাহিত্য, কত দর্শন, কত বিজ্ঞান। গরীব ফ্যারাডের পক্ষে এইরূপ পুঞ্জীকৃত জ্ঞানরাশি লইয়া নাড়াচাড়া করিবার অদৃষ্ট কখনও হয় নাই। ফ্যারাডে এই পুস্তকরাশি মধ্যে অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার দর্শন করিলেন। দপ্তরী ফ্যারাডে পুস্তকের কীট হইয়া পড়িলেন। এমন অল্প পুস্তকই ছিল, যাহা তিনি বাঁধিয়া ফেরত দিবার পূর্ব্বে একবার পড়িয়া ফেলেন নাই। ফ্যারাডে নিজে বলিয়াছেন যে, Encyclopœdia বাঁধাইবার কালে Electricity নামক প্রবন্ধ তাঁহাকে বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক লওয়াইয়াছিল। এই সময়ে তিনি দুই এক পয়সা খরচ করিয়া কয়েকটী রাসায়নিক পরীক্ষা করেন। গরীব ফ্যারাডের পক্ষে তখন দুই একটী পয়সা জোটান বড় সহজ কথা ছিল না! এই সময়ে এই অবস্থায় তিনি একটী তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র (Electric machine) প্রস্তুত করেন। এই তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র ফ্যারাডের পরবর্ত্তী জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসনে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ফ্যারাডের স্বহস্তে বাঁধান কোন কোন পুস্তক আজ রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসনের অমূল্য সংগ্রহের অন্তর্গত। লুপ্তপ্রায় অনেক উপাদেয় গ্রন্থ জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডাররূপে কোন কোন পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু দপ্তরী-বিশেষের বাঁধান বলিয়া আর কোন পুস্তক কোন পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে কিনা, জানি না।

এই সময়ে রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে ফ্যারাডে বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাইলেন, টেটাম সাহেব প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা দিবেন, প্রবেশের মূল্য ১ শিলিং। ফ্যারাডে এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পুস্তকবিক্রেতা প্রভুর অনুমতি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবার্টের অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া টেটাম্ সাহেবের ১২।১৩টা বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। কেবল শ্রবণ নয়, প্রত্যেক দিনের বক্তৃতা তিনি রোজ নোট করিয়া আনিতে লাগিলেন। যে নোট করা অভ্যাস ফ্যারাডের ভবিষ্য জীবনের কার্য্যপ্রণালীর একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল, যাহা তাঁহার দুর্দ্দমনীয় জ্ঞান-তৃষ্ণার অন্যতম উদাহরণ, টেটাম্ সাহেবের বক্তৃতায় তাহার আরম্ভ। শিখিতে থাকিব আর ভুলিতে থাকিব, এরূপ প্রকৃতির লোক ফ্যারাডে ছিলেন না। এই বক্তৃতা শ্রবণ উপলক্ষে ফ্যারাডের কয়েক জন বন্ধু জুটিয়াছিল এবং ইহাদের কাহারও কাহারও বন্ধুত্ব আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল।

ইহার কিছু দিন পরে এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে ফ্যারাডের

জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এই ঘটনা হইতে ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক জীবনের আরম্ভ। এমন লোক অল্পই আছে, যাহার জীবনে এরূপ ঘটে না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ফ্যারাডে কয় জন? ফ্যারাডের ভবিষ্য-জীবনের কার্য্যক্ষেত্র রয়াল-ইনষ্টিটিউসনের মেম্বর ড্যান্স সাহেব মধ্যে মধ্যে পুস্তক বাঁধান উপলক্ষে রিবোর পুস্তকের দোকানে আসিতেন। এই সূত্রে ফ্যারাডের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। সম্ভবতঃ ফ্যারাডের একনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও জ্ঞান-তৃষ্ণা ড্যান্স সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ফ্যারাডেকে সঙ্গে করিয়া ডেভি সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে লইয়া যান। ইনি সেই বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত সার হাম্‌ফ্রি ডেভি, যিনি পটাস-ক্ষারের মধ্যে তাড়িৎ সঞ্চালিত করিয়া, উহাকে বিশ্লেষিত করিয়া পোটেসিয়ম্ নামক ধাতুদ্রব্য সর্ব্ব প্রথমে মনুষ্য-নয়নগোচর করিয়াছিলেন। ইনি সেই হামফ্রি ডেভি, যাঁহার আবিষ্কৃত অভয় প্রদীপের (Safety-lamp)এর কল্যাণে এখন খনি-ব্যবসায়ী শ্রমজীবিগণের জীবন আর বিপদসঙ্কুল নহে। ডেভি তখন বিলাতের রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ও রয়েল ইনষ্টিটিউসনের ডিরেক্টর; ডেভি তখন বৈজ্ঞানিক সমাজের শীর্ষস্থানীয়। দলে দলে লোক ডেভির বক্তৃতা শুনিতে ঝুঁকিয়া পড়িত; দেশ বিদেশের পণ্ডিত সমাজ ডেভির সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইত।

ফ্যারাডে ডেভির কয়েকটী বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ফ্যারাডের অন্তঃকরণে বিজ্ঞান শিখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল; ডেভি সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণের পর সেই বাসনার আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। ফ্যারাডের কেবলই মনে হইতে লাগিল, "বিজ্ঞান কি সুন্দর! হায়, আমার ভাগ্যে কি বিজ্ঞানালোচনা ঘটিবে না। বিজ্ঞান তাহার পন্থানুবর্ত্তিগণের হৃদয় কত উন্নত করে, কত মধুর করে! সেই স্বার্থপরতা-শূন্য, সেই হিংসা-দ্বেষ-কুটিলতার বহু উর্দ্ধে অবস্থিত বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার অদৃষ্ট কি আমার হইবে না? এই হীন ব্যবসাতেই কি আমার জীবনের সমস্ত উচ্চ লক্ষ্য পর্য্যবসিত হইবে?" ফ্যারাডে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ব্যবসা ততই তাঁহার নিকট ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল, বিজ্ঞানের মূর্ত্তি ততই তাঁহার চোখে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল।

ফ্যারাডে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "বিজ্ঞান শিখিতেই হইবে, সুখ চাইনা,

সম্পদ্ চাইনা—পার্থিব সুখ সম্পদ ভোগ বিলাস কিছুই কিছু নয়।" বিজ্ঞান-ক্ষেত্রের অতি হীন কার্য্যও তাঁহার নিকট অতীব গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। সঙ্গীত-মুগ্ধ কোন কোন বালকের সম্বন্ধে এরূপ শুনা যায় যে, তাহারা যাত্রার দলে প্রবেশ করিবার জন্য নাকি অধিকারীর পরিচারকরূপে হুকাকল্কী ডিপার্টমেণ্টের ভার অতীব আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করিত। বিজ্ঞান-মুগ্ধ ফ্যারাডে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে তামাক সাজা কার্য্য পাইলে তিনি আর কিছু চান না।" ফ্যারাডে আর থাকিতে পারিলেন না; "যাহা বায়ান্ন তাহা-তিপ্পান্ন" ভাবিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাসায়নিক পণ্ডিত ডেভি সাহেবের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। লিখিলেন, "ব্যবসা তাঁহার ভাল লাগে না, বিজ্ঞানক্ষেত্রে অতি সামান্য একটু কার্য্য পাইলে তিনি কৃতার্থ হন।" ঐ সঙ্গে তিনি ডেভি-সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া উহার যে নোট করিয়াছিলেন, তাহাও পাঠাইয়া দিলেন।

ফ্যারাডের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল- ডেভির মন টলিল। ডেভি ফ্যারাডের পত্রের উত্তরে লিখিলেন, "তুমি তোমার উৎসাহ ও উপযোগিতার যে প্রমাণ দিয়াছ, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি: তোমার কোন উপকার করিতে পারিলে আমি সুখী হইব।" এই দিন ফ্যারাডের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের দিন। কিরূপে কি হইল, বুঝা যায় না। হয়ত, ফ্যারাডের পত্রে ডেভি তাঁহার অদম্য বিজ্ঞান-তৃষ্ণার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হয়ত, ফ্যারাডে-প্রেরিত বক্তৃতার নোট ডেভির মন কোমল করিয়াছিল। হৃদয়ের যে তন্ত্রীতে আঘাত পাইয়া মান্ধাতার কাল হইতে এ পর্য্যন্ত মানব মাত্রেই পরদুঃখ দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া আসিয়াছে, যে তন্ত্রীতে আঘাত করিবার নাম সাধু ভাষায় গুণকীর্ত্তন ও অসাধু ভাষায় খোসামোদ করা, ফ্যারাডে-প্রেরিত বক্তৃতার নোট হয়ত ডেভি সাহেবের সেই তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল; অথবা হয়ত মানুষের ভাগ্যবিধানের কর্ত্তা মানুষ ছাড়া আর কেহ। হয়ত, এমন একজন আছেন, যাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই জল পড়ে, পাতা নড়ে, ফুল ফোটে, বায়ু বহে, পাখী গায়; যাঁহার নিয়মাধীনে শত শত গ্রহ উপগ্রহ, অগণিত নক্ষত্র, অসংখ্য উল্কাপিণ্ড অনন্ত আকাশের গাত্রে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; যাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, যাঁহার অঙ্গুলী সঞ্চালনে নীহারিকা হইতে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, আবার সৃষ্ট জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, যাঁহার ইঙ্গিতে কি মানুষ কি কীট, সমুদায় প্রাণী কখনও

সম্পদের কোলে হাসিতেছে, খেলিতেছে, কখনও বা বিপদের কশাঘাতে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে। হয়ত, ফ্যারাডের প্রাণের ব্যাকুলতা, ফ্যারাডের কাতর প্রার্থনা সেই দেবতার কর্ণে ফ্যারাডের অদৃষ্টচক্র অর্দ্ধপাক ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন। আর নাই বা হইবে কেন? মানুষ একেবারে নিষ্ঠুর নহে, দেবতা নির্দ্দয় নহেন। কোথায় দেখিয়াছ, এ পৃথিবীতে যে প্রকৃত গুণ মানুষের নিকট একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে, করুণ প্রার্থনায় ভগবানের আসন মোটেই টলাইতে পারে নাই? ইচ্ছা থাকিলে সুযোগের অভাব হয় না। যদি তোমার অন্তঃকরণে মহত্ত্বের বীজ নিহিত থাকে, যদি আত্মোন্নতির জন্য তোমার যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকে, যদি স্বার্থপরতা-শূন্য হইয়া তুমি জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, ধর্ম্মের জন্য তোমার জীবন নিয়োজিত করিতে পার, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন মানুষ নাই, স্বর্গে এমন দেবতা নাই, যিনি তোমার সহায় না হইবেন।

কয়েকদিন অতীত হইল। একদিন রাত্রিকালে ফ্যারাডের প্রতিবাসিবর্গ চমকিত হইয়া শুনিল, ঘর্ঘর রবে মস্ত একখানা গাড়ী ফ্যারাডের কুটীর-প্রান্তে আসিয়া স্থির হইল। তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিল, ডেভির সুসজ্জিত কোচ হইতে সুন্দর কোচম্যান নামিয়া আসিয়া হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিয়া ফ্যারাডের গৃহের দ্বার খোলাইল এবং একখানা চিঠি রাখিয়া চলিয়া গেল।

ডেভি ফ্যারাডেকে পরদিন প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রানুযায়ী পরদিন প্রাতে ফ্যারাডে ডেভির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই দিন ফ্যারাডে রয়াল ইনষ্টিটিউসনের সহকারী পদে (Laboratory Assistant) নিযুক্ত হন, মাহিয়ানা সপ্তাহে ২৫ শিলিং। এই সহকারীর পদে পূর্ব্বে একজন লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে ডেভি তাহাকে বরখাস্ত করেন। ডেভিও এই সময় রাসায়নিক পরীক্ষা-কালে চোখে আঘাত পাইয়া ভুগিতেছিলেন। কাজেই ফ্যারাডে ডেভির সহিত সাক্ষাৎ মাত্রেই তাঁহার সহকারীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাহার দুর্ভাগ্যের সহিত কাহার সৌভাগ্য কি ভাবে গ্রথিত থাকে, তাহা সেই ভাগ্যবিধাতাই জানেন। এই সময়ে ফ্যারাডের বয়স ২২ বৎসর মাত্র।

রয়াল ইনষ্টিটিউসন আজিও বর্ত্তমান— আজিও উন্নত ধরণের বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার পক্ষে ইংলণ্ডে ইহাই প্রধান বিজ্ঞান-মন্দির। ফ্যারাডের বিজ্ঞান-জীবনের কার্য্যক্ষেত্র এই রয়াল ইনষ্টিটিউসন সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা এখানে

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কাউণ্ট-রুমফোর্ড—সেই বিখ্যাত কাউণ্ট-রুমফোর্ড, যিনি পরীক্ষাদ্বারা সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণিত করেন যে, 'তাপ' শক্তিরই মূর্ত্তিবিশেষ মাত্র। ১৭৯৯ খ্রীঃ এই ইনষ্টিটিউসন স্থাপিত হয়। তখন ফ্যারাডের বয়স ৮ বৎসর মাত্র। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য কয়েকবার ইহার লোপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?" যায় যায় হইয়াছে, এমন সময়ে ডেভি সাহেব ইহার ভার গ্রহণ করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে ইহাকে রক্ষা করেন। পরে ফ্যারাডের নির্লোভিতা, স্বার্থত্যাগ ও অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইহা মৃত্যুকে ত পরাজিত করিয়াছিলই, ইহা আজ জ্ঞানী-সমাজের বিশেষ গৌরবের স্থল। এই জ্ঞান-মন্দির কতকটা কলেজের মত, কিন্তু ঠিক কলেজ নয়। এখানে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়, বক্তৃতা হয়, যন্ত্রাদি সহযোগে পরীক্ষা প্রদর্শন হয় ; শ্রোতা জনসাধারণ, দর্শক জনসাধারণ, ছাত্র জনসাধারণ। কিন্তু অধ্যাপকগণের নৈমিত্তিক কার্য্যের পরিমাণ অতি সামান্য, বৎসরে ২৪টী মাত্র বক্তৃতা। বেশীর ভাগ সময় অধ্যাপকগণ স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবেন, মৌলিক গবেষণা করিবেন, নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবেন, তজ্জন্য উপযুক্ত স্থান, অবসর ও যন্ত্রাদি প্রদান করাই ইনষ্টিটিউসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেশী বক্তৃতা কাহাকেও দিতে হইত না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বক্তৃতার সংখ্যা নিতান্ত কম ছিলনা। আলোক-বিজ্ঞান, শব্দ-বিজ্ঞান, তাড়িত-বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, শারীর বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা,—প্রাকৃত বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা ছিল না, যাহা এখানে আলোচিত হয় নাই। এই মন্দিরে ডেভি সাহেব তাঁহার আবিষ্কৃত Arc-lamp ও Safety lamp প্রদর্শন করেন। এই বিজ্ঞান-মন্দিরে বসিয়া ডেভি ও ফ্যারাডে পটাস্ ক্ষার বিশ্লেষিত করিয়া পোটেসিয়ম্ ধাতু আবিষ্কার করেন, এই বিজ্ঞান-মন্দিরে ৫০ বৎসর কাল, দিনের পর দিন, নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফ্যারাডে জন-সমাজকে চমৎকৃত করেন, এই বিজ্ঞান-মন্দিরে টিণ্ড্যাল সাহেব তাঁহার Radiant Heat সম্বন্ধে পরীক্ষাদি করেন, এই বিজ্ঞান মন্দিরে কিছু দিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ডুয়ার সাহেব, তাঁহার আবিষ্কৃত প্রকাণ্ড যন্ত্র সহযোগে প্রবল চাপ ও দুরন্ত শৈত্য উৎপাদন করিয়া স্থির করিয়া বায়ুকে তরল পদার্থে পরিণত করেন, এবং এই বিজ্ঞান-মন্দিরে কয়েক বৎসর মাত্র হইল, বঙ্গের ফ্যারাডে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে নূতন নূতন সাড়া দিবার প্রণালীতে ঐক্য প্রদর্শন করিয়া, এবং মূক জড়ের মুখে

উপযুক্ত ভাষা যোগাইয়া বধির নর-সমাজকে জড়ের হর্ষ, বিষাদ ও মৃত্যু-যাতনার কাহিনী শুনাইয়া জনসমাজে এক নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছেন। অধুনাতন কালে এই বিজ্ঞান-মন্দিরের সংস্কার সাধিত হইয়াছে, অনেক পুরাতন ভাঙ্গিয়াছে, অনেক নূতন গঠিত হইয়াছে, কিন্তু ডেভি-ফ্যারাডের পরীক্ষা-গৃহ এখনও অবিকৃতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এই বিজ্ঞান-মন্দিরে ফ্যারাডে ডেভির শিষ্য হইলেন—যেন দ্রোণের পার্শ্বে পার্থ; যেমন গুরু তেমন শিষ্য। এতদিনে ফ্যারাডের অভিলাষ পূর্ণ হইল। তিনি রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসনে কার্য্য পাইলেন। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরিয়াও পূরিল না: সবে মাত্র কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, এই সময়ে একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল,—দেড় বৎসরের জন্য ডেভি বিদেশ যাত্রা করিলেন, ফ্যারাডেকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইল। অথবা বিঘ্নই বা বলা যায় কিরূপে? বিদেশ-ভ্রমণে ফ্যারাডে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিলেন, তাহা সত্যানুসন্ধানের পথে একটা যে প্রধান বিঘ্ন,—সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার, তাহা দূরীভূত হওয়ায় যে তাঁহাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ আবিষ্ক্রিয়া পরম্পরার উপযোগী করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডেভি বিদেশে চলিলেন, সঙ্গে চলিলেন মিসেস্ ডেভি ও কেরাণী ফ্যারাডে। কেননা, এখন ফ্যারাডের কার্য্য হইল, ডেভি যাহা বলিবেন —রসায়নবিদ্ ডেভির অনেক দেখিবার আছে, শিখিবার আছে—লিখিবার আছে—ডেভি যাহা বলিবেন, তাহা নোট করা। ফ্যারাডের পক্ষে ডেভির সহিত দেড় বৎসর-ব্যাপী বিদেশ পর্য্যটন যে-সে কথা নয়, বাইশ বৎসরের যুবক, সংসারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যিনি লণ্ডনের গণ্ডী ছাড়িয়া কোন দিন এক পদ অগ্রসর হন নাই, তাঁহার পক্ষে এক টানে ফ্রান্স, ইতালী, জর্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসা সোজা কথা নহে। সঙ্গে মুরুব্বি যে-সে লোক নয়, —স্বয়ং সার হাম্‌ফ্রি ডেভি। ইহার ফল হইল এই যে, দপ্তরী ফ্যারাডে ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া দেখিলেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সহিত তাঁহার আলাপ ও বন্ধুত্ব হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সে যাইয়া তাঁহার আমপিয়র, ক্লেমেণ্ট ও ডিসোরমিসের সহিত আলাপ ও পরিচয় হয় ও তাঁহাদের রাসায়নিক পরীক্ষা দর্শন করেন; ফ্লোরেন্সনগরে তিনি গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দর্শন করেন। এ দূরবীণটা কি? একটা কাগজের নল, আর দুই মুখে দুইটা আতসী কাচ। এই দূরবীণ সাহায্যেই গ্যালিলিও জুপিটর গ্রহের কয়েকটী চন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই খানে তিনি

টাসকেনীর ডিউকের বিখ্যাত দাহকারী কাচ (Burning glass) দর্শন করেন। শুধু দর্শন নয়, গুরু শিষ্যে মিলিয়া উহার সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া তদ্দ্বারা হীরক পোড়াইয়া দেখেন যে, হীরক কয়লা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নেপল্‌স্‌নগরে তাঁহারা অগ্নিগর্ভ বিসুবিয়স্‌ আরোহণ করেন। মিলান নগরে তাঁহারা বিখ্যাত ভল্টেয়ারের সহিত আলাপ করেন। দেড় বৎসরব্যাপী ভ্রমণের পর ফ্যারাডে ডেভির সহিত ইংলণ্ডে ফিরিলেন, কিন্তু যখন ফিরিলেন, তখন আর তিনি সে ফ্যারাডে নন।

ফ্যারাডে রয়াল ইনষ্টিটিউসনে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার কার্য্য হইল, ডেভি ও ব্রাণ্ডি সাহেবের বক্তৃতায় তাঁহাদের সাহায্য করা; সঙ্গে সঙ্গে তিনি "কোয়ার্টার্লি জারন্যাল্‌ অব সায়ান্স" নামক পত্রিকায় লিখিতে লাগিলেন। টেটাম্‌, ব্রাণ্ডি ও ডেভির বক্তৃতা তিনি অতি মনোযোগ সহকারে শুনিতেন। শুধু বিষয় শিখিবার জন্য নয়, ক্রমে তাঁহার মনে উচ্চাভিলাষ জন্মিতে লাগিল, তিনি একজন উচ্চ অঙ্গের বক্তা হইলেন।

ডেভির বক্তৃতার দোষগুণ তিনি অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বিশ্বাস হইল, তিনি লোকসমাজে দাঁড়াইবার যোগ্য হইয়াছেন। সিটী ফিলজফিকাল্‌ সোসাইটী বলিয়া একটা সোসাইটি লণ্ডনের যুবকগণের চেষ্টায় পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। ফ্যারাডে এইখানে পরপর সাতটী বক্তৃতা দেন। এই সময়েই ডেভি তাঁহার "অভয়-প্রদীপ" (Safety Lamp) প্রস্তুত করেন। অনেক ভাঙ্গা গড়ার পর ল্যাম্প মনের মতন হইল। ফ্যারাডে তখন ডেভির সহকারী। সহকারীর নিকট যতখানি প্রাপ্য, ডেভি ফ্যারাডের নিকট সে সাহায্য পাইয়াছিলেন। অবিচলিত ভক্তি সহকারে ফ্যারাডে ডেভির কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও স্বাধীন ভাবে পরীক্ষাদি করিতে থাকিলেন। তিনি যাহা কিছু নূতন দেখিতেন, যাহা কিছু ভাবিবার, স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহাই নোট করিয়া রাখিতে লাগিলেন। যথা :—

১। Do pith balls diverge by the disturbance of Electricity in consequence of Mutual Induction or not?

২। Query—The nature of the body Phillips burns in his Spirit-lamp?

৩। Convert Magnetism into Electricity.

৪। General effects of compression, either in condensing

gases or producing solutions or even giving combinations at low temperatures.

৫। Transparency of metals Sun's light through gold leaf.

৬। Two similar poles, though they repel at most distances attract at very small distance and adhere Query—why?

৭। Could not magnetise a plate of steel so as to resemble a flat spiral.

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, কিরূপ পরীক্ষার পর পরীক্ষা দ্বারা ফ্যারাডে নিজকে গঠিত করিয়া লইতেছিলেন। এই নোট বই মধ্যে একটী কবিতাও দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতার প্রতি ফ্যারাডের বিশেষ কোন ঝোক কখনই লক্ষিত হয় নাই। নীচের লিখিত কবিতাটীতেও ফ্যারাডের কোন দায়িত্ব নাই ইহার লেখক তাহার কোন কবি-বন্ধু। ফ্যারাডের সমবয়স্কগণ তাহাকে কি চোখে দেখিতেন, এই কবিতায় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যথা—

Neat was the youth in dress, in person plain,
His eyes read thus "Philosopher in grain."
Of understanding clear reflection deep,
Expert to apprehend and strong to keep.
His watchful mind no subject can elude,
Nor specious arts of sophists e'er delude:
His powers unshackled, range from pole to pole,
His mind from error free, from guilt his soul;
Warmth in his heart, good humour in his face,
A friend to mirth, but foe to vile grimace,
A temper candid, manners unassuming,
Always correct, yet always unapresuming.
Such was the youth, the chief of all the band,
His name well-known, Sir Humphry's right-hand.

ফ্যারাডের নোটবুক অন্তর্গত আরও গুটি দুই লাইন উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। প্রেমে পড়ার উপর ফ্যারাডের কতটা রাগ ছিল, তাহা এই দুই লাইন হইতে বুঝা যাইবে।—

What is Love ?—A nuisance to every body but the parties concerned. A private affair which every one, but those concerned, wishes to make public.

ইহারই কিছুদিন পরে, কিরূপে কি হইল, বুঝা যায় না, ফ্যারাডে প্রেমে পড়িলেন,—হঠাৎ ফ্যারাডে দেখিলেন যে, বার্ণার্ড সাহেবের কন্যা 'সারা' তাঁহার হৃদয় মন অধিকার করিয়াছে। ফ্যারাডে সারাকে পত্র লিখিলেন। সারা পূর্ব্ব হইতেই কোন রূপে জানিতেন যে, পুষ্পধন্বার সহিত ফ্যারাডের অহি-নকুল সম্বন্ধ। সারা ভয় পাইলেন, ভগ্নীর সহিত ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ফ্যারাডে পিছনে পিছনে যাইয়া উপস্থিত! পাঠক! যদি বিল্বমঙ্গল বুঝিয়া থাক, যদি রামকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ-চরিত বুঝিয়া থাক, তবে ফ্যারাডে বুঝা কঠিন হইবে না। এ সেই উন্মাদনাময় বিশ্ববিজয়ী প্রেম—যাহা ছিল বলিয়া প্রকৃতির অন্ধকার-পূর্ণ রাজ্য হইতে পাতি পাতি করিয়া ফ্যারাডে সত্যরত্ন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রেমের লক্ষ্য তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারে নাই—সে লক্ষ্য সারা বার্ণার্ডই হৌক বা Electromagnetic Inductionই হৌক। প্রকৃতি দেবী কতবার ফ্যারাডের নয়ন সমক্ষে অনাবিষ্কৃত সত্যের মধুর আকৃতিতে উপস্থিত হইয়া, ফ্যারাডের নয়ন মন মুগ্ধ করিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইবার উপক্রম করিয়াছেন; মুগ্ধ ফ্যারাডে, হিপনটাইজড্ ফ্যারাডে উন্মাদের ন্যায় পশ্চাতে ধাবিত হইয়া হিপ্‌নটাইজারকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন—ফাঁকি দিয়া পলাইতে দেন নাই। ফ্যারাডে সারাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ফ্যারাডের ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহারা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। ৪৬ বৎসর কাল—আমরণ স্বামী স্ত্রীর লেবোরেটারিই বাসগৃহ ছিল। মিসেস্ ফ্যারাডে কত উৎসাহের সহিত স্বামীর কার্য্যের সহায়তা করিতেন, আর স্বামীর আবিষ্ক্রিয়া পরম্পরায় কিরূপ বিস্মিত হইয়া পড়িতেন। পত্নীর প্রতি ফ্যারাডের প্রেম কি প্রকারে বুঝাইব? পর্ব্বতগুহা নিসৃত স্রোতস্বতীর ন্যায় যে প্রেমধারা সহসা একদিন ফ্যারাডের হৃদয়কন্দর হইতে বহিঃনিসৃত হইয়াছিল, ৪৬ বৎসর কাল সে প্রেমধারা সমান বেগে বহিয়াছিল। এই বিজ্ঞান-বীরের পত্নীর স্নেহ, মমতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা আমাদের সীতা, সাবিত্রীর পাতিব্রত্য স্মরণ করাইয়া দেয়। শেষ জীবনে যখন পত্নী খোঁড়া হইয়া, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, ফ্যারাডে তখন অতি ধীরে, অতি সাবধানে, পত্নীকে এক রকম বহন করিয়া

লেবোরেটারি গৃহাভিমুখে লইয়া যাইতেন। যখন বার্দ্ধক্য আসিয়া ধীরে ধীরে ফ্যারাডেকে অধিকার করিয়াছিল, যখন ফ্যারাডের হৃদয় ও মনের অমানুষিক তেজঃবহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র ছিল, কিন্তু দাহিকা-শক্তি ছিল না, যখন ফ্যারাডের স্মৃতিশক্তি ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে ছিল, তখন তিনি পত্নীর দিকে চাহিতেন, আর রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেন, আর বলিতেন, "আমার পত্নীর কি দশা হইবে? আমার সাধ্বী পত্নী—" সে দৃশ্য যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

বিবাহের পর ফ্যারাডে রীতিমত রুটিন করিয়া বিজ্ঞান-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ফলে তিনি যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব। ফ্যারাডে ক্রমে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে লাগিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে ফ্যারাডে রয়াল সোসাইটির ফেলো নিযুক্ত হন। এই ঘটনা উপলক্ষে গুরুশিষ্যে যে মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, আমরা তাহার উল্লেখ মাত্রেই নিরস্ত রহিলাম। তারপর ফ্যারাডে রয়াল ইনষ্টিটিউসনের ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত হন। তারপর তিনি চিরজীবনের জন্য রয়াল ইনষ্টিটিউসনের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার কোন বাধাবাধকতা রহিল না। এই রয়াল ইনষ্টিটিউসনই ফ্যারাডের কর্ম্মক্ষেত্র।

ফ্যারাডের মৌলিক গবেষণা।

ফ্যারাডের মৌলিক গবেষণার কাল ৪৪ বৎসর। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি যে সকল নূতন নূতন পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তালিকা দিতে গেলেই অনেক পৃষ্ঠা ভরিয়া যায়। তিনি যে সকল সত্য নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা কেবল তাহার প্রধান প্রধান গোটা কয়েকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করিব।

১। প্রথম জীবনে ফ্যারাডে যে সকল সত্য আবিষ্কার করেন, তাহার মধ্যে একটী প্রধান আবিষ্কার, তাড়িত-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি এই আবিষ্কার করেন। কথাটা বুঝিতে হইলে তদানীন্তন কালের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা আবশ্যক। নিউটন-আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম হইতে লোকের ধারণা হইল, ২টী জড় পদার্থ পরস্পরকে সরল রেখাক্রমে স্ব স্ব অভিমুখে টানে। কেমন করিয়া টানে, তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। লোকে ধরিয়া নিল, টানটা দূরে দূরেই হইয়া থাকে।

সেইরূপ একটা চুম্বকের উত্তর ধ্রুব আর একটার দক্ষিণ ধ্রুবকে টানে, সেইরূপ দুইটী তাড়িত-বিশিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে টানে। টানটা সর্ব্বত্রই পরস্পরাভিমুখী। বিজ্ঞানজগতে মানসিক হাওয়া এই প্রকার, এই অবস্থায় কোপেনহেগেন্ সহরের উরষ্টেড্ সাহেব আবিষ্কার করিলেন যে, যদি একটা তারের ভিতর তাড়িৎপ্রবাহ চলিতে থাকে, আর সেই তারটা একটা চুম্বকের কাঁটার নিকট ধরা যায়, তবে ঐ তারটা ঐ চুম্বকের উপর বল প্রয়োগ করে। শুধু যে বল প্রয়োগ করে, তাহা নহে, উরষ্টেড সাহেব দেখাইলেন যে, এই বল প্রয়োগ প্রণালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। চুম্বকের উপরে এমন ভাবে বল প্রযুক্ত হয়, যাতে করে চুম্বকটা তারের দিকেও আসে না, তারের থেকে দূরেও সরিয়া যায় না, কিন্তু তারটার আড়াআড়ি হইতে চেষ্টা করে। পণ্ডিত সমাজে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল এ আবার কি রকম সৃষ্টিছাড়া বল প্রয়োগ? তাড়িত-প্রবাহের দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া তারটা চুম্বকের একবার উপরে একবার নীচে, একবার এ পাশে একবার ওপাশে রাখিয়া নানা-প্রকার পরীক্ষার দ্বারা আমপিয়ার সাহেব চুম্বকের কাঁটার দোলনে একটা নিয়ম দেখিতে পাইলেন। নিয়মটা এই, তারে যে দিকে তড়িৎ বহিতেছে, যদি মনে করা যায়, সেইদিকে একজন হাত-পা-ওয়ালা মানুষ সাঁতরাইতেছে, কিন্তু লক্ষ্যটা সর্ব্বদাই তার চুম্বকের উপর, তবে চুম্বকের উত্তর ধ্রুবটা কোন্ দিকে হেলিবে? না, সন্তরণশীল ব্যক্তির বাঁ হাতের দিকে; আর দক্ষিণ ধ্রুব? ঐ ব্যক্তির ডান হাতের দিকে। মোটের উপর চুম্বকটা তারের আড়া আড়ি ভাবে স্থির হইতে চাহিবে। এই গেল গোটা চুম্বকের উপর ক্রিয়া। এখন জিজ্ঞাস্য হইল, যদি এমন একটা চুম্বক পাওয়া যাইত, যাহার কেবল একটী মাত্র ধ্রুব আছে (মনে কর যেটুক, যাহার কেবল উত্তর ধ্রুব নাই) তাহা হইলে তাহার উপর তাড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়া কি প্রকার হইবে? নিয়মে বলে ঐ উত্তর ধ্রুবটা ঐ সন্তরণশীল ব্যক্তির বাঁ হাতের দিকে যাইবে। তবে কি একই দিকে বরাবর চলিতে থাকিবে? নিয়মে তা ত বলে না। নিয়মে বলে, সন্তরণকারী ব্যক্তির লক্ষ্যটা সর্ব্বদাই চুম্বকের উপরে থাকা চাই: এইটা ঠিক রাখিয়া তাহার বাঁ হাত যখন যেদিকে থাকিবে, উত্তর ধ্রুবটা তখন সেই দিকে যাইবে। ফলে দাঁড়াইল এই যে, চুম্বক ধ্রুবটা বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে; কেন না, চুম্বক ধ্রুবের গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্তরণশীল মানুষকেও তাহার বাঁ হাত ডান হাত লইয়া ঘুরিতে হইবে, নতুবা চুম্বকের উপর এই মন গড়া

ব্যক্তিটীর লক্ষ্য স্থির থাকে কই? উরষ্টেড সাহেবের আবিষ্কারের পরে ফ্যারাডের কেবলই মনে হইতে লাগিল, চুম্বক ধ্রুব যদি তাড়িত-তার বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে, তবে স্বাধীন ভাবে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার ক্ষমতা তারটাই বা কেন চুম্বক ধ্রুবের চারিদিকে না ঘুরিবে? পৃথিবী সূর্য্যকে বেড়িয়া ঘোরে সূর্য্যেরও পাল্টা আবর্ত্তন আছে। গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে, ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, তাড়িত-তার কেন চুম্বক বেড়িয়া না ঘুরিবে? —যদি চুম্বক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘোরে, তবে তারকেও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘুরিতেই হইবে।—তবে তারটা ঘুরিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করা চাই। ফ্যারাডে বন্দোবস্ত করিলেন, তার চুম্বক বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিল। মনুষ্য হস্তনির্ম্মিত তাড়িত-তারের এই সর্ব্ব প্রথম চুম্বক ঘোরা। ফ্যারাডের সেই দিনের উৎসাহ ও আনন্দ অবর্ণনীয়। শ্যালক জর্জ্জ নিকটে ছিলেন। হর্ষোৎ-ফুল্লনেত্রে ফ্যারাডে টেবিল বেড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন "দেখচো জর্জ্জ, দেখচো জর্জ্জ, ঐ ঘুরিল, ঐ ঘোরে, ঐ ঘুরেছে।" তার ঘুরিতে লাগিলেন। দুই সুন্দর।

২। ইহার কিছুদিন পরেই ফ্যারাডে আর একটা মস্ত কাজ করেন। আগেকার দিনে বৈজ্ঞানিকগণ অনিল পদার্থসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, কতকগুলি অনিল পদার্থ তরল পদার্থ হইতে উদ্ভূত বাষ্প মাত্র, যেমন জলায় বাষ্প ইত্যাদি। ঠাণ্ডা করিলে বা চাপ দিলে ইহারা সহজেই তরল পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। আর কতকগুলি অনিল পদার্থ ভিন্ন প্রকৃতির; ইহারা স্থির বায়ু, যেমন উদজান, অম্লজান, ক্লোরিন ইত্যাদি। ইহাদিগকে যতই ঠাণ্ডা করা যাউক, ইহাদের উপর যতই চাপ প্রয়োগ করা যাউক, ইহারা কিছুতেই বায়ু প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া তরলীভূত হইবার নয়। ফ্যারাডে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিলেন যে, এ ধারণা ভুল। স্থির বায়ু কথাটার কোন অর্থ নাই। উপযুক্ত পরিমাণে চাপ প্রয়োগ করিতে পারিলে উপযুক্ত পরিমাণে ঠাণ্ডা করিতে পারিলে, সকল বায়ুকেই বশীভূত করিতে পারা যায়। ফ্যারাডে একটা বাঁকা ও খুব শক্ত গোছের কাঁপা কাঁচের নলের এক প্রান্ত লবণ মিশ্রিত বরফের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলেন ও অপর প্রান্তে তাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলেন। নলের দুই মুখই বন্ধ, কিন্তু বন্ধ করিবার পূর্ব্বে একটা পদার্থ রাখিলেন, গরম করিলে যাহা হইতে গ্যাস উৎপন্ন হয়। তাপ প্রয়োগে যতই গ্যাস উৎপন্ন হইতে লাগিল, ততই গ্যাসের

উপর চাপ বাড়িতে লাগিল। এ দিক হইতে চাপ, ওদিকে দুরন্ত ঠাণ্ডা, পলাইবারও উপায় নাই; কাজেই গ্যাস মহাশয়কে ধীরে ধীরে তরলাকার প্রাপ্ত হইতে হইল।

৩। তার পর ফ্যারাডে পুনরায় তাড়িত-বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ঐ দিকেই তাঁহার ঝোঁকটা বেশী ছিল। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ষ্টারজিয়ন সাহেব দেখাইয়াছিলেন যে, লৌহখণ্ডের চারিদিকে তার জড়াইয়া ঐ তারে তাড়িত সঞ্চালিত করিলে, লৌহখণ্ড চুম্বকের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। ফ্যারাডে পড়িতেন, দেখিতেন, ভাবিতেন। ফ্যারাডে ভাবিলেন "লৌহকে চুম্বক করা যায় তাড়িত প্রবাহ দ্বারা—অর্থাৎ তাড়িত হইতে চুম্বক পাই; তবে চুম্বক হইতে তাড়িত পাইব না কেন?" দেখা যাউক। ফ্যারাডে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু চুম্বক হইতে তাড়িত পাওয়া গেল না। এক দুই করিয়া চারি বৎসর অতীত হইল। বার বার অকৃতকার্য্য হইলেন, কিন্তু পরীক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। ফ্যারাডে একটা তারের গুটীর মধ্যে এক খণ্ড লৌহ রাখিলেন। একখানা চুম্বক ঐ লৌহখণ্ডের নিকট ধরিয়া লৌহ খণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করিলেন। তার পর, তারের ভিতর দিয়া তাড়িত-প্রবাহিত হইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য তারের দুই প্রান্ত তাড়িত-মাপক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন,—যন্ত্রে কোন সাড়া দিল না। চুম্বক হইতে তাড়িত পাওয়া গেল না।

ফ্যারাডে তারের গুটীর মধ্যে, লৌহ খণ্ডের পরিবর্ত্তে একটা চুম্বক রাখিলেন। তার পর তারের গুটীর দুই প্রান্ত পুনরায় তাড়িত-মাপক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন; যন্ত্রে কোন সাড়া দিল না। একখানা চুম্বকের পরিবর্ত্তে দুইখানা রাখিলেন, তিনখানা, চারিখানা রাখিলেন। তার পর, তারের গুটীর দুই প্রান্ত পুনরায় তাড়িত-মাপক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিলেন। যন্ত্রে কোন সাড়া দিল না, চুম্বক হইতে তাড়িত পাওয়া গেল না। পাওয়া না গেলে কি হয়? ফ্যারাডের দৃঢ় বিশ্বাস, তাড়িত পাওয়া যাইবেই; নহিলে প্রাকৃতিক নিয়ম অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, নহিলে প্রকৃতির বিধানের সার্ব্বভৌমিকতা বিলুপ্ত হয়। কি তীক্ষ্ণ অনুভূতি! কি প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি অটল বিশ্বাস! কথিত আছে, এই নিষ্ফল পরীক্ষা কালে, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার ওয়েষ্টকোটের পকেটের মধ্যে তার জড়ান একখণ্ড লৌহ রাখিতেন। সময় নাই, অসময় নাই, সহসা সেই লৌহখণ্ড বাহির

করিয়া ভাবিতে বসিতেন "এই তারের ভিতর দিয়া তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে এই লৌহখানা চুম্বক হইয়া যাইবে, আর এই লৌহখানাকে যদি চুম্বক করা যায়, তবে কি হইবে?" ফ্যারাডে বলিলেন, "তারের ভিতর তাড়িত বহিবেই বহিবে। আমার পরীক্ষায় নিশ্চয় কোথায়ও দোষ আছে। আমি ঠিকমত দেখিতে পারি নাই।"

যে ঠিকটা দেখিতে চায়, সে ঠিকটাই দেখিতে পায়; ফ্যারাডেও পাইয়াছিলেন। ফ্যারাডে একটা তারের গুটীর মধ্যে একখণ্ড লৌহ রাখিয়া তারের দুই প্রান্ত তাড়িত-মাপক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। তার পর একখানা চুম্বক লৌহখণ্ডের নিকট ধরিয়া লৌহখণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করিলেন; অমনি যন্ত্রের কাঁটা কাঁপিয়া উঠিল। এইবার চুম্বক হইতে তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি প্রমাণিত হইল। যতক্ষণ চুম্বক লৌহখণ্ডের সংস্পর্শে স্থির হইয়া রহিল, ততক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া গেল না। যেই চুম্বক অপসৃত হইল, অমনি যন্ত্র সাড়া দিল—কিন্তু বিপরীত দিকে।

ফ্যারাডে, একটা তারের গুটীর দুই প্রান্ত তাড়িত-মাপক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিলেন। তার পর একখানা চুম্বক গুটীর ভিতর প্রবিষ্ট করাইতেই সাড়া পাওয়া গেল। চুম্বকের স্থির অবস্থায় কোন সাড়া নাই। চুম্বক তুলিয়া লইতে পুনরায় সাড়া—এবার উল্‌টা দিকে। ফ্যারাডের বিশ্বাস সত্যে পরিণত হইল, চুম্বক হইতে তাড়িত পাওয়া গেল।

পূর্ব্বে কেনই বা অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, আর এখনই বা কেন কৃতকার্য্য হইলেন, বুঝিতে ফ্যারাডের বিলম্ব হইল না। আর এইটা বুঝিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা। ফ্যারাডে বুঝিলেন, চুম্বক যতক্ষণ তারের গুটীর মধ্যে থাকে বা উহা হইতে দূরে সরিতে থাকে, ততক্ষণ—কেবল ততক্ষণই—তারে তাড়িত-প্রবাহ উৎপন্ন হয়; নতুবা যত বড় চুম্বকই হউক না কেন, সহস্র বৎসর ধরিয়া তারের গুটীর পাশে পড়িয়া থাকিলেও তারে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হইবে না।

এই আবিষ্কার সম্বন্ধে মেও সাহেবের একটা কবিতা আছে ঃ—

Around the magnet Faraday
Was sure that Volta's lightnings play;
But how to draw them from the wire?

He took a lesson from the heart;
'Tis when we meet, 'tis when we part
Breaks forth the electric fire.

তারপর আবার, ফ্যারাডে, একটা তারের গুটীর দুইপ্রান্ত তাড়িত-মাপক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিলেন। ফ্যারাডে এখন কল বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। এখন থেকে তাড়িত-মাপক যন্ত্রের সহিত সংযোগটা পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করিয়া রাখিতে লাগিলেন। তারপর দ্বিতীয় একটা তারের গুটি ঐ ১নং গুটির মধ্যে রাখিলেন। যেই ২ নং গুটিতে তাড়িত সঞ্চালিত করিলেন, অমনি তাড়িত-মাপক যন্ত্র সাড়া দিয়া জানাইল যে, ১ নং গুটিতেও প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছে। ভিতরের গুটিতে তাড়িত প্রবাহ সমান চলিতে থাকিল, কিন্তু তখন আর বাহিরের গুটিতে তাড়িত প্রবাহের কোন লক্ষণ বুঝা গেল না। আবার যেই ভিতরের প্রবাহ বন্ধ হইল, অমনি বাহিরে প্রবাহ উৎপন্ন হইল—এবার উল্টা দিকে।

তারপর ফ্যারাডে দেখিলেন, যেমন চুম্বক ও তারের গুটির আপেক্ষিক গতির কালে ঐ গুটিতে তাড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, চুম্বকের পরিবর্ত্তে, একটা তাড়িতযুক্ত তারের গুটি ব্যবহার করিলেও একই ফল পাওয়া যায়।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা মধ্য হইতে ফ্যারাডে ইহাদের ভিতরকার সাধারণ সত্যটুকু বাহির করিয়া ফেলিলেন। ফ্যারাডে দেখিলেন, গতিবিশিষ্ট চুম্বক যে কাজ করে, গতিবিশিষ্ট তারের গুটিও সেই কাজ করিয়া থাকে—অবশ্য, তারের গুটির ভিতর তাড়িত প্রবাহ চাই। ফ্যারাডে জানিতেন, যেমন অসংখ্য চুম্বক রেখা সর্ব্বদাই একখানা চুম্বককে ঘিরিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ, একটা তারের গুটির ভিতর যখন তাড়িৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে, তখন অসংখ্য চুম্বক-রেখা ঐ তারের গুটিকেও ঘিরিয়া ধরে। ফ্যারাডে তাঁহার পরীক্ষা সমূহ হইতে এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন—"যদি কোন উপায়ে একটা তারের গুটির ভিতরে চুম্বক-রেখার সংখ্যা বাড়ান যায় বা কমান যায়, তাহা হইলে ঐ তারের গুটিতে তাড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইবে—তা, সে চুম্বক-রেখার উৎপত্তিস্থান একটা চুম্বকই হৌক, বা আর একটা তাড়িত প্রবাহ সমন্বিত তারের গুটিই হউক, আর ঐ চুম্বক-রেখা সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ, উহাদের গতিই হউক বা উহাদের চুম্বকত্বের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধিই হউক।

ফ্যারাডে এই ব্যাপারের নাম দিলেন "Electromagnetic Induction." ব্যাপারটা Induction ব্যাপার, কেননা, এখানে সংস্পর্শ ব্যতিরেকে একটা তারের তাড়িৎ-প্রবাহ আর একটা তারে প্রবাহ উৎপন্ন করিতেছে—যেমন সংস্পর্শ ব্যতিরেকে ঘর্ষিত কাঁচ বা গালা পার্শ্বস্থ পদার্থ সমূহকে তাড়িত-ধর্ম্মাক্রান্ত করে, যেমন সংস্পর্শ ব্যতিরেকে একটা চুম্বক এক খণ্ড লৌহকে চুম্বকে পরিণত করে। আর ব্যাপারটা Electromagnetic; কেন না, এখানে তাড়িত-প্রবাহ উৎপত্তির কারণ হইতেছে, তারের গুটির ভিতর চুম্বক-রেখার পরিমাণের হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি।

৪। ফ্যারাডে বুঝিলেন, ব্যাপারটা চুম্বক-রেখা লইয়া, ভাবিলেন, পৃথিবীটাও ত একটা প্রকাণ্ড চুম্বক। ফ্যারাডে চুম্বক পৃথিবীর চুম্বক-রেখার সাহায্যে তাড়িতোৎপাদন করিতে লাগিলেন। দেখাইলেন, মানুষের গড়া চুম্বক চাই না, মানুষের গড়া ব্যাটারি চাই না, কেবল একটা তারের গুটি উল্টাইতে থাক বা ঘুরাইতে থাক, উহাতে অমনি তাড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইতে থাকিবে। প্রয়োজন হইলে মাতা বসুন্ধরাকে ব্যাটারিতে পরিণত করা, প্রয়োজন হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডটাকে Leyden Jarএ পরিণত করা, এতটা মনের বল ফ্যারাডের ছিল।

ফ্যারাডে সূত্র পাইলেন ত আবিষ্কার আর ফুরায় না। সপ্তাহ কাল সময় মধ্যে এই সকল যুগান্তর-কারী পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন হইয়াছিল। যুগান্তর-কারী পরীক্ষা? হাঁ; যদি বুঝিবার মত প্রাণ থাকিত, যদি বলিবার মত ভাষায় কথা থাকিত, তবে উচ্চতর কথায় ফ্যারাডের "মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইবার যোগ্য। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সভ্যতা বৃদ্ধিকল্পে যত কল কারখানা, যত যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকের বেশীর ভাগ, ফ্যারাডের এই আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিতেছে।

রুমকর্ফ সাহেবের Induction coil, সিমেন, গ্রাম্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের ডাইনামো যন্ত্র, ফ্যারাডের এই আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিতেছে। এখন আর এসিডের মধ্যে দস্তা পোড়াইয়া তাড়িতোৎপাদন করিবার আবশ্যক হয় না। চুম্বকের মুখের কাছে তার ঘুরাও তাড়িত পাইবে। টেলিগ্রাফ আফিসে যাও, রেলে যাও, ষ্টীমারে যাও, রাস্তা-ঘাটে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে, চুম্বকের মুখের কাছে তার ঘুরিতেছে আর তাড়িতোৎপন্ন হইতেছে, এবং সেই

তাড়িতের সহায়তায় তারে সংবাদ প্রেরিত হইতেছে, বাতি জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, মোটর চলিতেছে, বাতগ্রস্ত ব্যক্তির অবশাঙ্গ সবল হইতেছে। সেই হইতে তাড়িতোৎপাদন জন্য কত যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এই সকলের মূলে, ফ্যারাডের এই আবিষ্কার।

ফ্যারাডে স্বয়ংই চুম্বকের মুখের কাছে একটা তামার চাকৃতি ঘুরাইয়া প্রথম ডাইনামো প্রস্তুত করেন। কিন্তু ফ্যারাডের লক্ষ্য ব্যবসার দিকে ছিল না। যন্ত্রকে ব্যবসার উপযোগী করিবার ভার অন্যের উপর দিয়া, তিনি মূল সত্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া রহিলেন।

৫। ফ্যারাডে আরও ভাবিলেনঃ—একটা তারের গুটিতে তাড়িৎ প্রবাহিত হইলে, উহার নিজের চুম্বক রেখায় উহাকে ঘিরিয়া ফেলে। ভাবিলেন, প্রবাহের উৎপত্তি কালে রেখাগুলির উৎপত্তি, আর প্রবাহের রোধ কালে রেখাগুলির লয় প্রাপ্তি; কাজেই তাড়িত প্রবাহের আরম্ভে ও তাড়িত প্রবাহের শেষে, এই দুই সময়েই তারের গুটির ভিতরে রেখা সংখ্যার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। অতএব একটা তারের ভিতর ব্যাটারি হইতে তাড়িত প্রবাহিত করিতে গেলেই, অথবা প্রবাহমান তাড়িত-স্রোত রোধ করিতে বা স্রোতাবেগের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে গেলেই উহার ভিতর আর একটা প্রবাহ Electromagnetic প্রবাহ উৎপন্ন হইবার কথা। যেমন প্যাসেঞ্জার গাড়ী ষ্টেশন্ ছাড়িবার কালে আরোহিবর্গ সহসা পিছন দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, আর পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিবার কালে, আরোহিবর্গ সহসা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। ফ্যারাডে দেখিলেন, তাহাই হইয়া থাকে। ফ্যারাডে বলিলেন "জড়ত্ব শুধু জড়েরই ধর্ম্ম নয়, জড়ত্ব তাড়িতেরও ধর্ম্ম বটে।"

৬। তারপর ফ্যারাডের গবেষণায় আর একটা নূতন দিক আলোকিত হইল। অনেকের ভিতর এক দেখিতে, আপাতঃ-বিশৃঙ্খল রাজ্যে শৃঙ্খলা দেখিতে, ফ্যারাডের যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, আর কাহারও ছিল না। অথবা আর একজনের ছিল, যিনি একদিন পকেট হইতে এক চাবি বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি ঐ সৌরজগতে, ঐ নক্ষত্র রাজ্যে, ঐ নীহারিকাপুঞ্জে প্রবেশ করিতে চাহ, তবে এই লও তার চাবি; এই চাবি ঘুরাইলে যে কোন রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার বিনা ক্লেশেই উন্মোচিত হইয়া যাইবে।"

ফ্যারাডের সময়ে পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, ঘর্ষণোৎপন্ন তাড়িত আর

ব্যাটারি হইতে উৎপন্ন তাড়িত বুঝি ভিন্ন প্রকৃতির। একটার উৎপত্তি ঘর্ষণ হইতে, আর একটার উৎপত্তি রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে—দুইটা বুঝি দুই রকমের তাড়িত। ফ্যারাডের উদার হৃদয়ে এ বিশ্বাস স্থান পাইল না। ফ্যারাডে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিলেন, উৎপত্তি স্থল ভিন্ন হইলেও তাড়িত দুইটাই এক জাতীয়। একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন, ঘর্ষণোৎপন্ন তাড়িত যেমন স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে, যেরূপ স্নায়বিক কম্পন উৎপন্ন করে, ব্যাটারি-সম্ভূত তাড়িতও ঠিক তাহাই করিয়া থাকে। আবার ব্যাটারির তাড়িত দ্বারা যেরূপ তাপ উৎপন্ন করা যায়, যেরূপ জল বিশ্লেষিত করিতে পারা যায়, যেরূপ লৌহকে চুম্বকে পরিণত করিতে পারা যায়, ঘর্ষণোৎপন্ন তাড়িত দ্বারাও ঠিক তাহাই করিতে পারা যায়। একটার যে ক্রিয়া, অন্যটার ক্রিয়াও তাহাই, পার্থক্য পরিমাণে, ধরণে নহে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইল, দুই তাড়িতই একই জাতীয়।

৭। তারপর আর এক তথ্যের আবিষ্কার। ফ্যারাডে তরল ও কঠিন পদার্থের মধ্যে তাড়িত সঞ্চালিত করিয়া দেখাইলেন যে, কঠিন ও তরল পদার্থে তাড়িত সঞ্চালিত হইবার প্রক্রিয়ায় প্রভেদ আছে। এক খণ্ড বরফের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার যোগ করিয়া দেখাইলেন যে, কঠিন বরফের ভিতর তাড়িত প্রবাহিত হয় না; কিন্তু কঠিন বরফ তরল জলে পরিণত হইলে তাড়িত প্রবাহিত হইয়া থাকে। আরও দেখাইলেন, যখন জলের ভিতর তাড়িত প্রবাহিত হয়, তখন জল বিশ্লেষিত হইয়া পড়ে ও জলের মূল উপাদান উদজান ও অম্লজান উৎপন্ন হইতে থাকে। অন্যান্য পদার্থ লইয়া তাহাদের কঠিন অবস্থার সহিত তাহাদের তরল অবস্থার তুলনা করিয়া দেখাইলেন। সাব্যস্ত হইল "কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়া তাড়িত সঞ্চালিত হইবার কালে উহার বিশ্লেষণ সংঘটিত হয় না; কিন্তু তরল পদার্থকে বিশ্লেষিত না করিয়া উহার ভিতর দিয়া তাড়িত সঞ্চালিত হইবার যো নাই। তাড়িৎ-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তরল পদার্থকে বিশ্লেষিত হইতে হইবেই। তরল পদার্থের বিশ্লেষণ ক্রিয়ার দ্বারাই প্রবাহ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। এই ব্যাপারের নাম হইল Electrolysis। এই Electrolysis ব্যাপার হইতে দেখা গেল যে, এক একটা জড় পরমাণুর সহিত তাড়িতের এমন একটা গোটা অংশ গ্রথিত হইয়া আছে, যার ছোট হয়ত আর স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া প্রবাহ উৎপন্ন করিতে পারে না। ইহাই হইল, তাড়িতের পরমাণু। অধুনাতন

কালে ইহার নাম হইয়াছে ইলেক্‌ট্রন্‌। এই সকল পরীক্ষার ফল ফ্যারাডের "Experimental Researches" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষা এখন বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর অজাতশ্মশ্রু বালকেও বিনা ক্লেশে সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু ফ্যারাডেকে তখন তাঁহার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল। যিনি স্কুলের বিদ্যায় আমাদের দেশের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকেরও নিম্নতর ছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার আবিষ্কৃত বিষয় সমূহের নামকরণ করিতে হইয়াছিল—নতুবা বুঝাইবার উপায় কি? কিন্তু সেই যে নামকরণ হইয়াছিল অদ্যাপি উহার অপেক্ষা সঙ্কেতপূর্ণ নাম কাহারও কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হয় নাই—সেই Electrolysis, সেই Anion, সেই Cation, এখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখে ধ্বনিত হইয়া থাকে।

শুধু ইহাই নয়, কতখানি তাড়িত প্রবাহিত হইলে, কোন্‌ তরল পদার্থের কি পরিমাণে বিশ্লেষণ সংঘটিত হইবে, পরীক্ষা দ্বারা তিনি তাহারও নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। যদি একটা পয়সাকে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের ভাগ পুরু করিয়া স্বর্ণপাতে মণ্ডিত করিতে হয়, তবে উহাকে সোণার জলের মধ্যে রাখিয়া ঐ জলের ভিতর একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাটারি হইতে কত মিনিট ধরিয়া তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত করিবার আবশ্যক হইবে, এ সকল প্রশ্নের উত্তর ফ্যারাডের আবিষ্কৃত নিয়মে আঁক কষিয়া বিদ্যালয়ের বালক মাত্রেই এক নিঃশ্বাসে বলিয়া দিবে।

অধুনাতন কালে কারখানায় কারখানায় Storage ব্যাটারি ব্যবহৃত হইতেছে, দোকানে দোকানে Electro-gilding, Electro-silvering, Electro-coppering, Electro-typing প্রক্রিয়া চলিতেছে, কিন্তু ইহার সকলের মূলে ফ্যারাডে আবিষ্কৃত এই Electrolysis.

৮। এখন প্রবহমান তাড়িত ছাড়িয়া স্থির তাড়িতের দিকে (Statical Electricity) ফ্যারাডের ঝোঁক গেল। চলিত ভাষায় কতকগুলি পদার্থকে তাড়িত পরিচালক বলে। কেননা, ইহাদের ভিতর দিয়া তাড়িত অক্লেশে চলিয়া যায়—যেমন তামা, লোহা ইত্যাদি ধাতুনির্ম্মিত জিনিস; আর কতকগুলি পদার্থকে তাড়িত অপরিচালক বলে—কেননা, চলিত ভাষা হইতেছে যে, ইহাদের ভিতর দিয়া তাড়িত বহিতে পারে না—যেমন বায়ু, কাঁচ, রেশম, গন্ধক, গালা ইত্যাদি।

রেশমের রুমালে কাঁচের নল ঘষিলে দুইই তাড়িত-বিশিষ্ট হয়। এই

উভয় তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং পরস্পরে মিশিতে চাহে। ঘর্ষণের পর যদি রুমালটা ও নলটা পরস্পর হইতে দূরে দূরে সরান যায়, তবে এই আকর্ষণের বিরুদ্ধে খানিকটা কার্য্য করিতে হয়। রুমালের তাড়িত রুমালকে লইয়া নলের তাড়িতের সঙ্গে এবং নলের তাড়িত নলকে লইয়া রুমালের তাড়িতের সঙ্গে মিশিতে চাহে; জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলে নলটাও রুমালটার সহিত মিশিতে পারে না এবং মাঝখানকার বায়ু তাড়িত অপরিচালক বলিয়া রুমালের তাড়িতও নলের তাড়িতের সঙ্গে মিশিতে পারে না। এই গেল সোজা কথা।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, যে হেতু শক্তির ধ্বংস নাই এবং যে হেতু ঘর্ষিত নলটা হইতে ঘর্ষিত রুমালটা ছাড়াইয়া লইতে শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছে—অতএব, এই ব্যয়িত শক্তির বসতি স্থান কোথায় এবং রুমালটা ও নলটা যে পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, সে আকর্ষণটাই বা কি প্রণালীতে সংঘটিত হইতেছে? রুমালটার ও নলটার মাঝখানে যে বায়ু বা ঈথর আছে, এই তাড়িতাকর্ষণ ব্যাপারে উহাদের কোন ক্রিয়া আছে কি নাই? কেবল কি দুই তাড়িতের মিশিবার পক্ষে বাধা জন্মানই উহাদের কার্য্য, না তদ্ভিন্ন উহাদের আরও বিশেষ কিছু কার্য্য আছে?

ফ্যারাডে এখন যে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। দুইটা তাড়িত-যুক্ত পদার্থ বা দুইটা চুম্বক শুধু দূর হইতেই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে পারিবে—দড়ি দিয়া বাঁধা নাই, কোন প্রকারের সংস্পর্শ নাই, কেবল দূর হইতে একটা আর একটাকে টানিয়া আনিবে, এই ধারণা ফ্যারাডের মনে কিছুতেই স্থান পাইতেছিল না।

ফ্যারাডের বিশ্বাস, এই টানাটানি ব্যাপারে একটা মধ্যস্থের আবশ্যক। ফ্যারাডের দৃঢ় বিশ্বাস, এই টানাটানি ব্যাপারে,—এই সংযোগ বিধান ব্যাপারে,—ভিতরকার মিডিয়ামটাই ঘটক—এই ভিতরকার মিডিয়ামটাই হইতেছে, সঞ্চিত তাড়িত শক্তির আধার। ফ্যারাডে পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন বস্তুতঃ তাহাই। ফ্যারাডে তর্ক করিলেন, "যদি টানাটানি ব্যাপারে ভিতরকার মিডিয়ামের কোন ক্রিয়া না থাকে, তবে টানাটা কেবল সরল রেখা ক্রমে হওয়াই সম্ভব; আর যদি এই ব্যাপারটা ভিতরকার মিডিয়াম দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেরূপ চুম্বককে বেড়িয়া চুম্বক রেখা সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেইরূপ তাড়িত-বিশিষ্ট পদার্থ দুটীকে ঘিরিয়াও

বিদ্যুৎ-রেখা সকল নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে। এবং এই বিদ্যুৎরেখা সকল বক্র হওয়াই সম্ভব। ফ্যারাডে পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন, বস্তুতঃ তাহাই বটে। ফ্যারাডে একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। একটা ধাতু নির্ম্মিত বল 'ক' আর একটা অন্তঃশূন্য বৃহত্তর বল 'খ' এর ভিতর রাখিলেন। দুইটা বলের মাঝখানে থাকিল বায়ু। আরও দুইটা বল 'গ' ও 'ঘ' দিয়া ঠিক অনুরূপ আর একটা যন্ত্র তৈয়ার করিলেন। কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' এর মাঝখানে থাকিল গালা। তারপর 'ক' 'খ' যন্ত্রের 'ক' বলটাকে তাড়িত-বিশিষ্ট করিয়া এবং পরে 'ক' এর সহিত 'গ' সংযুক্ত করিয়া দিয়া সেই তাড়িতটা দুইটা যন্ত্রে ভাগাভাগি করিয়া দিলেন। ফ্যারাডে দেখিলেন, 'ক' 'খ' যন্ত্রে যে পরিমাণ তাড়িত থাকিল, 'গ' 'ঘ' যন্ত্রে গেল তার চেয়ে বেশী। ফ্যারাডে দেখিলেন, যদি দুইটা যন্ত্রের ভিতরেই বায়ু থাকে, অথবা যদি দুইটার ভিতরেই গালা থাকে, তবে তাড়িতটা এক যন্ত্রে সমান সমান অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু একটার মধ্যে বায়ু, একটার মধ্যে গালা থাকিলে, যেটায় গালা থাকে, সেইটায় তাড়িতের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া পড়ে। সাব্যস্ত হইল 'গ' 'ঘ' যন্ত্রের গালার ভিতর দিয়া 'গ'এর তাড়িত 'ঘ'এর উপর যতখানি বল প্রয়োগ করে, 'ক' 'খ' যন্ত্রের বায়ুর ভিতর দিয়া 'ক'এর তাড়িত 'খ'এর উপর তাহা হইতে ভিন্ন পরিমাণ প্রয়োগ করে। অর্থাৎ দুইটা তাড়িত বিশিষ্ট পদার্থ 'ক' ও 'খ' কিম্বা 'গ' ও 'ঘ'এর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা নির্ভর করিতেছে 'ক' ও 'খ' এর মধ্যস্থ কিম্বা 'গ' ও 'ঘ'এর মধ্যস্থ মিডিয়ামের উপর।

২। তারপর ফ্যারাডের আর একটি মস্ত আবিষ্কার চুম্বক কর্ত্তৃক আলোক কম্পনের দিক পরিবর্ত্তন।

ফ্যারাডে দুইখানা চুম্বক জাতীয় পাথর 'ক' ও 'খ'কে আড়াআড়ি ভাবে রাখিলেন। চুম্বক দুইখানার একপাশে রাখিলেন একটা ল্যাম্প— একটা আলোকের আধার আলোক তরঙ্গের উৎপত্তি স্থল। আলোক ল্যাম্প 'ল' হইতে চলিয়া 'ক'এর উপর পড়িল অর্থাৎ ঈথর বহিয়া 'ল' 'ক' রেখাক্রমে সারি দিয়া চলিল, কতকগুলি তরঙ্গ বা কম্পন গতি— উর্দ্ধাধঃ কম্পন, পাশাপাশি কম্পন এবং 'ল' 'ক' রেখার আড়ভাবে আর যত কম্পন ঘটিতে পারে, সব দিককার কম্পনগুলি।

আলোক 'ক'এর ভিতর চলিয়া গেল, কিন্তু 'ক' হইতে বাহির হইতে

পারিল, কেবল উহার একটা অংশ—'ক' হইতে বাহির হইতে পারিল শুধু একটা নির্দ্দিষ্ট দিকের কম্পন গতি। 'ক-খ' রেখা ক্রমে আলোক 'খ'এর উপর পড়িল, কিন্তু 'খ' হইতে আর বাহির হইতে পারিল না; যে নির্দ্দিষ্ট কম্পন-গতি 'ক'এর ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা 'খ'এ আসিয়া আটকা পড়িয়া গেল, কেন না, ঐ কম্পনটা 'খ'এর উপর আড়াআড়ি ভাবে আসিয়া পড়িল। কাজেই 'খ'এর অপর পার্শ্ব হইতে দেখা গেল কেবল অন্ধকার। ফ্যারাডে 'ক' ও 'খ'এর মধ্যে রাখিলেন তার জড়ান একখণ্ড লৌহ—অশ্বনালাকৃত একখণ্ড লৌহ। উহার দুই প্রান্তের উপর 'ক' ও 'খ' রেখাক্রমে সংস্থাপিত করিলেন, তাহারই বহু পরিশ্রমের ফল একটা স্বচ্ছ কাঁচ দণ্ড। চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন আঁধার। ব্যাটারি হইতে তার জড়ান লৌহ খণ্ডের চারিদিকে তাড়িত সঞ্চালিত করিলেন; লৌহখণ্ড চুম্বকে পরিণত হইল চুম্বক-রেখায় উহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। আবার চাহিয়া দেখিতেই দেখিলেন আলোক। সাব্যস্ত হইল চুম্বক-রেখাগুলিকে বেড়িয়া ঈথরের মধ্যে এক রকম আবর্ত্তন চলিতেছে, এবং এই আবর্ত্তনের ফলে 'ক' হইতে নির্গত আলোকের কম্পন-দিক ঘুরিয়া গিয়াছে। এই আলোক কম্পনের দিক এবার আর 'খ'এর আড়াআড়ি নয় —এবার খানিকটা আলোক 'খ' এর ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিয়াছে।

এই আবিষ্কারে প্রমাণিত হইল যে, চৌম্বক শক্তির সহিত সাধারণ আলোকের এমন একটা সম্বন্ধ আছে, যদ্দ্বারা একটা আর একটার উপর ক্রিয়া করিতে পারে।

১০। তারপর ফ্যারাডের আর একটা মস্ত আবিষ্কার। লোকে জানিত চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে—আর বড় জোর আকর্ষণ করে নিকেল ও কোবল্ট। ফ্যারাডের মনে হইতে লাগিল, যদি লৌহের উপর চুম্বকের এত প্রবল প্রতাপ, যদি নিকেল ও কোবল্টের উপরেও চুম্বক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে সোণা, রূপা, তামা, দস্তাই বা কেন একেবারে সে প্রতাপ অবহেলা করিতে পারিবে? চুম্বকের ক্রিয়া সকলের উপরই আছে, কিন্তু সামান্য বলিয়া আমরা ধরিতে পারি না। চুম্বকের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে পারিলে, সকল পদার্থের উপরই উহার ক্রিয়া লক্ষিত হইবে। ফ্যারাডে চুম্বকের ক্ষমতা বাড়াইলেন; সকল পদার্থের উপরই চুম্বকের প্রভাব পরিলক্ষিত হইল। একটা অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনা লক্ষিত হইল

এই যে, কোন কোন জিনিস চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন কোন জিনিসের উপর আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ হইয়া থাকে। কোন কোন জিনিস চুম্বকের দুই ধ্রুবের মধ্যে লম্বালম্বি ভাবে থাকিতে চাহে, কোন কোন জিনিস চুম্বকের ধ্রুবদ্বয়ের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে থাকিতে চাহে। কিন্তু ক্রিয়া সকলের উপরই আছে।

কি ধাতু, কি অধাতু, কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয় পদার্থ—ফ্যারাডে একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, চুম্বকের ক্রিয়া সকলের উপরই বিদ্যমান।

এমন কি, একটা বাতির আলোকের উপরও ক্রিয়া আছে—বাতির আলোকটাও চুম্বকের ধ্রুবদ্বয়ের মধ্যে আড়াআড়ি হইয়া থাকিতে চাহে। প্রমাণিত হইল লৌহ, নিকেল, কোবল্ট, প্লাটিনম, ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বিস্মথ, আন্টিমনি, সীসা, তামা, জল, কাঁচ ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

ফ্যারাডে মানুষের অস্থি, চর্ম্ম, শোণিত লইয়া পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন যে, যে উপাদানে মনুষ্য শরীর নির্ম্মিত, উহারা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্যারাডে বলিলেন, "যদি বক্র একটা প্রকাণ্ড লৌহের দুইপ্রান্ত মধ্যে একজন মানুষকে ঝুলাইয়া রাখা যায়, তবে যেই ঐ লৌহখণ্ডের চারিদিকে তাড়িত সঞ্চালিত করা যাইবে, অমনি ঐ মানুষটাকে দুলিয়া ঐ প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে সংস্থিত হইতে হইবে।"

৩। ফ্যারাডে-চরিত্র।

ফ্যারাডে চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব—জ্ঞান লাভের জন্য তাহার অদম্য স্পৃহা। এই জ্ঞান-স্পৃহা তাঁহাকে প্রথম জীবনে ডেভির নিকট পত্র লিখিতে সাহসী করিয়াছিল। এই জ্ঞান-স্পৃহা ছিল বলিয়া দুঃখ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা অবমাননার সহিত সংগ্রামে তিনি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদেশ ভ্রমণ কালে, তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে ডেভির কেরাণী ভাবে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে ডেভির ভৃত্যের কার্য্য করিতে হইয়াছিল। যাত্রাকালে ডেভির ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে বিদেশে যাইতে অসম্মত হইল। ডেভি ফ্যারাডেকে বলিলেন, "সম্প্রতি চাকরের কাজটা তুমিই চালাইয়া লও, পেরিসে গিয়া আমি চাকর দেখিয়া লইব।" ফ্যারাডে সম্মত হইলেন, জ্ঞান লাভের আশায় সম্মত হইলেন। পেরিস্ গেল, লিয়নস্ গেল,

জেনেবা গেল, ফ্লোরেন্স গেল, সমস্ত ইটালি ভরিয়া ভৃত্য মিলিল না। ফ্যারাডে বুঝিলেন, ডেভির চাকর পাইবার ইচ্ছাই নাই। ফ্যারাডে সহিলেন জ্ঞান লাভের আশায় সহিলেন। সেই যে শৈশবের লক্ষ্য, "অর্থ চাই না, সম্মান চাই না, পৃথিবীর সুখ-সম্পদ কিছুই নয়, বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অতি সামান্য কার্য্যও আমার নিকট শ্লাঘনীয়"—এক দিনের জন্য ফ্যারাডে সে লক্ষ্য পরিত্যাগ করেন নাই। অর্থ আসিয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। সেই যে রয়াল-ইনষ্টিটিউসনে প্রবেশ করিলেন, জীবনে আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এদিকে ইনষ্টিটিউসনের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল, এদিকে ফ্যারাডের আবিষ্কার পরম্পরায় জগৎ চমকিত। কমিটি বসিল—ফ্যারাডের মাহিয়ানা বাড়াইবার কোন উপায় আছে কি না। কমিটির মেম্বরগণ হিসাব পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া শুনিয়া দুঃখিত চিত্তে ফিরিয়া গেলেন—কোন উপায় নাই। কত ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কত সম্মানের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ-পত্র আসিল। অর্থ ও সম্মানের লোভে ফ্যারাডে রয়াল ইনষ্টিটিউসন পরিত্যাগ করেন নাই। প্রত্যহ প্রাতে, ফ্যারাডে স্কুলের বালকের ন্যায় লেবরেটারি গৃহে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। প্রতি রাত্রে, পরদিন কি কি পরীক্ষা করিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিতেন; প্রত্যহ প্রাতে, পরীক্ষা দ্বারা চিন্তার বিষয় সমূহ সত্য কি মিথ্যা, তাহা নির্দ্ধারিত করিতেন—সত্য হইলে গ্রহণ করিতেন, মিথ্যা হইলে পরিত্যাগ করিতেন। ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, শান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বৎসরের পর বৎসর ফ্যারাডে অক্ষুণ্ণ বেগে কর্ত্তব্য পথে প্রধাবিত হইয়াছেন। আধখানটা দেখিয়া, আধখানটা বুঝিয়া ফ্যারাডে কখনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। দেখিব ত সবটাই দেখিব, বুঝিব ত সবটাই বুঝিব, এই ছিল তাঁহার প্রতিজ্ঞা। আর, সে দেখিবার ক্ষমতাই বা কত, সে বুঝিবার ক্ষমতাই বা কত! কি ভয়ঙ্কর সে মানসিক বল, কি অন্তর্ভেদী সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি! যে রাজ্যে পঁহুছিতে নয়ন অন্ধকারাবৃত হইয়া আসে, পদ বিকম্পিত হয়, চিত্ত বিকল হইয়া পড়ে, সেই জ্ঞান ও অজ্ঞানের সীমারেখা, সেই আঁধার ও আলোকের সম্মিলন স্থলই ছিল ফ্যারাডের রঙ্গভূমি। সেই রঙ্গভূমির "বধির যবনিকা" উত্তোলন করিয়া ফ্যারাডে দেখাইয়াছেন, পরে দৃশ্যপট কত সুন্দর!

দৃশ্যপটের পর দৃশ্যপট উন্মোচিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এ সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। যেখানে আর পাঁচজনে দেখিত শূন্য আর শূন্য, সেখানে ফ্যারাডে দেখিতেন, বল রেখা আর বল রেখা। ঐ বিদ্যুৎ-রেখা সকল চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ঐ আবার তাহারা একদিকে হেলিয়া পড়িল, ঐ যে তাহারা আকাশ বহিয়া নক্ষত্ররাজ্যে চলিয়া গেল, ঐ আবার তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া কোঠার ভিতর সব ঢুকিয়া পড়িল, ঐ চুম্বক রেখার সৃষ্টি হইল, ঐ রেখা বেড়িয়া আবর্ত্তন আরম্ভ হইল, ঐ আবর্ত্তন-গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিল, ঐ আবার রেখাগুলি লুপ্ত হইয়া গেল। এই ব্রহ্মাণ্ডটা একটা Leyden Jar এই পৃথিবী তাহার মধ্যাবরণ, ঐ নক্ষত্র-জগৎ তাহার বহিরাবরণ, ঐ বলরেখাগুলি উহাদের যোগ সাধন করিতেছে। এইরূপ ছিল ফ্যারাডের চিন্তাপ্রণালী।

ঐ তাড়িত বহিল, ঐ কাঁটা দুলিল, কই, বেশী ত দুলিল না। আরও কৌশল চাই, আরও শক্তি চাই। আরও কৌশল আসিল, আরও শক্তি আসিল, আরও কাঁটা দুলিল; এইরূপ ছিল ফ্যারাডের পরীক্ষা-প্রণালী।

একমাত্র আনন্দ বিজ্ঞান-চর্চ্চায়। ক্রমে নৃত্যাতে যোগদান পরিত্যাগ করিলেন, সমাজের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করিলেন, শেষে বাড়ীতে আসিলেও নিয়মিত সময় ভিন্ন লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন। একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—কর্ত্তব্যকার্য্যে কেহ বিঘ্ন উৎপাদন না করে। বিজ্ঞানের জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিকসমাজ তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মানুষের নিকট যতখানি সম্মান প্রাপ্য, ফ্যারাডে তাহা পাইয়াছিলেন। স্বয়ং রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার বাসের জন্য হ্যাম্পটন কোর্টে সুন্দর গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মাইকেলের পেনসনের জন্য, মাইকেলকে নাইট্ পদে বরিত করিবার জন্য দেশশুদ্ধ লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। মাইকেলকে কে না ভালবাসিত?

রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসনে ফ্যারাডের বক্তৃতা শুনিবার জন্য দলে দলে লোকে আসিয়াছে—বরাবরই আসিত। আজ ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতে উঠিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। শরীর অসুস্থ ছিল, কথা বাহির হইল না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন। লোক-সমুদ্র মন্থন করিয়া উচ্চ কোলাহল উত্থিত হইল "আপনি বসুন।" এতগুলি ভদ্রলোক ব্যর্থ-মনোরথে ফিরিয়া যাইবেন ভাবিয়া ফ্যারাডে পুনরায় উঠিলেন, ধীরে ধীরে

বলিলেন "আপনারা কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, পুনরায় আপনাদের গাড়ী আসিতে কত বিলম্ব হইবে ; আমি একটু চেষ্টা করিলেই কৃতকার্য্য হইব।" কিন্তু ক্রমেই কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল "না, না, আমাদের বক্তৃতা শ্রবণ অপেক্ষা, আপনার মূল্য অনেক বেশী, আমরা বক্তৃতা শুনিব না।" বেচারী সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া পড়িলেন। দেশ বিদেশ হইতে ভক্তি কৃতজ্ঞতা ও গুণগ্রাহিতার চিহ্ন-স্বরূপ, কত ডিপ্লোমা, কত স্বর্ণপদক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্ণপদকগুলি অপহৃত হইবার ভয়ে ফ্যারাডে তাহা বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই যে রাখিয়াছিলেন, আর তাহা খুলিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার জীবনে কখনও ঘটে নাই।

১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে স্বীয় পাঠাগারে ধীরে ধীরে ফ্যারেডে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। সেই দিন বিজ্ঞানাকাশ হইতে যে জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল, তাহার স্থান আজিও পূর্ণ হয় নাই, কখনও হইবে কি ?

দেশীয় কল।

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্-এ, লিখিত।

বিদ্বৎ-সমাগমে বহুবিদ্যার প্রসঙ্গ উঠিবে। কিন্তু সরস্বতী কেবল বিদ্যার নহেন, কলারও অধিষ্ঠাত্রী।

বিশেষতঃ কলারও সাহিত্য আছে এবং সাহিত্য-পরিষদে কলার সাহিত্যও সাহিত্য গণ্য হইতে পারে।

কিন্তু যখনই দেশের কলার সাহিত্য অনুসন্ধান করি, তখন সে অনুসন্ধান শূন্যে মিশাইয়া যায়। গীত বাদ্য নৃত্য— এই ত্রিবিধ কলা মিশিয়া সঙ্গীত। সঙ্গীত কলা নাকি অমর। এই কলা ব্যতীত অন্য কলার সাহিত্য বঙ্গভাষায় নাই।

অনেকে বিদ্যা ও কলার প্রভেদ লোপ করিতে চান। শুক্রাচার্য্য*

---

* যদ্‌যৎস্যাদ্‌বাচিকং সম্যক্‌কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকং।
শক্তো মূকোপি যৎকর্ত্তুং কলাসংজ্ঞং তু তৎস্মৃতং॥

যে যে কর্ম্ম বাচিক, তাহার নাম বিদ্যা। যাহা মূক ব্যক্তিও করিতে পারে, তাহার নাম কলা। বিদ্যা অনন্ত, কলা অনন্ত। তন্মধ্যে মুখ্য বিদ্যা অষ্টাদশ, মুখ্য কলা চতুঃষষ্টি। কলার দৃষ্টান্ত,— বস্ত্র-অলঙ্কার সন্ধান, মদাকরণ, বৃক্ষাদিপালন, কাচকরণ, অস্ত্রশস্ত্র-নির্ম্মাণ, ইত্যাদি।

এই দুইএর প্রভেদ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা কলা-বিদ্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়া সোনার পাথর-বাটী, ও কাঁঠালের আম-সত্ব স্মরণ করাইয়া দেন। বিদ্যার প্রতি বিদ্বানের ভক্তি স্বাভাবিক; কিন্তু তা বলিয়া কলা ও বিদ্যার প্রভেদ না রাখিলে বরোদার কলা-ভবন বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হয়।

কলা-বিদ্যা নাই, এমন নহে। কলার বিদ্যা—ইংরেজীতে science of arts and industries, এক কথায় technology। কিন্তু কে না জানে কালেজে কালেজে science শেখান হইতেছে! অথচ কারু হইতেছে না বলিয়া কলিকাতায় Technical Institute প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়াছে।

এই technical শব্দই দেখুন। ইহার মূল সংস্কৃত তক্ষন্—সূত্রধার—দেখা যাইতেছে। সূত্র-শস্ত্র-প্রয়োগ-বিমুখ সূত্রধার কিছুই গড়িতে পারে না। বিদ্যালয়ের Text-bookএ সূত্র আছে, শস্ত্র নাই। সূত্র ও শস্ত্র উভয়ের প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়া তক্ষশালার উদ্দেশ্য।

তবে যাবতীয় কলা স্থূলতঃ দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। ললিত-কলা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তক্ষ-কলা জীবন ধারণের উপায় চিন্তা করে। দেখা যায় দেশে ললিত-কলাবৎ সরস্বতীর পূজক, তক্ষকলাজীবী বিশ্বকর্মা, দেবতার তক্ষা ছিলেন। এমন তক্ষা, যিনি মার্তণ্ডের দেহ চাঁচিয়া তেজ খর্ব করিয়াছিলেন।

যন্ত্র ব্যতীত কলা সাধিত হয় না। চিত্রকলাবতের যন্ত্র তূলী, বাদ্যকরের যন্ত্র বাদ্যযন্ত্র, সূত্রধারের যন্ত্র শস্ত্র। কলার—অঙ্গবিশেষের সমবায়ে দ্রব্য করণের—উপায়ের নাম কল; সংক্ষেপে, কলার সাধন বলিয়া কল। ইংরেজী instrument বাঙ্গালা যন্ত্র, ইংরেজী machine বাঙ্গালা কল। শাবল দিয়া গর্ত্ত করিতে পারা যায়; শাবল যন্ত্র। কিন্তু ঢেঁকী ও চরকা কল বলা যায়। বাঙ্গালায়, যন্ত্র সামান্য সাধন, কল অঙ্গ-সমন্বিত বিশেষ সাধন।

সাহিত্য-সম্মিলনে ঢেঁকী ও চরকা দেখিয়া চমকিত হইবেন না। যেদিন উদুখল হইতে ঢেঁকীর উদ্ভাবন হইয়াছে, সে দিন দেশের উৎসবের দিন গিয়াছে। এখনও এই ভারতখণ্ডে উখলীর স্থানে ঢেঁকী সর্বত্র বসে নাই।

ঢেঁকী সামান্য কল বটে, কিন্তু উদ্ভাবনে বহুকাল লাগিয়াছে। যন্ত্র-বিদ্যার ভাষায় ঢেঁকী একটা দণ্ড। একটা বহু প্রচলিত, দেশের নানা ভাষায় প্রচলিত, শব্দ প্রয়োগ করিলে ঢেঁকী একটা লাদনা (lever), অক্ষশালা উহার

কীলী (fulcrum)। দুই বাহুর অনুপাত ১:৩। এই যে ১:৩ অনুপাত, ইহাই সুবিধাজনক। উখলীতে হাতের জোরে ধান ভানা হয়, ঢেঁকীতে মানুষের দেহের ভারে হয়। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৌশল হইতে পারে না। বস্তুতঃ ঢেঁকীর তুল্য সহজসাধ্য অথচ কার্যক্ষম (efficient) যন্ত্র বিরল।

এই ঢেঁকীর তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া পশ্চিমে লাঠা (বড় লাঠী) দিয়া কূপাদি হইতে জল তোলা হয়। উচ্চস্থ কীলীতে লাদনা খেলিতে থাকে। উহার হ্রস্ব বাহুর প্রান্তে দোণ (সং দ্রোণ), কিংবা কুঁড়ী (সং কুণ্ড) ঝুলিতে থাকে। দোণ পায়ের টেপায় নামে, বীপরীত বাহুর ভারে উঠে। এই হেতু দোণে প্রচুর জল উঠে। কুঁড়ী হেতের জোরে নামাইতে হয়। কাজেই কার্যক্ষমতাও অল্প। ঢেঁকীর অনুকরণে উৎপত্তি বলিয়া লাঠাকে ঢেঁকলীও বলে।

দেহের ভারে কাজ করিবার দেশীয় দৃষ্টান্ত মাদ্রাজের পাইকোটা। ইহাও জলতোলা কল। একটা লম্বা ঢেঁকী বলা যাইতে পারে। উচ্চে কীলীতে অবস্থিত বাঁশের উপর দিয়া মানুষ এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের দুই অগ্রে বদ্ধ দোণ কিংবা কুঁড়ীতে পরে পরে জল উঠে। এই কল চালাইতে দেখিলে ভয় হয়; মনে হয় মানুষ উচ্চ হইতে পড়িয়া যাইবে। কিন্তু কলের কার্যক্ষমতায় অবাক্ হইতে হয়।

ঢেঁকী সামান্য কল, চরকা সেরূপ নহে। প্রথমে তাকুড় (সং তকুটী), তারপর চরকা। কিন্তু তাকুড় হইতে চরকা বহু দূরবর্তী। যেদিন কর্তন-চক্র ঘর্ঘর-শব্দে প্রথম ঘুরিয়াছিল, সেদিন ভারতবর্ষে আনন্দের রোল উঠিয়াছিল। প্রচুর ধান্য না পাইলে ঢেঁকী আসিত না, প্রচুর কার্পাস না জন্মিলে চরকা হইত না। সেত অর্থনীতির কথা। যন্ত্র-বিদ্যায়, একাধারে এত যন্ত্রের সুন্দর সমাবেশ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইংরেজী শব্দে চরকার অঙ্গের নাম করিতে হইলে ইহাতে pulley and bearing ত আছেই, crank and pin, combined driving pulley and flywheel ইত্যাদি আছে। ধন্য সেই প্রাচীন শিল্পী, যিনি এরূপ লঘু অথচ কার্যক্ষম যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। আধুনিক বিলাতী কর্তনকল চরকার যত অনুকরণ করিতেছে, তাহাতে ততই সূক্ষ্ম সূত্র হইতেছে।

সে কালের কোন্ কল উৎকৃষ্ট না ছিল? কুম্ভকার যখন ভারী চাকায় নিজের শক্তি চালনা করিয়া সে শক্তিতে অল্পে অল্পে মৃৎমূর্তি নির্মাণ করে, তখন বিস্ময়ে কে না তাহাকে ধন্য বলে। আশ্চর্য এই কুলালচক্র এদেশে

যেমন আছে, প্রাচীন মিশরেও তেমন ছিল। সুধু কুলালচক্র নহে, মিশরে ঢেঁকলীও অদ্যাপি বহু প্রচলিত আছে।

গ্রাম্য কলায় তন্ত্র ও তৈলযন্ত্র অসাধারণ। দেশের তাঁতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিলে শিল্পীর প্রশংসা করিতে হয়। পায়ের চাপে ও হাতের টানে ও ঠেলায় যে কি সূক্ষ্ম শিল্প প্রকাশ হয়, তাহা আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি বলিয়া তাহার গৌরব বুঝিনা। সানা বাঁধা, ব-তোলায় নৈপুণ্য অল্প লাগে না। অথচ সমুদয় অঙ্গযুক্ত একটা তাঁতের দাম দশটাকা মাত্র। কোন্ কাল হইতে যে তাঁত চলিতেছে, তাহা কে জানে। বিবর্ত্তনে কি আকার হইতে যে তাঁত বর্ত্তমান আকার পাইয়াছে, তাহাও জানিনা। কত শিল্পী কত দিন কত বৎসর একের পর এক করিয়া অঙ্গ জুড়িয়া তাঁতের বর্ত্তমান আকারে আনিয়াছেন, কত অসুবিধা ভোগ করিয়া কত পরীক্ষা ও কত বৈফল্যের পর এই আকার আনিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতেও মাথা ঘুরিয়া যায়।

তৈলযন্ত্র স্থূল বটে, কিন্তু একটা মুষল আবর্ত্তন করিতে করিতে যে প্রদক্ষিণ করিতে পারে, তাহা ঘনা বা ঘানী না দেখিলে সহজে বুদ্ধিতে আসে না। সাঁওতালেরা দুই খান সোজা কাঠের মধ্যে থলিয়াতে বীজ রাখিয়া চাপিয়া ধরে, বীজ পিষ্ট হইলে তৈল নির্গত হয়। কিন্তু ইহাকে ঘনার পূর্ব্বরূপ বলিতে পারা যায় না। মুনি ঋষি হৈয়ঙ্গবীন ও ইঙ্গুদী ফলে তৃপ্ত হইতেন, কিন্তু দেশের লোকের নিমিত্ত নিশ্চয় তৈলযন্ত্র ছিল।

আরও দেখি, মানুষের শক্তি সব কাজে কুলায় না। ঘনা বড়, ঘানী ছোট। ঘানীতে একটা গোরু, ঘানাতে দুইটা গোরু ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

গোরুর শক্তি লাঙ্গল ও গাড়ী টানায় ও ভার বহায় লাগাইতেছি। লাঙ্গল-টানায় গোরুর কেবল টানিবার শক্তি লাগে না। দেহের ভারও লাগে। গাড়ী টানাতেও তাই। এই কারণে মোটা ভারী গোরু বেশী লাঙ্গল টানে। গাড়ীতে দেখি, সমান ভূমিতে ভারী দ্রব্য গড়াইয়া লইতে অল্প শক্তি লাগে।

বঙ্গদেশে গভীর কূপ হইতে জল তোলা আবশ্যক হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে জমিতে জল-সেচনও আবশ্যক হয় না। কিন্তু বঙ্গ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র কূপই গতি। ভারতের এক-তৃতীয়াংশ কৃষি এক কূপজলে চলিতেছে। পশ্চিমে মোটের দোড়ী কপি-চাকার উপর দিয়া গোরু টানিয়া জল তুলিতেছে। দেহের ভারে কাজ করিবার এই এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। পাঞ্জাবে রহট্ (সং অরহট্ট) কোন্ কাল হইতে চলিত আছে, কে জানে। শঙ্করাচার্য ও ভাস্করা-

চার্য্য ঘটীযন্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কি কারণে জানি না, অরঘট্টের নাম Persian wheel হইয়াছে। চাকার উপর দিয়া ঘট-মালা চালাইয়া জল তোলায় শক্তি যে অল্প লাগে, তাহা রহট দেখাইয়া দিতেছে। অরঘট্ট নামে প্রকাশ যে অরা (Spokes) দীর্ঘ হইত এবং নদীর জলস্পর্শ করিত। অল্প পরিসর কিংবা গভীর কূপে প্রাচীন অরঘট্ট বসাইবার সম্ভাবনা ছিল না। দীর্ঘ অরার প্রান্তে ঘট বাঁধিয়া জলস্রোতে স্থাপন করিলে জলের শক্তিতে চক্র ঘুরে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জলপূর্ণ ঘট উঠে। এই কারণে বোধ হয় প্রাচীন অরঘট্ট একাধারে জলচক্র ও রহট ছিল।*

আশ্চর্য এই, সূতাকাটা চরকা নাম কেবল বাঙ্গালাতে আছে। ভারতের অন্যত্র যে নাম আছে, তাহা অরঘট্ট শব্দের অপভ্রংশ, যেন প্রথমে অরঘট্ট পরে চরকার উৎপত্তি। বাঙ্গালা চরকা, ওড়িয়া অরট, হিন্দী রহটা, তেলুগু রাট। মরাঠীতে কিন্তু চরকী, এবং জলোত্তলন-চক্র রহাট। চরখা ও চরখী শব্দ হিন্দীতেও আছে, কিন্তু বোধ হয় সে নাম তত সাধারণ নহে। সূতাকাটা চরকার নাম রহটা দেখিয়া বোধ হইতেছে, চাকার উপর দিয়া ঘটমালা চালাইয়া জলতোলাও প্রাচীনকাল হইতে আছে। পঞ্জাবে গোরু দ্বারা রহট চালিত হয়। সেখানে দাঁতাল চাকা (crown and spur wheel) প্রয়োগ শক্তি-প্রেরণের দৃষ্টান্ত পাই।

দাঁতাল চাকার আরও দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষ দৃষ্টান্ত, কাপাস হইতে তুলা পৃথক করিবার খাঅই। তাহার মুহরী (মুখ) ইংরেজীতে spiral gearing.

দেশীয় কলের এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতেছি, কল কাঠ হইতে লোহাতে আসে নাই। মানুষ ছাড়িয়া কদাচিৎ গোরুর শক্তিতে পঁহুছিয়াছে। অর্থাৎ চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপে কলের যে অবস্থা ছিল, এদেশের সেই অবস্থা চলিতেছে।

দেশীয় কল মানুষের জোরে চালাইবার নিমিত্ত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত কাঠ যথেষ্ট। লোহা অনাবশ্যক ভারি হইত। সে কালে মানুষও সুলভ ছিল। যে কাজে মানুষের জোরে কুলায় নাই, সে কাজে গোরু লাগিয়াছে।

* হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধানে ঘটী যন্ত্রের নাম উদ্‌ঘাটক, পাদাবর্তের নাম অরঘট্টক দিয়াছেন। বোধ হয় হাতে-টানা উদ্‌ঘাটক, পায়ে-চালানা-অরঘট্টক, হেমচন্দ্র এই প্রভেদ করিয়াছেন। উদ্‌ঘাটক একটা সামান্য কপি-ঢাকাও হইতে পারে। বোম্বাইতে রহাটী পায়ে চালান হয়।

বিলাতী কলে লোহার ভাগই অধিক। কোন কোন কল, সব লোহার গড়া। লোহার কল ভারী। চালায় অগ্নি। কোন কোন কল চালায় তাড়িত, কদাচিৎ জল।

যন্ত্র বলি, কল বলি, ওজস্ ব্যতীত চলে না। কাজ করিবার সামর্থ্যকে যন্ত্রবিদ্যায় ওজস্ বলে। যাহার সামর্থ্য আছে, সে ওজস্বী।* বাধা ঠেলিয়া গতি সম্পাদনের নাম 'কাজ'। গতি না হইলে কাজ বলা যায় না। নিদ্রাবস্থায় হাত-পায়ের কাজ থাকে না। ভ্রমণে কাজ করা হয়, কারণ দেহটা একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইতে হয়। ভারী মানুষ বেড়াইয়া অধিক কাজ করে। কিন্তু দেহ জীর্ণ হউক, শীর্ণ হউক, ওজসই কাজের মূল। মন্থরগতিতে দুই ক্রোশ হাঁটিলে যে কাজ, যে ওজস ব্যয়, ক্ষিপ্রগতিতে দুই ক্রোশ হাঁটিলেও সেই কাজ, সেই ওজস সেই ব্যয়। নদীর ঘাটে নামিয়া জল তুলিলে যত কাজ হয়, নদীর পাড় হইতে দোড়ী ঝুলাইয়া জল তুলিলেও তত কাজ। এক-সেরা দ্রব্য এক হাত উচ্চে তুলিলে এক সের-হাত কাজ বলা যায়। কলসী ও জল যদি দশসের হয়, এবং নদীর পাড় হইতে জল যদি আট হাত নীচে থাকে, তাহা হইলে আশী সের-হাত কাজ হইবে। ঘটীতে করিয়া তুলিলে জলে ঘটীতে দশসের তুলিলেও আশী সের-হাত কাজ হইবে।

কিন্তু যখন দেখি একজন এক মিনিটে, অপর জন দুই মিনিটে একই করিল তখন বলি প্রথম ব্যক্তির শক্তি অধিক, দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বিগুণ। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজের পরিমাণ দেখিয়া শক্তির পরিমাণ হয়।† ইংরেজী গণনায় এক অশ্বশক্তি বলিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কাজ বুঝায়। বুঝায় মিনিটে ১১০০০ হাত-সের কাজ। ঘোড়ায় যে এত কাজ করিতে পারে, তাহা নহে।

এদেশে ঘোড়া সুলভ নহে। এদেশের গোরু ও মানুষ বিলাতের গোরু ও মানুষের তুল্য জোরাল নহে। নানা পরীক্ষার ফল আলোচনা করিয়া জানিয়াছি, সাত আট ঘণ্টা ধরিয়া এক অশ্বশক্তি-কাজ পাইতে হইলে

* Energy বুঝাইতে শব্দ-প্রয়োগ করিলে power বুঝাইবার শব্দ থাকে না। জোর =power সামান্য কথায় চলে। কিন্তু যখন বলি power of a horse and horse power এক নয়, তখন জোর ও শক্তি দুইই লাগে। তা ছাড়া, ধীশক্তি, বিচারশক্তি, বাক্‌শক্তি প্রভৃতি শব্দে শক্তির অর্থ energy নহে।

† ইংরাজীতে এক পৌণ্ড ওজনের জিনিস এক ফুট উপরে তুলিলে এক ফুট-পৌণ্ড কাজ ধরা হয়। কিন্তু পৌণ্ড দেশে প্রচলিত হয় নাই, ফুট অপেক্ষা হাত আমরা সহজে বুঝি। ১৮ ইঞ্চিতে হাত ধরিলে এক সের-হাত প্রায় ৩ ফুট-পৌণ্ড হয়।

দেশের দশটা গোরু চাই। সে কাজ করিতে চল্লিশজন মানুষ লাগে। অর্থাৎ একটা গোরুর শক্তি পাইতে গেলে চারিজন মানুষ চাই। ইহা অপেক্ষা গোরু কিংবা মানুষ যে অধিক কাজ করিতে পারে না এমন নহে। যদি গোরু মিনিটে ১১০০ হাত-সের, এবং মানুষ ৭০০ হাত-সের কাজ করে, তবে খুব করে বলা যাইতে পারে।

যন্ত্রবিদ্যার এই মূল কথায় আসিবার প্রয়োজন সর্ব্বদা দেখিতেছি। বিনা শক্তিতে কাজ হয় না, কলেও হয় না, এই তত্ত্ব এদেশে যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল। এই তত্ত্ব না জানিয়া অনেক কর্ম্মকার মরুভূমির মরীচিকায় জলভ্রম করিয়াছেন, কল-কল্পনায় সময় অর্থ ও শক্তি বৃথা ব্যয় করিয়াছেন। একটা অস্পষ্ট জ্ঞান আছে যে কলে শক্তি কম লাগে।

ইহার বহু উদাহরণ অনেক পাইয়া থাকিবেন। এক কর্ম্মকার কলের লাঙ্গল করিয়াছিল। তাহার এবং গ্রামের লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল মানুষ সে লাঙ্গল ঠেলিয়া জমি চষিয়া ফেলিতে পারিবে। কিন্তু বুঝে নাই, যে লাঙ্গল টানিতে দুইটা গোরুর জোর লাগে, তাহা মানুষে পাওয়া যাইতে পারে না। চাকা বসাই, আর যাহাই বসাই, শক্তি-ব্যয় ন্যূন হয় না। বরং চাকার পরস্পর ঘষা-ঘষিতে শক্তি-ব্যয় অধিক আবশ্যক হয়। যদি গোরুর টানা-শক্তির পরিবর্ত্তে তাহার দেহের ভার-শক্তি অধিক লাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে কলের লাঙ্গলে অধিক কাজ পাইবার আশা করা যাইতে পারে। কেবল গ্রাম্য কর্ম্মকার কেন, সরকারী কৃষিবিভাগে লাঙ্গল এদেশে চালাইবার অনেক অনেক চেষ্টা হইয়াছে। এদেশের গোরুর জোর বিলাতের ঘোড়ার জোরের সমান মনে না হইলে এই সব পরীক্ষার প্রয়োজনই হইত না।

এক ব্যক্তি কলের ঢেঁকী করিয়াছেন। একজন লোক হাত দিয়া চাকা ঘুরাইয়া ধানের তুষ ছাড়ায়। কিন্তু জানিতে চাই, দেহের ভারে যে কাজ হইতেছে সে কাজ হাতের টানায় আসিতে পারে কি?

অনাবৃষ্টির সময় বহু কৃষক দমকল আকাঙ্খা করে। কিন্তু জানে না অল্প সময়ে যদি বেশী জল তুলিতে হয়, বেশী শক্তিও চাই। এক জন কি দুই জন মানুষ হাতের টিপনে জমির আবশ্যক জল কদাপি তুলিতে পারে না। সরকারী কৃষিক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, হাজার টাকায় দমকল কেনা হইয়াছে, গ্রাম্য কৃষক তাহাতে জল তোলা দেখিয়া দেশীয় সেঁওনা ছাড়িবে। বড় দমকলে বেশী জল উঠে বটে, কিন্তু কত শক্তি লাগে?

এইমাত্র এক ভদ্রলোক এক কল্পনা বলিতেছিলেন। ঘড়ীতে দম দিলে ঘড়ীর চাকা ঘুরে। অতএব একটা বড় ঘড়ী লাগাইয়া পাখা টানাইলে লোক লাগিবে না। সুবিধা বটে, কিন্তু যে পাখা টানিতে একজনা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে ততঘণ্টা টানিবার মোটা ও লম্বা ইস্প্রিং মুড়িতে একজন লোকও দরকার হইবে। একজনেও পারিবে কি না সন্দেহ।

ভুলের উৎপত্তিও বুঝিতে পারা যায়। একখান বড় পাথর নড়াইতে পারি না। কিন্তু শাবলের চাড়া দিয়া অক্লেশে দূরে লইতে পারি। পাথর নড়ানা কেন, সেকালের এক গ্রীক গাণিতিক গণিয়া বলিয়াছিলেন দাঁড়াইবার একটু স্থান পাইলে শাবল দিয়া পৃথিবীটা উলুটিয়া দিতে পারি।

শাবল দিয়া পাথর নাড়িতে পারা যায়। অতএব শাবল এমন যন্ত্র যে তদ্দ্বারা মানুষের শক্তি বাড়িয়া যায়। এইরূপ জ্ঞান হওয়া আশ্চর্য নয়। বস্তুতঃ শক্তিপ্রয়োগে একটা কথা ভুলিয়া যাই। সে কথাটা সময়-ব্যয়। সময় দিলে অল্প শক্তিতে কাজ যত হয়, সময় না দিলে সে শক্তিতে তত কাজ হয় না। কাজের পরিমাণ ঠিক থাকে। সময় বাঁচাইতে চাহিলে শক্তি বাড়াইতে হইবে, শক্তি বাঁচাইতে চাহিলে সময় বাড়াইতে হইবে।

আর এক কথা আছে। গণিতে যাহা সুসাধ্য বলে, কাজে তাহা সুসাধ্য না হইতে পারে। কাজে যে সব স্থলে সুসাধ্য হয় না, তাহা আর্কিমিদিজের দম্ভ বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়। তিনি পৃথিবীর বাহিরে দাঁড়াইবার একটু স্থান চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বলেন নাই শাবল-খানা কত লম্বা চাই।

বিদ্যালয়ে বালকও ত্রৈরাশিক করে; বলে, যদি দশ জন আট ঘণ্টা খাটিয়া একশত দিনে একটা বাড়ী গাঁথে, তাহা হইলে একহাজার লোক খাটিলে বাড়ীখানা এক দিনে গাঁথা হইতে পারে, চারি লক্ষ আশী হাজার লোক জুটাইতে পারিলে, এক মিনিটেই বাড়ী খাড়া হইবে!

শিল্পী ও বিক্রেতার নিকট এইরূপ ত্রৈরাশিক শুনিতে পাওয়া যায়। শিল্পী উৎসাহে ত্রৈরাশিক করে, বিক্রেতা বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে করে। প্রথম ঘণ্টায় চারি মাইল পথ চলা যাইতে পারে, কিন্তু পরে পরে আট ঘণ্টায় বত্রিশ মাইল পথ চলা যে-সে লোকের কর্ম নহে।

তবে কলে করে কি? কলে শক্তিপ্রয়োগের সুবিধা করে। দুইটা গোরু পিঠে করিয়া দুই মণ ভার বহিতে পারে, কিন্তু রাস্তা ভাল হইলে গাড়ীতে দশ মণ পারে। অতএব একই শক্তিতে কাজ পাঁচগুণ বাড়িয়া যায়।

কিন্তু যদি গাড়ীর গড়ার দোষ থাকে, চাকায় তেল না থাকে, তাহা হইলে দশ মণ ভার বহিয়া লইতে পারে না, গাড়ীর কার্যক্ষমতা কমিয়া যায়। চালক যত শক্তি প্রয়োগ করে, কলে তত শক্তি পাইলে কল উৎকৃষ্ট। কিন্তু এমন কল হইতে পারে না। কলের ভার, চাকা দোড়ী প্রভৃতির ঘষাঘষিতে শক্তির অপব্যয় হয়। ঘরের কথা ধরুন। ভাত রাঁধিতে যত তাপ আবশ্যক পাচক হয় ত তাহার বিশগুণ তাপ প্রয়োগ করে। কতক তাপ হাঁড়ী উনান গরম করিতে ব্যয় হয়,কতক বায়ুতে চলিয়া যায়, হাঁড়ীতে লাগে না। উনানের দোষে কাঠ যে বেশী পুড়ে, তাহা গৃহিণী মাত্রেই জানেন।

শিল্পীর মাথা, কর্মকারের হাত একত্র না হইলে দেশে নূতন কল জন্মিবে না। প্রয়োজন না থাকিলে মূঢ়ও নড়ে না। দুঃখের বিষয় আমরা অভাব বোধ করিতে পারি না। অভাব বোধ করিতে না করিতে বিদেশী কর্মকার আমাদের ঘরে বহু কল পঁহুছাইয়া দিয়াছে। নগরে নগরে সেলাইর বিলাতী কল ঘর্ঘরশব্দে ঘুরিতেছে, যুবক'বাইকের' বাতিকে মাতিয়াছে, নিষ্কর্মা 'গ্রামো-ফোনে' চাবি দিয়া পাড়াপড়শীর কান ঝালাপালা করিতেছে। এই সব দেখিলে বিদেশীর মনে হইবে, এদেশ কলের দেশ। কিন্তু কে না জানে যখন একটা পেঁচ আটকাইয়া যায়, তখন ঘর্ঘরানি ও পেঁ-পোঁ-আনি সব বন্ধ হয়। তখন ব্যবসায়ী বিশ্বকর্মার দোকানে শরণ লইতে হয়। পরের কাঁধে ভর দিয়া লম্বা হওয়া বেশীক্ষণ চলে না।

এমন কথা নয় যে, পৃথিবীর শ্রমবিভাগ উঠিয়া যাউক, যিনি 'বাইকে' চড়িবেন তিনি 'বাইক' গড়িয়া চড়ুন। কথাটা এই, সকল দিকেই শিল্পী ও কর্মকারের অভাব দেখিতেছি। পুরানা তাঁতে পরিণত করিতে অধিক গুণী-পণা আবশ্যক হয় না। তথাপি ঠক্‌ঠকি তাঁত এত অল্প চলিতেছে কেন?

ময়ূর-পুচ্ছ দেহে সংযুক্ত না হইলে প্রয়োজনের সময়ে খসিয়া পড়িতে পারে। তখন দাঁড়কাকের দুর্দশা ও বিভ্রমের সীমা থাকে না।

বাহ্য আড়ম্বর নাই ধরিলাম। কৃষিই আমাদের অধিকাংশের জীবিকা। দিন দিন মুনিশ-জনের যেরূপ অভাব হইতেছে, কৃষিকর্মে কিছু কিছু কল না লাগাইলে কৃষিও অসাধ্য হইবে। গ্রামবাসী কৃষকমাত্রেই জানে ধান রোয়া ও ধান কাটার সময় সকলেরই লোক দরকার হয়। ধান-রোয়া কল ও ধান-কাটা কল যদি কেহ উদ্ভাবন করে, তাহা হইলে কৃষকের যে কত উপকার হয়, তাহা বলিতে হইবে না। বিলাতী কলের ভরসা বৃথা। সে

কল বিলাতেই চলিতে পারে, এদেশে পারে না। কই সে অধ্যবসায়ী শিল্পী, যিনি অভাব বুঝিয়া কল্পনানেত্রে কল দেখিয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন? বিলাতী আদর্শও আছে, কই সে কর্মকার যিনি সে আদর্শকে এদেশের উপযোগী করিয়া দিবেন?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দুইটি তত্ত্ব সভ্য মানবের চিন্তাস্রোত পরিবর্তন করিয়াছে। এক, বিবর্তনতত্ত্ব; দুই, ওজসের স্থায়িত্ব-তত্ত্ব। মানুষের পূর্বপুরুষ বানর কিনা, কেবল সে বিতর্কে নহে, জ্ঞানের যাবতীয় ভাণ্ডারে বিবর্তনের কুঞ্চিকা লম্বিত হইয়াছে। যে পথ দিয়া য়ুরোপ বর্ত্তমান স্থানে উঠিয়াছে, অবিকল সে পথ না ধরি, সোপান দিয়া উঠিতে হইবে। প্রভেদ এই, য়ুরোপ এক এক ধাপ উঠিয়া ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বহু কালক্ষেপ করিয়াছে, এদেশ গন্তব্য দৃষ্টি করিয়া কালক্ষেপ সংক্ষেপ করিতে পারিবে। এক রাত্রে কলকৌশলে য়ুরোপ দক্ষ হয় নাই, এক রাত্রে এদেশও হইবে না। য়ুরোপে লোহার কাল; এদেশে কাঠের কাল অদ্যাপি চলিতেছে। এখন কিছুদিন লোহা ও কাঠ লইয়া না কাটাইলে, কাঠ বাঁশ হইতে একেবারে লোহা ধরিলে বিবর্ত্তনের ক্রম ভঙ্গ হইবে।

এতদিন শক্তির অভাবও ছিল না। মানুষ, গোরু সুলভ ছিল। গ্রামে এখনও গোশক্তি সুলভ। সুতরাং মানুষশক্তির পরিবর্ত্তে গোশক্তির প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্রশক্তি আরও সুলভ বটে, কিন্তু সে যন্ত্র নির্মাণ করিতে বিশ্বকর্মার কারখানা চাই। মোটা মোটা লোহা গড়া পেটা ঢালা চাঁচা কোঁদা প্রভৃতি কাজ সাধ্য না হইলে বাষ্পীয় যন্ত্র নির্মিত হইতে পারেনা। তা ছাড়া জটিল কল মাঝে মাঝে বিগড়াইয়া যায়। কেবল শহরে কারিকর, দক্ষ কারিকর কলের দোষ শোধন করিতে পারে। সব কল কি শহরেই বসিবে?

যদি গ্রামে ছোটখাট কল চালাইতে পারা যায়, তাহা হইলে শহরের আবর্জনা কমিয়া যায়, গ্রামের লোকের শিক্ষা হয়, কৃষির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য নির্ম্মাণ চলিয়া সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের জীবননির্ব্বাহ হয়। আজি কালি রেল ষ্টীমার দ্বারা পণ্য বহনের সুবিধা হইয়াছে। সুতরাং শহরে পণ্য উৎপাদন না হইলে ক্ষতি হইবে না। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য গ্রামে উৎপন্ন হইয়া শহরে আসিতেছে। যে গ্রাম্যকলা সমাজের নাড়ী স্পন্দিত করিতেছে, তাহাকে অকস্মাৎ সংক্ষুব্ধ হইতে দিলে মঙ্গল হইতে পারে

না। বহুকালের সমাজ-কলে একেবারে বহু শক্তি চালনা করিলে সে কল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে। বহু শক্তি-সম্পন্ন বাষ্পীয় যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রাণবায়ু প্রবল বেগে বহিতে দিলে দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে না।

ত্রেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে অগ্নি একা নহেন। বরুণ পবন তপন দেবের আরাধনা যদি য়ুরোপ আমেরিকায় হইতে পারে, এই দেবতার দেশে সে আরাধনায় কিছুমাত্র লজ্জার হেতু নাই। অগ্নির গুণ এই, অল্প স্থানে থাকিয়া বহু বল প্রকাশ করেন। বিশেষ গুণ এই, যখন তখন যেখানে সেখানে ইহাঁকে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বরুণ দেব নদীরূপে আছেন বটে, কিন্তু কখন স্ফীত, কখন শীর্ণ হইয়া প্রায়ই মৃদুভাবে বিচরণ করেন। আমেরিকার নায়গারা জলপ্রপাতে লাখ লাখ অশ্বশক্তি লুক্কায়িত ছিল, মানুষের মত মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। এ দেশে কাবেরীর জলপ্রপাতে কত কাজ হইতেছে। জলপ্রপাত না থাকিলেও বঙ্গদেশে নদীস্রোত আছে। জলের বেগ তেমন হইলে, দুই এক অশ্বশক্তি সংগ্রহের কল করায় ব্যয়-বাহুল্য কিংবা কৌশল-বাহুল্য আবশ্যক হয় না। নদী দিয়া প্রত্যহ ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে। পাখা ঘুরাইয়া ষ্টীমার চলে। নদীস্রোতে পাখা বসাইলে জলচক্র হইবে না কি?

বরুণ অপেক্ষা পবন লঘু-প্রকৃতি এবং কাম-চারী। সমুদ্র তীরবর্তী স্থান ব্যতীত অন্যত্র পাঁচ মাস মাত্র ইহাঁর ভরসা করা যাইতে পারে। তাহাও সব দিন নয়, সব স্থানে নয়। ইহাঁর প্রধান দোষ, ইনি কখনও ভীম কখন শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন। তথাপি স্থানকাল বিবেচনা করিয়া চারি পাঁচ মানুষশক্তি অক্লেশে কাড়িয়া লইতে পারা যায়।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় তপনদেবের রুদ্রমূর্ত্তি নাই। বোধ হয় এই কারণে সে দেশে তপনতাপ সংগ্রহে লোকে মনোযোগী হয় নাই। এ দেশে আমরা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া তপনতাপ সর্ব্বদা স্মরণ করিতেছি, প্রচণ্ড দেখিয়া ঘরে লুকাইতেছি। বিজ্ঞানবিৎ বলেন একসের জল এক শতাংশ উষ্ণ করিতে প্রায় এক সহস্র হাত-সের কাজ আবশ্যক হয়, এবং কৌশলে সেই জল হইতে তত কাজ বাহির করা যাইতে পারে। তাপকে কাজে পরিবর্ত্তন করিতে কিছু অপব্যয় হইবে। তথাপি এক শতাংশ উষ্ণ একসের জলে এক মানুষ-শক্তি লুক্কায়িত আছে। কই সে বৈজ্ঞানিক, কই সে শিল্পী, যিনি রৌদ্র ধরিবার কৌশল দেখাইয়া দিবেন?

মানুষের জোরে চলিবার কল মানুষের ইচ্ছায় চলে, থামে। যখন অন্যশক্তি লাগাইতে যাই, তখন চালকের সঙ্গে সঙ্গে চালিতের রূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। সে পরিবর্ত্তনেও শিল্পী আবশ্যক। কিন্তু লোকে কথায় বলে ঘোড়া হইলে ঘোড়ার চাবুকের জন্য আটকায় না।

বৃক্ষের উপকারিতা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, লিখিত।

কোন দেশের অরণ্য সমূহ বিনাশ করিবার পর দেখা যায় যে সে দেশে আর ভালরূপ বৃষ্টিপাত হয় না। এই কারণে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই বন-রক্ষণের ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতবর্ষেও এক্ষণে বনবিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে। যাহাতে লোকে ইচ্ছামত গাছগুলিকে কাটিয়া বনের ক্ষতি করিতে না পারে সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে।

অরণ্যের সহিত বৃষ্টিপাতের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে কি তাহা সাধারণ পাঠক-গণ ত অবগত নহেনই এমন কি বিশেষজ্ঞগণও এবিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধে আমরা একটী কিয়ৎ পরিমাণে নূতন মত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সেই দেশের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যদি হিমালয় ও খাসিয়া পর্ব্বতমালা না থাকিত কিম্বা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর যদি ভারতবর্ষ হইতে কয়েক সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত হইত এবং ভারতবর্ষ ও সেই ভূভাগের মধ্যে যদি এক পর্ব্বতমালা থাকিত তাহা হইলে বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের বহুস্থান মরুভূমিতে পরিণত হইত।

দেশের বায়ুপ্রবাহ কোন্ দিক হইতে বহে তদনুসারেও দেশের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি নিরূপিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের বায়ুপ্রবাহগুলি যদি শুধু উত্তর ও পশ্চিমদিক হইতেই প্রবাহিত হইত তাহা হইলেও বঙ্গদেশ বৃষ্টিহীন দেশ হইত।

বিষুবরেখার সমীপবর্ত্তী বলিয়া উত্তপ্তসূর্য্যকিরণে বাষ্পীভূত বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে প্রচুর জলকণারাশি দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহগুলির দ্বারা বঙ্গদেশের মধ্যে আনীত হয়। খাশিয়া ও হিমালয়

পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষের উত্তর ও পূর্ব্বদিক রোধ করিয়া দণ্ডায়মান না থাকিলে ঐ বাষ্পরাশি এদেশ ছাড়িয়া অন্যদিকে গমন করিত। ঐ সকল পর্ব্বতমালা শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্পরাশি জমিয়া মেঘ এবং মেঘ জমিয়া বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

যদি কোন কারণে দেশমধ্যে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া যায় তাহা হইলে দেশের বৃষ্টিও কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ভূমণ্ডল ও আকাশ মধ্যে জলসঞ্চারণ-ক্রিয়া বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। পৃথিবী হইতে আকাশ যে জল পায় সেই জলই বৃষ্টির আকারে পৃথিবীকে দিতে পারে। পৃথিবীও আকাশ হইতে যে জল পায় আকাশকে পুনরায় সেই জলই দিতে পারে। জল আকাশ হইতে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী হইতে আকাশে যাইবার সময়ই বিশ্ববাসিগণের হিতসাধন করিয়া থাকে।

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে পতিত বৃষ্টির জলের কিয়দংশ নদী প্রভৃতি বহিয়া সাগরে উপনীত হয়। কিয়দংশ পুষ্করিণী ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ে গিয়া সঞ্চিত হয়। কিয়দংশ মৃত্তিকার স্তর সমূহের উপরিভাগকে আর্দ্র করিয়া অবস্থিত থাকে। অপর কিয়দংশ মৃত্তিকার ভিতর গমন করিয়া ভূপৃষ্ঠের নিম্নতর স্তর সমূহের মধ্যে গিয়া সঞ্চিত হয়। ভূপৃষ্ঠের উপরিদেশে অবস্থিত জল, তাহা সাগরেই থাকুক, নদীতেই থাকুক, অন্য জলাশয়ে থাকুক বা মৃত্তিকা আর্দ্র করিয়াই থাকুক, সহজেই সূর্য্যতাপে বাষ্পীভূত হইয়া, আকাশে উঠিয়া মেঘ নির্ম্মাণে সহায়তা করে। কিন্তু ভূগর্ভের মধ্যে যে জলভাগ প্রবেশ করে তাহা কি উপায়ে পুনরায় বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হইতে পারে? কূপ বা প্রস্রবণের দ্বারা এই জলের কিয়দংশ সঞ্চালিত জলরাশির সহিত যোগ দিতে পারে। কিন্তু ঐ দুই উপায়ে ভূগর্ভস্থ জলের অতি সামান্য মাত্র অংশই বৃষ্টি-পাত কার্য্যের সহায়তা করিতে পারে।

উপরে যে জলসঞ্চারণ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল তাহাতে সহজেই বুঝা যাইবে যে দেশের ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে (অবশ্য এরূপ পরিবর্ত্তন সহজে সংঘটিত হয় না*) নিম্নলিখিত দুইটী কারণে দেশ মধ্যে বৃষ্টিপাতের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে ঃ—

(১ম) দেশ মধ্যে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় বাষ্প আনীত বা উৎপন্ন হয় নাই।

(২য়) দেশ মধ্যে প্রচুর বাষ্প আছে কিন্তু তাহা কোনও কারণে জমিয়া মেঘ বা বৃষ্টিতে পরিণত হইতেছে না।

বৃক্ষসমূহ ঐ দ্বিবিধ উপায়েই দেশমধ্যে বৃষ্টি উৎপাদনের সহায়তা করে।

দিবাভাগে বৃক্ষসমূহের সবুজ পত্রাবলীর মধ্যে অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে। উদ্ভিদের সবুজকণাসমূহ সূর্য্যতাপের কিয়দংশ অপহরণ করিয়া অপর কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতেছে। অপহৃত সূর্য্যতাপের কিয়দংশই আমাদের খাদ্য ও কাষ্ঠাদির মধ্যে সঞ্চিত স্থিরীভূত শক্তি (Potential energy)। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে উদ্ভিদের দ্বারা দেশের সূর্য্যতাপের যে ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে উহার ফলে বায়ুমণ্ডলের বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। ঐ পরিবর্ত্তন কোনও উপায়ে দেশমধ্যস্থ বাষ্পরাশিকে ঘনীভূত করিয়া মেঘে এবং মেঘকে ঘনীভূত করিয়া বৃষ্টিতে পরিণত করিবার পক্ষে সহায়তা করে। বর্ত্তমান সময়ে বায়ুমণ্ডলের ঐরূপ বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু এ বিষয়ের এখনও কোনও সঠিক মীমাংসা হয় নাই। তবে ইউরোপে কতিপয় স্থলে দেখা গিয়াছে যে বিলাতী ঝাউ বিশিষ্ট অরণ্যে অন্য অরণ্য অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বিলাতী ঝাউয়ের বন যে অন্য বৃক্ষের বন অপেক্ষা বায়ুমণ্ডলে অধিক মাত্রায় বাষ্প দিতে পারে এমন নহে, কিন্তু ঐ ঝাউগুলির পত্রসমূহ সূক্ষ্মাগ্র ও দোদুল্যমান। ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ সূক্ষ্মাগ্র পত্রগুলির দ্বারা পৃথিবী হইতে বায়ুমণ্ডলে অথবা বায়ুমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে তড়িৎ বিনিময়ের কোনও সাহায্য হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত স্থানে বৃষ্টিপাতের সুবিধা হয়। আমাদের দেশীয় দোদুল্যমান ও সূক্ষ্মাগ্র পত্রযুক্ত বৃক্ষগুলির মধ্যে অশ্বত্থ প্রধান। উহার পত্রসংখ্যাও বহু। তাল খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের সূক্ষ্মাগ্র পত্র আছে কিন্তু পত্রসংখ্যা সামান্য। দেবদারুর পত্র দোদুল্যমান ও সূক্ষ্মাগ্র এবং উহা বসন্তাগমে নবপত্রবাস পরিধান করিয়া থাকে ও উহার উচ্চতাও যথেষ্ট।

উদ্ভিদদেহে অবস্থিত সবুজ কণাগুলি সূর্য্যতাপের কিয়দংশ অপহরণ করার ফলে দেশের বায়ুমণ্ডলের তাপ যে অনেকটা কম পড়িবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বায়ুমণ্ডলের এই শৈত্যও বৃষ্টিজননে কিরূপ সহায়তা করে তদ্বিষয়েও সম্যক আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু বৃক্ষ সমূহ দেশের বাষ্পরাশিকে জমাইয়া বৃষ্টিতে পরিণত করিবার পক্ষে যে কতদূর সাহায্য করে তাহা ভালরূপে নির্ণয় করা না যাইলেও উহারা যে দেশের বাষ্পরাশির পরিমাণ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যে জলরাশি পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত তাহা যে সহজেই বাষ্পীভূত হইয়া বৃষ্টিজননে সহায়তা করে তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বৃষ্টির জলের যে ভাগ ভূগর্ভে প্রবেশ করে তাহার যে অতি অল্পমাত্র অংশই কূপ বা প্রস্রবণের আকারে পুনরায় বৃষ্টি নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। ভূগর্ভস্থিত জলের কিয়দংশ যে স্থায়িভাবেই সেখানে সঞ্চিত থাকিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃক্ষাবলীর সহায়তায় এই সঞ্চিত জলের কিয়দংশ বাষ্পাকারে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে নীত হইয়া বৃষ্টি-জনন-কার্য্যের সহায়তা করে।

বৃক্ষসমূহের মূল শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ভূমির মধ্যে প্রবেশ করে। ছোট ছোট ঘাসের মূল দুই এক ইঞ্চির অধিক গভীর মৃত্তিকাস্তর মধ্যে যাইতে সমর্থ নহে। প্রায়শঃ যে বৃক্ষ যত দীর্ঘ তাহার মূল ততনিম্নে প্রবেশ করে। অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বিরাটকায় উদ্ভিদের মূল বিবিধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চারিদিকে যেমন ছড়াইয়া পড়িতে পারে তেমনি ১৫।২০ হাত মৃত্তিকার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। মূলের পুরাতন অংশগুলি বৃক্ষটীকে মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখে। আর উহার কচি কচি অগ্রভাগগুলি বৃক্ষের জন্য ভূমি হইতে রস সংগ্রহ করে। মূলাগ্রভাগগুলির মস্তকদেশ নিতান্ত নরম বলিয়া একপ্রকার টোপরের (মূলত্রাণ বা Root hair) দ্বারা আবৃত। এই টোপরের কিঞ্চিৎ নিম্নদেশ মূলের সহিত লম্বভাবে অবস্থিত ছোট ছোট শ্বেতবর্ণের শুঁয়ার দ্বারা আবৃত। শুঁয়াগুলি কুমড়ার ডগার বা বিছুটীর শুঁয়ার মত। শুঁয়াগুলিই ভূমি হইতে জল আকর্ষণ করে।

শুঁয়াগুলির চারিদিক মৃত্তিকাকণা সমূহের দ্বারা আবৃত। আবার প্রত্যেক মৃত্তিকাকণার চারিদিক অতি সূক্ষ্ম এক জলীয় আবরণের দ্বারা আবৃত (Hygroscopic water)। খানিকটা মাটীকে যখন অত্যন্ত শুষ্ক বলিয়া আপাততঃ মনে হয় তখনও সেই মৃত্তিকাকণা সমূহের গাত্রে উক্তরূপ জলীয় আবরণ থাকে। সাধারণ উপায়ে মৃত্তিকাকণাসংলগ্ন উক্ত জলভাগ বাহির করা যায় না। তীব্রতাপ প্রয়োগের আবশ্যক। কিন্তু মূলজাত শুঁয়াগুলি কণাগুলির নিকট হইতে অনায়াসেই ঐ জল বাহির করিয়া লইতে পারে। এক একটী গাছ হইতে গড়ে এক সের পরিমিত জল বাহির হইয়া থাকে। বড় গাছ হইলে ৩।৪ সের পরিমিত জল বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই জল কিরূপে কাণ্ডের মধ্যে দিয়া গমন করিয়া পরে পত্রের মধ্যে দিয়া বাহির হইয়া যায়

তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতেছে। ঐ হিসাবে দেখা যাইতেছে যে এক একটা গাছের দ্বারা বৎসরে গড়ে দশ হইতে পনের মণ পর্য্যন্ত ভূগর্ভস্থ জল বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হয় ও মেঘনির্ম্মাণে সহায়তা করে।

যদি সমগ্র ভারতবর্ষের বৃক্ষসমূহের সংখ্যা নিরূপণের কোনও সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে দেখা যাইত কি প্রকাণ্ড জলরাশিই না বৃক্ষগুলির সাহায্যে ভূগর্ভ হইতে সংগৃহীত হইয়া বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়! দেশের বৃক্ষরাশির সংখ্যা কমাইয়া দিলে দেশের বাষ্পের পরিমাণও যে কমিয়া যাইবে—কাজেই বৃষ্টির পরিমাণও যে কমিয়া যাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সকল বৃক্ষের বৃষ্টি-উৎপাদনে সহায়তা করিবার ক্ষমতা সমান নহে। ছোট গাছের অপেক্ষা বড় গাছের উক্ত ক্ষমতা যে অধিক তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। বড় বৃক্ষ সমূহের মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষের ঐ ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৃক্ষসমূহ নিজ নিজ পত্রসমূহ দ্বারাই বায়ুমণ্ডলে বাষ্প নিক্ষেপ করিয়া থাকে। নূতন পত্রসমূহেরই এইরূপ বাষ্পনিক্ষেপক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শীতকালে আমাদের দেশে উত্তরে বায়ু বহিতে থাকে। এই বায়ু মধ্য এসিয়ার শুষ্কপ্রদেশ হইতে প্রবাহিত বলিয়া জলীয়বাষ্পশূন্য, কাজেই উহা বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে বৃষ্টি-উৎপাদন-বিষয়ে কিছুমাত্রও সহায়তা করিতে পারে না। বরং যে সকল বৃক্ষ এই সময়ে পত্রযুক্ত থাকিয়া বায়ুমণ্ডলে যে বাষ্পরাশি নিক্ষেপ করে ঐ বায়ু তাহাও এদেশ হইতে একবারে বাহির করিয়া লইয়া যায়। ঐ সকল বাষ্প, এবং ঐ বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া চলিবার সময়ে যে বাষ্পরাশি আহরণ করে তাহা, দক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব উপকূলে এবং সিংহল দ্বীপে উপস্থিত হইয়া সেখানে বৃষ্টি উৎপাদন করে। অতএব চিরহরিৎ বৃক্ষগুলি দেশের অনেক জল বিদেশে রপ্তানি করিয়া দিয়া দেশের কতকটা ক্ষতিও করে।

কিন্তু অশ্বত্থ প্রভৃতি কতিপয় বৃক্ষের পত্রাবলী শীতকালে অকর্ম্মণ্য হইয়া ক্রমশঃ গাছ হইতে একবারেই ঝরিয়া পড়ে। কাজেই তাহারা দেশের জলরাশিকে বিদেশে রপ্তানী করিয়া দিবার পক্ষে কোনওরূপ সহায়তা করে না। শুধু তাহাই নহে তাহারা দেশের বর্ষাকাল আনয়ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট পরিশ্রম করে। তাহাদের কার্য্য চারুপাঠোক্ত বর্ষণবৃক্ষের কার্য্য অপেক্ষা কম

অদ্ভুত নহে। বসন্তাগমে দেশের উপর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমের বায়ুপ্রবাহ বহিয়া যাইতে আরম্ভ হইবার পর হইতে অশ্বত্থবৃক্ষগুলি নবপল্লবিত হইতে আরম্ভ করে। এবং বৈশাখ মাসের পূর্ব্বেই পত্রগুলি পূর্ণায়তন পাইয়া নিজেদের পত্র-জীবনের কার্য্য সামাধা করিতে প্রবৃত্ত হয়। পত্রজীবনের উদ্দেশ্য—সূর্য্য-কিরণের কিয়দংশ এবং মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত রসের কিয়দংশ সংমিশ্রিত করিয়া উদ্ভিদের জন্য খাদ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা। সেই খাদ্য উদ্ভিদের ফল ও বীজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যয়িত হইবে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অশ্বত্থের পাতাগুলিকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কারণ ঐ দুই মাসের মধ্যেই তাহাদিগকে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ফলগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কল্পনায় একবার অনুমান করা যাক জ্যৈষ্ঠ মাসে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থের সমুদয় ফল ও পত্রগুলিকে সংগ্রহ করিয়া স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। ফাল্গুনের প্রথমে একটীও পত্র বা ফল ছিল না কাজেই এগুলি সমস্তই ঐ কয় মাসের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে। এই স্তূপীকৃত কাঁচা পত্র ও ফল রাশির মধ্যে যে অনেকটা জল আছে তাহা বুঝা শক্ত নহে। কিন্তু অশ্বত্থের মূলগুলি, পত্র ও ফলগুলিকে প্রস্তুত করিবার জন্য যে জলরাশি মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া পত্রের মধ্যে দিয়া বায়ুমণ্ডলে বাহির করিয়া দিয়াছে, সে জলের পরিমাণ পত্র ও ফলের সঞ্চিত জলের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। অর্থাৎ অশ্বত্থবৃক্ষ বর্ষাকালের অব্যবহিত পূর্ব্বেই দেশের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প দান করিয়াছে। এই বাষ্পরাশি ঐ সকল বৃক্ষের সহায়তা ব্যতীত বায়ুমণ্ডলে আসিতে পারিত না। সে বাষ্পরাশি দেশের বাহিরে যাইতে পারে না। তাহা হয় দেশেই থাকিয়া সেখানে বৃষ্টি উৎপাদন করে, কি বড়জোর দক্ষিণ-পশ্চিমের বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বাহিত হইয়া হিমালয় বা খাশিয়া পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন হইয়া সেখানে বৃষ্টি উৎপাদন করিয়া আমাদের নদীগুলিকে পরিপুষ্ট করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল বৃক্ষ শীতকালে পত্রহীন থাকে ও বসন্তাগমে নবপল্লবিত হইয়া গ্রীষ্মকালে ফলোৎপাদন করে তাহারা দেশের বৃষ্টি উৎপাদন করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

অল্প সময়ের মধ্যেই যাহাতে অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণ বাষ্প নিষ্কাশিত হইতে পারে প্রকৃতি তাহারও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। অশ্বত্থপত্রের বৃন্ত দীর্ঘ এবং সরু—উহা পত্রটিকে শাখার সহিত নিশ্চল ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে। পত্রটী অতি সহজেই দুলিতে পারে। অশ্বত্থ পত্রের একটী লেজ

আছে সেটীও এই দোলন কার্য্যের বিশেষ সহায়ক। লেজটীর দ্বারা একটী পত্র আর একটী পত্রের গাত্র স্পর্শ করিতে পারে। কাজেই কোন কারণে একটী পত্র দুলিলে সেটী আর-একটী পত্রকেও দুলাইয়া দেয়। একটী অশ্বত্থ ও একটী অন্য কোন গাছকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে অতি সামান্য মাত্র বায়ুপ্রবাহের দ্বারাও অশ্বত্থপত্রগুলি ঝর্ ঝর্ করিয়া দুলিতে থাকে কিন্তু সে সময়ে অন্য বৃক্ষটীর পত্রগুলি হয়ত নিশ্চল থাকে। সিম্পার (Schimper) এবং অন্যান্য কতিপয় উদ্ভিদবিৎ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে অশ্বত্থপত্রের লেজের অন্য উদ্দেশ্য আছে। তাঁহারা বলেন যে লেজের সাহায্যে বৃষ্টির জল অশ্বত্থবৃক্ষের তলদেশ হইতে বৃক্ষের প্রান্তদেশে নীত হয়, কারণ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ভূমির চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু আমি এই মত অপেক্ষা উপরি লিখিত মতকে সমীচীন বিবেচনা করি। কারণ বৃষ্টির জল ভূমির সমতা অনুসারেই বৃক্ষকাণ্ডের নিকটে বা তাহা হইতে দূরে সঞ্চিত হয়। আর অশ্বত্থের স্বজাতীয় এবং উহারই ন্যায় চতুর্দ্দিক বিস্তৃত-মূলশালী অন্য বৃক্ষের পত্রেও বৃষ্টিজলকে বৃক্ষকাণ্ডের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইবার কোনও রূপ ব্যবস্থা নাই। যাহা হউক অশ্বত্থপত্রগুলির পূর্ব্বোক্তরূপ দোলনের জন্য যে তাহাদিগের মধ্য হইতে সহজেই বাষ্প নিষ্কাশিত হইতে পারে তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। সকলেই অবগত আছে যে একখানি ভিজাকাপড় নাড়াইতে থাকিলে উহা সত্বর শুকাইয়া যায়। কাপড়ের গাত্র সংলগ্ন বায়ু কাপড় হইতে জলকণা সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত আর্দ্র হইয়া পড়ে—উহার অধিক জলশোষণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। তজ্জন্য উহাকে সরাইয়া দিয়া উহার স্থানে খানিকটা নূতন শুষ্ক বায়ু আনিতে পারিলে সেই শুষ্ক বায়ু আর খানিকটা বাষ্প বস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। পরে সেই নূতন আর্দ্র বায়ুকেও পুনরায় সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আর্দ্র বস্ত্রকে নাড়াইয়া উহার সন্নিকটে পুনঃ পুনঃ নূতন শুষ্ক বায়ু আনিয়া বাষ্প সমূহকে বায়ুরাশিতে চালাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। বৃক্ষের পত্রগুলি নাড়িবার ফলেও ঠিক ঐরূপই ঘটিয়া থাকে।

বৃক্ষগুলি ভূমির নিম্নস্তরে সঞ্চিত জল শোষণ করিয়া বায়ুমণ্ডলে বাহির করিয়া দেয় বলিয়া উহাদিগের দ্বারা আমাদের দেশের আর এক মহোপকার সাধন করা যাইতে পারে। ইউরোপে কোন কোন স্থলে ম্যালেরিয়াজননী স্যাঁতা ভূমির বা জলা ভূমির নিকটে বৃক্ষ রোপন করাতে সেই স্যাঁতা ভূমিগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষগুলি ভূমির নিম্ন স্তরে অবস্থিত আবদ্ধ

জল বাহির করিয়া লওয়ায় ঐ মহোপকার সংসাধিত হইয়াছে। এদেশেও যাহাতে বৃক্ষের দ্বারা ঐ কার্য্য করান যায় তাহার সম্যক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বৃষ্টি উৎপাদনে সহায়তা করা ব্যতীতও বৃক্ষগুলি আমাদের আর এক পরম উপকার সংসাধন করিয়া থাকে। তাহারা দেশের ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। আমাদের পূর্ব্বকথিত জ্যৈষ্ঠ মাসে সংগৃহীত অশ্বত্থ গাছটীর স্তূপীকৃত পাতা ও ফলগুলির কথা আর একবার ভাবা যাক। সেগুলিতে যে প্রচুর জল সঞ্চিত আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সেগুলিকে ভস্মীভূত করিলে প্রচুর ধূম উৎপন্ন হইবে। ধূমে আমোনিয়া ও জল আছে। পাতা ও ফলগুলি সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গেলে উহাদের ভস্ম অবশিষ্ট থাকিবে। এই সকল ভস্ম সোডিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেসিয়ম প্রভৃতি উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্থ সমূহে নির্ম্মিত। আমোনিয়া নাইট্রোজেনযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ। ঐ সমুদয় পদার্থের অভাবে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না—যেমন আমরা খাদ্যের অভাবে বাঁচিতে পারি না। যে জমিতে ঐ সকল পদার্থের অভাব ঘটে সে জমির উর্ব্বরতা কমিয়া যায়। সে জমিতে উক্ত পদার্থ সমূহ অন্যত্র হইতে আনাইয়া প্রদান না করিলে জমিতে আর ফসল ভাল হইবে না, উহার উর্ব্বরা-শক্তি দিন দিন কমিয়া যাইতে থাকিবে।

অশ্বত্থ গাছের পাতা ও ফলগুলি চিরকাল গাছেই থাকে না, উহারা কিছুকাল পরে ভূপতিত হয়। পাতা ও ফলগুলি পক্ব বা শুষ্ক হইয়া পশু পক্ষী বা বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া পড়ে। বর্ষাকালে সেই সকল পত্র বা ফলের অংশ সমুদয় বৃষ্টি পাইয়া ভিজিয়া যায় ও পরে পচিতে থাকে। জৈব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থকে পোড়াইলে উহার যে পরিণাম হয় পচিতে দিলেও উহার সেই পরিণাম হয়। পচা পত্রের পোটাসিয়ম, সোডিয়াম, ফসফরাস, নাইট্রোজেন প্রভৃতি অংশ ভূমির উপরিভাগের সহিত মিশ্রিত হইয়া তত্রত্য মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সাধন করে। এইরূপে আমাদের পরম প্রয়োজনীয় ধান্য গোধূমাদি উদ্ভিদগুলি পরিণামে উপকৃত হইতে পারে। অশ্বত্থপত্র ও ফলে পূর্ব্বোক্ত উপাদানগুলি জমির নিম্নতর স্তর সমূহের মধ্য হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। ধান্যাদি ছোট উদ্ভিদের মূল অত গভীরদেশে গমন করিয়া ঐ সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিত না।

উপরে যাহা অশ্বত্থ গাছের সম্বন্ধে বলা হইল, তাহা অন্যান্য ফলবান গাছের

সম্বন্ধেও খাটে। তাহারা সকলেই গভীরতর দেশের মৃত্তিকা হইতে বিবিধ সার আহরণ করিয়া উপরের জমিকে উর্ব্বর করিতেছে।

একটী বৃক্ষ যে স্থানে অবস্থিত উহা যে কেবল সেই স্থানের জমির নিম্ন স্তরের মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ লবণাক্ত পদার্থ আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু নিকটবর্ত্তী কোনও তৃণাচ্ছাদিত বা গুল্মাচ্ছাদিত ভূমির নিম্নস্তর হইতে কিছুই লইতে পারে না এমন নহে। প্রত্যক্ষভাবে ঐ ভূমি হইতে কিছু লইতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে পারে। আমাদের দৃষ্টান্তের অশ্বত্থ বৃক্ষটী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে নিজে যে জমিতে অবস্থিত তাহা হইতে অনেক লবণাক্ত পদার্থ (পূর্ব্বোক্ত নাইট্রোজেন পোটাসিয়ম প্রভৃতি মূলপদার্থযুক্ত দ্রব্য) বাহির করিয়া লইয়া নিজের পত্রে সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে ঐ জমির লবণ পদার্থের পরিমাণ যে নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষহীন জমির লবণ পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ষাকালে যখন সমস্ত জমি বৃষ্টির জলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে, তখন সেই জলের মধ্য দিয়া প্রচুরলবণযুক্ত জমির লবণ স্বল্পলবণযুক্ত জমির মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। এবং যতক্ষণ না উভয় জমির লবণ-পরিমাণ সমান হয় ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে এই লবণ বিনিময় চলিতে থাকে। বাঙ্গালা দেশের ধান্যক্ষেত্রগুলির মাঝে মাঝে যে দুই একটী অশ্বত্থবৃক্ষ দেখা যায় তাহারা যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে ধান্যক্ষেত্রের তলদেশের সার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জমিগুলির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অশ্বত্থ বৃক্ষের ফলগুলি ক্ষুদ্র এবং পক্ষীদিগের খাদ্য; এ কারণ তাহারা সহজেই দেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। যে সময় পাখীদিগের শাবক হয় ঠিক সেই সময়েই এ দেশের অনেক গাছের ফল ধরে। এইরূপে দেশের অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা দেশের পাখীদিগের থাকিবার স্থান ও খাইবার দ্রব্যের প্রাচুর্য্য বশতঃ দেশের পাখীর সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতে পারে। পাখীদের দ্বারা দেশের স্বাস্থ্যের কিরূপ উন্নতি হয় তাহা সবিশেষ আলোচিত হওয়া আবশ্যক। পাখীরা দেশের প্রকৃতির খাস মিউনিসিপালিটীর লোক। তাহারা দেশের অনেক ময়লা ও অনেক পতঙ্গ খাইয়া ফেলে। বর্ষার পর দেশ মধ্যে বহুসংখ্যক পতঙ্গ জন্মে—সম্ভবতঃ তাহাদের দ্বারা দেশের ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিস্তারের সুবিধা হইয়া থাকে। দেশে গ্রীষ্মকালে উপযুক্ত সংখ্যক পক্ষী জন্মিলে দেশের ম্যালেরিয়াও অনেকটা কমিতে পারে।

বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা হিন্দুশাস্ত্রের একটী প্রধান পূণ্যজনক পূর্ত্তকার্য্য। কি কারণে শাস্ত্রে অশ্বত্থ বৃক্ষের বিশেষরূপ মর্য্যাদা করা হইয়াছে তাহা এখন সঠিক বলা অসম্ভব। পল্লীগ্রামে এখনও মাঝে মাঝে অশ্বত্থ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি বর্ষে আরও অধিক সংখ্যক অশ্বত্থ প্রতিষ্ঠা হইত। গীতাতেও অশ্বত্থকে সমস্ত বৃক্ষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। এখনও লোকে নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করিতে সম্মত হয় না।

অশ্বত্থ বটের মত বিরাটকায় বৃক্ষ নহে। উহার ফলের সহিত আম, কাঁঠাল ও লিচুর কোন তুলনাই হইতে পারে না—উহা একেবারেই অভক্ষ্য। উহার কাঠে শিশু প্রভৃতি বিশালকায় বৃক্ষের কাঠের ন্যায় কোনওরূপ গড়নই হইতে পারে না। অশ্বত্থের ফুল এমনই নগণ্য যে উহা বকুল অশোক বা কদম্বের মনোহর ফুলের কাছে একেবারে দাঁড়াইতেই পারে না। তবে কোন্ গুণে হিন্দুশাস্ত্রে উহার এত উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে? শাস্ত্রকারগণ কি অশ্বত্থ বৃক্ষের মোহন শ্যামল ও গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন? অথবা তাঁহারা ভূয়োদর্শনের ফলে এই আপাতনির্গুণ বৃক্ষটীর উপকারের কথা বুঝিতে পারিয়া, সাধারণ লোকের হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবং ইহার বংশ বিস্তারের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন?

সদৃশ সাহিত্য উদ্দেশ (Bibliography)

1. Schimper—Plant Geography.

2. Indian Forester No. . 1902, Vol, XXVIII, also Vol. XXX, 1904). The Effect of Forests on the circulation of water at the surface of continents. Derived principally from an article by M. E. Henry in the Revue des Eaux et Forests.

3 Plains, Forests and underground waters—Revue des Eaux et Forests (March and April numbers 1903), by M. E. Henry.

বঙ্গভাষা—ত্রিধারা।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম,এ লিখিত।

ইয়ুরোপ ও শব্দবিজ্ঞান।

শব্দ-বিজ্ঞান একটি খাঁটী ভারতীয় জিনিস। ইয়ুরোপে সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে, প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার ঐক্য ছিল বলিয়াই লোকে মনে করিত না। ইয়ুরোপের ভাষা, আসিয়ার ভাষা, আফ্রিকার ভাষা, পলিনেশিয়ার ভাষা, এইরূপে দেশবিশেষের নামানুসারে ভাষাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইত (MaxMuller's Science of Language). কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ দেখিয়া ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব ধারণা হইল যে, একই ভাষা নানা স্থানে এবং নানা সময়ে নানা প্রকার লোকের মুখে নানা আকার ধারণ করিতে পারে। এই ধারণা হইতেই তাঁহারা আর্য্যভাষাসমূহের মধ্যে পরস্পর কোন না কোন ঐক্য দৃঢ়রূপে ধরিতে সমর্থ হইলেন; এবং বোধ হয় ভুবনবিখ্যাত গ্রিম্‌স্ ল (Grimm's Law) তাহারই অত্যুৎকৃষ্ট ফল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের যে ব্যাকরণকে আমরা বিষকুম্ভবৎ দেখিয়া থাকি, তাহা হইতেই ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী অমৃত মন্থন করিয়া সমস্ত জগৎকে বিমোহিত করিয়াছেন। মহাত্মা নবিলি, সংস্কৃত শিক্ষা দ্বারা স্বকীয় জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কিরূপে আলোচাউল কাঁচা কলা খাইয়া ও ধুতি চাদর পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোলে ব্রহ্মচারিবেশে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে, সকলেরই হৃদয় বিস্ময়ে আপ্লুত হয়।

মানব জাতি ও বিভিন্ন ভাষা।

সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যেমন প্রাণ ও বিবেচনাশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে সমগ্র মানব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয় তুল্যভাবে শোভা পাইতেছে, তদ্রূপ পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের মধ্যেই বাগিন্দ্রিয়রূপ একটী বাদ্যযন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। দেশকালপাত্রভেদে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বাগিন্দ্রিয়েরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। একই বাদ্যযন্ত্রে একই প্রকারের আঘাত করিলে, পৃথিবীর সকল স্থানে একই রকমের ধ্বনি হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। তবে যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, তাহা কেবল জল-বায়ু প্রভৃতি ঘটিত বই আর কিছুই নহে। যদি দেশ, কাল, পাত্র ও জল, বায়ু বিভিন্ন না হইত, তবে

সমস্ত মানবজাতি একই ভাষা বলিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আর, আমরা যে প্রকারের খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া থাকি তাহার উপরে যেমন আমাদের অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নির্ভর করে, তদ্রূপ বাগ্‌যন্ত্রের ভালমন্দও নির্ভর করিয়া থাকে। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে একই আত্মা বিদ্যমান, সমস্ত মানবজাতির হাবভাব একই প্রকারের, সমস্ত মানব জাতি অন্তরে ও বাহিরে একই ছাঁচের, সুতরাং সমস্ত মানবজাতির ভাষাও একই হওয়া সম্ভব; তবে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ব্যাকরণের নূতন শব্দের অধিকার লাভ।

পূর্ব্বকালে, দেশের জল-বায়ুর অবস্থানুসারে বাগ্‌যন্ত্র হইতে যে সমুদয় শব্দ বাহির হইত, আজ কাল প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহার বৈষম্যই লক্ষিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের দুর্ণিবার গতি অবরোধ করে, কাহারই এরূপ শক্তি নাই। তাই ব্যাকরণের প্রাচীনতম বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলী এক্ষণে প্রচলিত থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান বীণাযন্ত্র হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ধ্বনি বাহির হইতে পারে না। প্রাচীন আইন অনুসারে বিচার করিলে, বর্ত্তমানে প্রচলিত অনেক শব্দেরই পরিহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইবার যো নাই। আধুনিক কাত্যায়ন প্রমুখ ব্যাকরণকারগণ সেই সমুদয় নবাবিষ্কৃত শব্দের বৈধতা সম্বন্ধে নূতন আইন জারি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যাত্রা গান শুনিবার নিমিত্ত উপবিষ্ট জনমণ্ডলীর মাঝখানে কোনও কোনও আগন্তুক আসিয়া টিপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে চিম্‌টাটা, কনুইটা, চড়্‌টা, কিল্‌টা, তাহাদের গায়ে লাগিতে থাকে। কোন কোন আগন্তুক সহ্য না করিতে পারিয়া উঠিয়াই চলিয়া যায়। আর কেহ কেহ বা কষ্ট স্বীকার করিয়াই থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহার সঙ্গে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতৃগণের সৌহৃদ্যই জন্মিয়া যায়। তখন আবার চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াসও হইয়া থাকে। ঠিক এই প্রকারে, বহু নূতন শব্দ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে, এবং অবশেষে, ব্যাকরণকারেরাও পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিয়া থাকেন, "দূর যা, এ ব্যাটার জ্বালায় আর পারা গেল না, ইহাকে সনদ দিতেই হইবে।" অবশেষে তাহার রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণেও সূত্র করা হইয়া থাকে, যেমন 'মিলন' 'লিখন'। ব্যাকরণের সূত্র দ্বারা আমরা কেবল "মেলন" ও "লেখন" শব্দ পাইয়া থাকি; কিন্তু "মিলন" ও "লিখন" এই শব্দ দুইটীও শুদ্ধ বলিয়া ইহারা

পরবর্ত্তী ব্যাকরণকারদের নিকট হইতে সনন্দ পাইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা এইরূপ অতর্কিতভাবে শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলি। আমরা ঐরূপ না করিয়া থাকিতে পারি না, প্রকৃতি উহাই চাহে। প্রকৃতির গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? কোন শব্দ দুই একজন লোকের আত্মীয় বা হৃদ্য হইলেও চলিবে না; এ স্থলে দশের মুখেই জয় এবং দশের মুখেই ক্ষয়!

যোগ্যতমের জয়।

বাহ্য জগতের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া কোনও না কোনওরূপ একটী জীবন-সংগ্রাম সর্ব্বদার জন্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সবল প্রাণী বাঁচিয়া থাকে এবং দুর্ব্বল প্রাণী মরিয়া যায়। ভাষাজগতেও এই নিয়মের অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায় না। শৈশবে এক এক জনের বহু নাম রাখা হইয়া থাকে, কিন্তু সময়-শিরে কয়টী নাম টিকিয়া যায়? একটা বই ত নয়। এইরূপ নানা জনে নানা শব্দের আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু দশ জনের পছন্দসহি না হইলে, উহা নিশ্চয়ই টিকিবে না। এ ক্ষেত্রেও Public opinion চাই। প্রাণ হইতে স্বভাবতঃ যে শব্দ বাহির হয়, তাহাই ভাষা। উহা একটী প্রাকৃতিক জিনিস, খামখেয়ালি করিয়া কেহই উহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত করিতে পারে না। কুম্ভকার ঘটপুত্তল নির্ম্মাণ করিতে পারে বটে, প্রাণ প্রদান করিবার যেমন তাহার শক্তি নাই, তদ্রূপ ক্ষিত্যপ্তেজোবায়ু প্রভৃতির মত জীবন্ত সার্ব্বজনিক কোনও পদার্থ নির্ম্মাণ করিতেও তাহার শক্তি নাই। ভাষাজগতেও একই কথা। অভিধান দেখিয়া শব্দ-যোজনা করিলে, সে সমুদয় কৃত্রিম ও রসহীন হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ভেদে শব্দ দুই প্রকার। কিন্তু শব্দবিজ্ঞানে কৃত্রিম শব্দের স্থান নাই, কারণ উহা নির্জীব। আর, একটু অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, বাগিন্দ্রিয়নিষ্পন্ন স্বভাবজ প্রত্যেক শব্দের প্রাণ আছে। কোন কোন শব্দ জন্মিবামাত্রই মরিয়া যায়, আবার কোন কোন শব্দ অক্ষয় অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। যে সমুদয় শব্দ এইরূপ চিরজীবী, তাহারা স্বজাতীয় বহু শব্দের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঁচিয়া রহিয়াছে, এবং তাহাদিগকে ব্যাকরণে শুদ্ধ বলিয়া 'ছাপ' দিয়াছে; আর যে সমুদয় শব্দ সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মরিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেই ব্যাকরণে 'অশুদ্ধ' মার্কা টিকিট লাগাইয়া রাখিয়াছে। ভাষা ব্যাকরণের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া, দুর্দ্দম্য গতিতে ঝাঁকিয়া উঠে; তাহা প্রথমতঃ ব্যাকরণের প্রাণে বড়ই অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ব্যাকরণও শব্দের ভক্ত নয়মের যম। তাই

যে সমুদয় শব্দ নাছোড়বন্দ হইয়া কামড় খাইয়া থাকে এবং দশের মুখেই শ্রুত হয়, তাহাদের কাছে ব্যাকরণ পরাজয় স্বীকার করিয়া নতশিরে তাহার বৈধতা সম্বন্ধে স্বয়ং আইনজারি করিয়া থাকে।

প্রচলিত ভাষায় শব্দ-সংগ্রাম।

শিক্ষিতই হউক আর অশিক্ষিতই হউক, খাঁটী বাঙ্গালী যে ভাষা অনায়াসে বলিয়া থাকে, এবং শিক্ষিতই হউক আর অশিক্ষিতই হউক খাঁটী বাঙ্গালী যে ভাষা অনায়াসে বুঝিয়া থাকে, তাহাই বাঙ্গলা ভাষা। বঙ্গভাষা যে একটী কথিত ভাষা, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কোনও কথিত ভাষার বাল্যাবস্থায় কোনও ব্যাকরণ থাকেনা, বাঙ্গলাভাষারও অন্বর্থনামা কোনও ব্যাকরণের অদ্যাপি সৃষ্টি হয় নাই। এমন কি 'আপনি চুল ফেলাইয়াছেন?' 'আপনি কামাইয়াছেন?' 'তার সহিত আমার অসুহৃদ্ আছে', 'সাক্ষাৎ শালা', 'সোদর শালা (?)' 'স্'র সহিত 'ক্' অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া থাকে' ইত্যাদি বহু কথার শুদ্ধাশুদ্ধি সম্বন্ধে অনেকেই বিচার করিতে উদ্‌গ্রীব হইবেন। এইরূপ স্থলে, বাঙ্গলা ভাষার যে সকল চাল চল্‌তি দৃষ্টে ব্যাকরণের সাধারণ সূত্রগুলি গঠিত হইবে, ভাষাবিদ্‌গণ সেই চালচল্‌তি ঠাওর করিয়া উঠিতে অদ্যাপি সমর্থ হয়েন নাই। চেষ্টা চলিতেছে মাত্র। ভাষা স্রোতস্বতীকে বাঁধিবার চেষ্টা চলিতেছে মাত্র। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে সেই চেষ্টা ফলবতী হইবে এবং বাঙ্গলা ব্যাকরণেও সূত্রের আবিষ্কার হইবে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রমুখ শাব্দিকগণ বঙ্গভাষার চালচল্‌তি যে ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন, পাণিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণও সেই ভাবে তৎকালে প্রচলিত ভাষার চালচল্‌তি নিরীক্ষণ করিয়া, সেই সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শব্দবিজ্ঞান একটী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া পাণিনির বহু সূত্রের তত্ত্বগুলি বঙ্গভাষার মূলেও নিহিত রহিয়াছে। প্রবলবেগে প্রবাহিত বঙ্গভাষা ও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে পাণিনিপ্রমুখ শাব্দিকগণের আইন কানুনগুলি কতদূর বিবেচনা ও দূরদর্শিতার সহিত করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

সংস্কৃত ও বঙ্গভাষা

বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা। বঙ্গভাষাকে আমরা সকলেই হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। "অর্কে চেন্ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ"—ঘরের কোণেই যদি মধু পাইতে পারি, তবে

পাহাড়ে পাহাড়ে কেন ঘুরিয়া বেড়াইব ? তাই আমি বঙ্গভাষা হইতে গুটি কতক উদাহরণ গ্রহণ করিয়া পাণিনি ব্যাকরণের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব। কারণ, পাণিনিব্যাকরণ আধুনিক ধরণের ব্যাকরণ বা "গ্রামার" নহে। পাণিনিব্যাকরণ একটী সর্ব্বতোমুখ শব্দবিজ্ঞান এবং শব্দবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি আর্য্যভাষার সমস্ত শাখাপ্রশাখার তত্ত্বস্বরূপ হইয়া চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। পরন্তু, আজ কাল বঙ্গভাষা যেমন প্রচলিত ও কথিত হইতেছে, প্রাচীন কালেও সংস্কৃত ভাষা তেমনি সমগ্র হিন্দুস্থান ব্যাপিয়া প্রচলিত ছিল ; এবং বাঙ্গালা ভাষায় আজকাল যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সংস্কৃত ভাষায়ও পূর্ব্বকালে সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন বিধিবদ্ধ করিলেই ব্যাকরণের ভাষায় তাহাকে 'আদেশ' বলা হয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, কথিত ভাষা কোনও নিয়মের বশবর্ত্তী নহে, উহা সমস্ত নিয়মের বহির্ভূত ! কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শব্দ-বিজ্ঞান একটী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ; সুতরাং লোকের বাগিন্দ্রিয় ও হাবভাব এক জাতীয় বলিয়া অল্পাধিক পরিমাণে একই নিয়মানুসারে সকলের মুখ হইতে ভাষা বহির্গত হইয়া থাকে। এবং যে সকল নিয়ম প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার চাল্ চলতি সম্বন্ধে খাটিয়া থাকে, সে সকল বঙ্গভাষা সম্বন্ধেও খাটিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশপরম্পরাক্রমে, দুই বৎসর আগেই হউক আর দুই বৎসর পরেই হউক, সংস্কৃত ভাষাই বলিতেন। সংস্কৃত ভাষা তাঁহাদের প্রকৃতিগত ছিল ; আমরা দেখাইব যে, সংস্কৃত ভাষা বঙ্গভাষারও মজ্জাগত। দেশকালপাত্রভেদে, সংস্কৃত ভাষাই ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া, আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আমরা বঙ্গভাষা দ্বারা সনাতন পাণিনিব্যাকরণের উদাহরণ দিলে তাহা অসঙ্গত হইবে না।

সংস্কৃত ভাষা শব্দের অর্থ।

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, প্রাকৃত ও পালিভাষাকে ঘষিয়া মাজিয়া সংস্কৃত ভাষা হইয়াছে ; সে বিশ্বাসটী ভুল। বোধ হয় সংস্কৃত শব্দের অর্থ "refined" করিয়া, পরে তাঁহারা "refind" শব্দে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিয়া থাকেন। পাণিনির "সম্পর্য্যুপেভ্যঃ করোতৌ ভূষণে" সূত্র দ্বারা দেখা যায় যে, সংস্কৃত শব্দে 'ঘষা, মাজা' বুঝাইত না, কিন্তু 'অলঙ্কৃত' বুঝাইত। পাণিনিব্যাকরণেও কুত্রাপি এই দেবভাষাকে 'সংস্কৃত' উপাধি দেওয়া হয় নাই। পাণিনি সর্ব্বত্রই উহাকে কেবল 'ভাষা' নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং ভাষা শব্দের অর্থই,

"আমরা যাহা বলি"—যথা, যে ব্যক্তি 'অঙ্‌ঘ্রি' শব্দের অর্থ জানে না, তাহাকে 'চরণঃ' 'পাদঃ' ইত্যাদি বলিয়া, শেষে বলা হয় যে 'পা' ইতি ভাষা; সুতরাং পাণিনির ভাষা শব্দের অর্থ যে তৎ তৎ কালে প্রচলিত ও কথিত ভাষা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই; সুতরাং প্রাকৃত, পালি, বা অন্য কোন ভাষাকে ঘষিয়া মাজিয়া সংস্কৃত নামে একটী অপূর্ব্ব ও অপ্রচলিত ভাষা পাওয়া গিয়াছে, এই মত অলীক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় না ডুবিয়া ইতর ভাষায় সর্ব্বদা ডুবিয়া রহিয়াছেন তাঁহাদেরই এ বিশ্বাস হইতে পারে যে, সংস্কৃত ভাষা শব্দের অর্থ কোনও ঘষা মাজা ভাষা। কিন্তু, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাষা একটী প্রাকৃতিক পদার্থ, ইহা বাগিন্দ্রিয় রূপ বাদ্যযন্ত্রের সদ্যঃপ্রসূত ধ্বনি। ঘষা মাজা ভাষা একটি কৃত্রিম পদার্থ বই আর কিছুই নহে; সাধারণে উহা ব্যবহার করিতে পারে না, উহা কাহারও জাতীয় ভাষাও হইতে পারে না। সংস্কৃত নাটকাদিতেও যে সমুদয় ব্যক্তিদিগকে প্রাকৃত ভাষা বলিতে দেখা যায় তাঁহারাও সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারিতেন। তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ নিকট সম্বন্ধ ছিল। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা—ক্রিয়াধারা।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষা এক কালেই বাঙ্গালা ভাষায় পরিণত হইতে পারে নাই। সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন, বঙ্গভাষা আধুনিক; ইহার মধ্যবর্ত্তী আরও একটী ভাষা ছিল; তাহার নাম প্রাকৃত ভাষা। একই সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়া বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে। যেন অনাদি অনন্ত একটী স্রোতস্বতী যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেই আকাশ-গঙ্গা যখন সুরলোকে প্রবাহিত হইতে-ছিলেন তখন তাঁহার নাম ছিল দেব-ভাষা। সেই নদী যখন ভূতলে প্রবাহিত হইতেছিলেন, তখন তিনি প্রাকৃত ও পালি নামে ভারতের সর্ব্বত্র বিদিত ছিলেন। এক্ষণে, সেই গঙ্গা ভোগবতী বঙ্গদেশে বঙ্গভাষা নামে প্রচলিতা হইতেছেন। একই ভাগীরথী প্রথম যুগে স্বর্গে, মধ্যযুগে মর্ত্তে, এবং বর্ত্তমান যুগে পাতালে প্রবাহিতা হইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহর্ষি পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণ দ্বারা আমাদের মাতা গীর্গঙ্গার এই ত্রৈকালিকী অবস্থা প্রাপ্তির কারণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত অবস্থাত্রয়ের উদাহরণ, যথা—

সংস্কৃত (মন্দাকিনী),	প্রাকৃত (ভাগীরথী),	বাঙ্গালা (ভোগবতী)
অস্তি	অচ্ছি	আছে
অদ্য	অজ্জ	আজ
করোতি	করোই	করে
কথয়তি	কহই	কহে
ক্রীণাতি	কিনই	কিনে
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
কার্ষাপণ	কাহাপণ	কাহণ
গৃহ	ঘর	ঘর
চক্র	চক্ক	চাকা
ত্বম্	তুম্ম	তুমি
দ্বার	দুয়ার	দুয়ার
নৃত্যতি	ণচ্চই	নাচে
প্রস্তর	পথর	পাথর
বৃদ্ধ	বুড্‌ঢ	বুড়া
বর্দ্ধতে	বড্‌ঢই	বাড়ে
বধূ	বহু	বৌ
ভবতি	হোই	হয়
ভক্ত	ভত্ত	ভাত
মধ্য	মজ্‌ঝ	মাঝ
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা
লবণ	লোণ	লুণ
বৎস	বচ্ছ	বাছা
বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিজুলী
ব্রবীতি	বোলই	বলে
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁজ
স্তম্ভ	থম্ভ	থাম
স্নান	হ্নান	নাওয়া
হস্ত	হথ	হাত

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, একই স্রোতস্বতী নানা যুগে নানা ভাব ধারণ করিয়াছে। বঙ্গভাষা সংস্কৃত হইতে যত দূরেই সরিয়া পড়ুক না কেন, উহাদের অভিন্নতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। নদী নামেও নিম্নগা, কাজেও নিম্নগা। সমস্ত শব্দ ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নিম্নদিকে যাইতেছে। কোন এক ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি কথা বলিত। তাহাকে যদি কেহ বলিত "বলতো সোনা বোন্‌দিদি" তবে সে এমন তাড়াতাড়ি তাহা বলিয়া ফেলিত যে শ্রোতা মনে করিত যে সে শুনিল 'সমন্দি'। আবার কোনও ছাত্র পাঠ মুখস্থ করিত অর্চ্চ্ (Horse) মানে গুরা, যে গুরাতে গাস্ কায়' (৩বার), তাহার উচ্চারণ পুনঃ পুনঃ সংশোধন করিয়া দিলেও সে 'Horse মানে ঘোড়া, যে ঘোড়াতে ঘাস খায়'—ইহাকে ঐ রূপেই পড়িত। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে ঠিক্ উচ্চারণই করিতেছে। তাহার এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া 'Horse মানে ঘোড়া, যে ঘোড়াতে ঘাস খায়' ইহাই বলিতে চাহিতেছে, এবং তাহার মনে হইতেছে, যেন সে ঠিক্ উচ্চারণই করিতেছে; কিন্তু তাহার বাগিন্দ্রিয়ের উপরে তাহার কোনও হাত নাই, সুতরাং বাগিন্দ্রিয় হইতে অর্চ্চ্ মানে গুরা যে গুরাতে গাস্ কায়', এইরূপ শব্দই উচ্চারিত হইতেছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রকৃতি-পরবশ হইয়াই আমরা সংস্কৃত ভাষাকে পূর্ব্বে প্রাকৃত ও পরে বাঙ্গালা করিয়া তুলিয়াছি। যাহা হউক এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রকৃতিবশে আপনা আপনিই হইয়াছে, উহাতে কাহারও দোষ নাই। এই ভাষা প্রাচীনকালে অনন্ত সংস্কৃত-শাস্ত্রাবলিরূপে, মধ্যযুগে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহরূপে, এবং বর্ত্তমান যুগে কবিকঙ্কণ ও রামপ্রসাদের পবিত্রবাণীরূপে সেবকদিগকে মোক্ষ প্রদান করিতেছেন। যাঁহারা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ত্রিবিধাবস্থার প্রতি আস্থাবান্ হইতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এই ত্রিবিধাবস্থাপন্না দেব-ভাষাকে একমাত্র হৈমবতী গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গেও তুলনা করিতে পারেন। তাঁহাদের মতে পূর্ব্বে পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানে সংস্কৃত-রূপে, পরে বিহারে পালিরূপে, এবং অবশেষে এইভাষা বঙ্গদেশে বঙ্গভাষারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভাষাকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ অজ্ঞান-ধ্বান্ত-নাশিনী বলিয়া জানিতেন, "একঃ শব্দ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকেঽপি কামধুগ্ ভবতি"। যে ব্যক্তি উন্মনস্ক হইয়া কথা বলিত, তাহাকে আসুরী ভাষা বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতেন—"যাং হ্যন্যমনা বাচং বদতি, অসুরা হি

উচ্চারণ আলস।

বৈ সা বাক্, অদেব জুষ্টা" ইত্যাদি মহর্ষি বাল্মীকির গঙ্গা-স্তোত্র যেন আমাদের এই গীর্গঙ্গার সম্বন্ধেও প্রযুজ্য হইতেছে। ভাষা-সেবী যেন স্তব করিতেছেন—

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধা-শৃঙ্গার-হারাবলি,
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভগবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীর-ব্যয়ঃ॥

সাহিত্যসেবা ও বঙ্গনারী।

শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত-লিখিত

ময়মনসিংহ আমার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয়কুলের জন্মভূমি। পূর্ব্ব-পুরুষের দেহ-ভস্মপূত ও তাঁহাদের কীর্ত্তিসমুজ্জ্বল সুজলা সুফলা মাতৃভূমির অঙ্কে দণ্ডায়মান হইয়া আজ এই বিরাট সভাস্থলে বঙ্গভূমির গৌরবস্বরূপ সমবেত মহাত্মাদিগের এরূপ দর্শনলাভ করিলে কাহার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, গৌরবে স্ফীত হয়? যে জগৎপ্রসবিত্রী, জগজ্জননীর বাঙ্ময় স্বরূপ আজ আমাদিগকে এই আনন্দ বিধান করিলেন, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে প্রণিপাত করি।

বাগ্দেবীর পূজামন্দিরে শত ভক্ত সম্মিলিত হইয়াছেন, সাধনার সম্পদে, ভক্তির গৌরবে, নিষ্ঠার শ্রীতে তাঁহারা সুন্দর-সমুজ্জ্বল। দীন পূজকের বেশে তাঁহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আজ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করি, নমস্কার করি। আমি অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য—কিন্তু আমার দীনতার কথা কাহাকেও বুঝাইবার জন্য এখানে উপস্থিত হই নাই। ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইয়াও কি জন্য এই বিরাট সভায় দণ্ডায়মান হইতে উদ্বুদ্ধ হইলাম, তাহাই আপনাদিগকে বলিতে চাই।

আমার বক্তব্য বিষয় সাহিত্যসেবা ও বঙ্গনারী। বাংলা ভাষায় সাহিত্য কথাটি এখন আর ক্ষুদ্রতর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আমাদের বিজ্ঞান-সেবক শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় এই সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে উপস্থিত থাকিয়া সাহিত্যের বিরাট অর্থই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, আমি আমার প্রবন্ধে সেই অর্থেই সাহিত্যকথাটা গ্রহণ করিয়াছি।

দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণকে একত্র সমুপস্থিত দেখিয়া আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, বিশ্বসাহিত্যের মন্দিরে আমাদের স্থান কোথায়? অল্পসময়ের মধ্যে যে দেশের সাহিত্য এরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবি, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক যে দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে এখনও বিচরণ করিতেছেন, তাহার সাহিত্যের অবস্থাকে মন্দ বলিতে কে সাহসী হইবে? আমাদের সাহিত্যের অগ্রগতি যে খুবই আশাপ্রদ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?—কিন্তু তথাপি বলিব, বাগ্দেবীর সেই বিরাট পূজামন্দিরে পূজকরূপে—সাধকরূপে—আমাদের স্থান অতি দূরে—অতি নিম্নে।

আমাদের আপন অবস্থার বিচারে আমাদিগকে পদে পদে ভ্রমে পড়িতে হয়। যে জাতি দীর্ঘকাল যাবৎ নিশ্চেষ্ট ও মুহ্যমান, যে জাতির মধ্যে যখন রাজা রামমোহন রায়ের মত সর্ব্বদিকপ্রসারিণী-প্রতিভাবিশিষ্ট মহাপুরুষ, বিদ্যাসাগরের মত মহাপ্রাণ, বঙ্কিমচন্দ্রের মত চিন্তাশীল সুলেখক, মাইকেল প্রভৃতির মত মহাকবি এবং প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক অভ্যুদিত হন, তখনই আমাদের মনে হয়—আমরা ছোট কিসে?—উত্তর—আমরা নগণ্য সাধনায়; মনুষ্যত্বের সাধনায় আমরা হীন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় আমরা হীন, আমরা হীন নই কিসে?

তবে মৃতপ্রায় মহাবৃক্ষের দেহে নবোদ্গত শাখাঙ্কুরের মত এদেশে এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় কিরূপে? একথার একটীমাত্র উত্তর আছে—পূর্ব্ব পিতৃপুরুষের ও মাতৃকুলের সাধনায়। হিন্দুজাতির মত ধর্ম্মের জ্ঞান, বিজ্ঞানের ও মনুষ্যত্বের এমন একনিষ্ঠ সাধক জগতে আর কে ছিল? সে সাধনালব্ধ ধন কি এতই খেলো জিনিষ যে ইতিমধ্যেই তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? এরূপ বলিলে আমাদের পূর্ব্বপিতৃকুলের ও মাতৃকুলের সাধনার অবমাননা করা হয়। তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞান, তাঁহাদের সতীত্ব এখনও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় আমাদের জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে প্রবাহিত হইতেছে। যেমন মহাকায় বনস্পতি মৃতপ্রায় হইলেও তাহার দেহাভ্যন্তরে এতটুকু রস সঞ্চিত থাকে যে ক্ষুদ্র নবাঙ্কুরের পোষণ করিতে, তাহাকে শ্যামলশ্রীতে ভূষিত করিতে সেই রসই যথেষ্ট, তেমনি হিন্দুজাতি অধঃপতিত হইলেও দশ পাঁচজন মহাপুরুষকে জন্মদান করিবার মত, জগতের সম্মুখে তাঁহাদিগকে মহাপুরুষরূপে দণ্ডায়মান করিবার মত

শক্তি তাহার এখনও আছে। তাই বলিতেছিলাম, দুদশজন মহাপুরুষকে দেখিয়া আমরা যেন আমাদের হীনতার কথা ভুলিয়া না যাই। পূর্ব্ব পিতৃমাতৃকুলের যত্নসঞ্চিত এই ধন অধিকার করিবার শক্তি লাভ করিতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন! আমাদের সে সাধনা কোথায়?

সাধনার অভাব যে ষোল আনাই রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু এই নিশ্চেষ্টতার জন্য একটু ক্ষমার দাবী স্বভাবতঃই মনে জাগ্রত হয়। আট শত বৎসরের নিশ্চেষ্টতায় আমরা যে মরিয়া যাই নাই, জাতি হিসাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠা হইতে যে আমাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই ইহাই ত অত্যদ্ভুত, অতি বিস্ময়কর! তার উপর যদি আমরা উঠিবার, বসিবার, দৌড়াইবার জন্য আর চেষ্টা না করি তবে কি আমাদের ক্ষমা নাই?—না, আত্মসমর্থনের সে অবসরও বিধাতা রাখেন নাই।

কারণ, একথা কি সত্য নয় যে যদিও আমরা এতদিন নিশ্চেষ্টভাবে কাটাইয়াছি, তথাপি প্রায় দেড়শত বৎসর মঙ্গলময়, সঞ্জীবনী শক্তিপ্রদান-কারী ইংরাজশাসনে আমরা বাস করিয়াছি? অন্তরে উর্ব্বরা শক্তি ধারণ করিয়াও নিদাঘের প্রান্তর শুষ্কতৃণ হইয়া খাই খাই করিতে থাকে বটে, কিন্তু বর্ষার নব জলধারা বর্ষণে আবার কি তাহা জীবন্ত ও সরস হইয়া উঠে না? শমীবৃক্ষে প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় আমাদের অভ্যন্তরে যে পূর্ব্ব পিতৃমাতৃকুলের শক্তি ও তেজ এখনও লুক্কায়িত রহিয়াছে, আমাদিগকে কে তাহা স্মরণ করাইয়া দিল, এবং স্মরণ করাইয়া আমাদের সম্মুখে তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিল?

ইংরাজ জাতি—ইংরাজের সাহিত্যসেবা। আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের রচিত বেদ উপনিষদের দোহাই দিতাম, কিন্তু বেদ উপনিষদ কি জানিতাম না। বিস্মৃতির অতল তল হইতে কে আমাদের আপন রত্ন উদ্ধার করিয়া দিল? উত্তর-ইংরাজ। একজন সুলেখক লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অক্ষয় ভাণ্ডার, কিন্তু আমরা জানিতাম আমাদের ইতিহাস নাই, ভাল হউক বা মন্দ হউক ইংরাজই প্রথম আমাদিগকে দেখাইলেন যে আমাদের ইতিহাস আছে। তদ্রূপ স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ইত্যাদি ললিত-কলার বিবিধ বিষয়েও তাহাই দেখিতে পাইতেছি।"* সুতরাং ইংরেজ জাতির সহিত

* বিক্রমপুরের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৩১৮ বৈশাখ সংখ্যার ভারত-মহিলায় "ভারতের গিরি-মন্দির," নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভারতের যে সংস্পর্শ তাহা আমাদের পক্ষে অতি কল্যাণকর, আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সঞ্জীবনী ঔষধি স্বরূপ।

কিন্তু এ ইংরাজ কোন্ ইংরাজ?—একি বাণিজ্য ব্যবসায়ী, বণিক্‌বৃত্তি ইংরাজ? না—যাহা আমাদিগকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঊর্দ্ধদিকে ও সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে উৎসাহিত করিতেছে, তাহা ইংরাজের আত্মপ্রতিষ্ঠতা নহে, তাহা ইংরাজের ব্যবসায়-বুদ্ধি নহে তাহা তাহাদের জ্ঞানানুরাগ—সাহিত্যানুরাগ। ইংরাজের দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এমন সাহিত্যানুরাগ জগতে কয়টী জাতির আছে? বনে যাক্, জঙ্গলে যাক্, বাণিজ্য করিতে যাক্, রাজ্য জয় করিতে যাক্, এই জ্ঞানানুরাগ সর্ব্বত্র তাহার সঙ্গে গমন করে। ইংরাজের রাজ্যশাসনের সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্যানুরাগ আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে তাই আমরা জাগিয়াছি। তাহারা তাহাদের জ্ঞানপিপাসাকে চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের ঘরের খবর সংগ্রহ করিয়াছে, উপকৃত হইয়াছি আমরা। সাহিত্যের প্রকৃতিই এই। সে কাহারো অপকার উপকার বোঝে না, তাহার অন্তর্নিহিত পিপাসা তাহাকে যে দিকে চালিত করে সে সেদিকেই অগ্রসর হয়, কিন্তু উপকৃত হয়, কৃতার্থ হয়, ধন্য হয়, বিশ্বমানব! কারণ, সাহিত্য কোন পার্থিব জিনিষ নহে, সাহিত্য দেবত্ব—সাহিত্য ঈশ্বরত্ব। মানবের অন্তরে—জাতির অন্তরে আপনাকে—অর্থাৎ মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার যে চেষ্টা সেই প্রয়াসের বহিঃপ্রকাশেই সাহিত্যের বিকাশ। যেখানে দেবত্ব সেখানেই অহিংসা, প্রেম, শান্তি। সাহিত্য সর্ব্বনিরপেক্ষ। জাতীয় স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ এ সকল বিচারে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন হয় না। তাহার রাজনীতি সত্য ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের আজকালকার সংসারের প্রচলিত তথাকথিত রাজনীতির ধার সে ধারে না, স্বার্থদুষ্ট বাণিজ্যনীতির কোন তোয়াক্কা সে রাখে না, সে রাজা—প্রভু—বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ, মানুষ তাহাকে মানিয়া চলিলে উপকৃত হইবে, না মানিলে আপনাকে ক্ষুদ্র করিবে, হীন করিবে। সাহিত্য-সেবী ইংরাজ সাহিত্যের এই স্বরূপ জানে, তাই ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ভুলিয়া আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াছে, আমাদের অন্তর্গূঢ় শক্তির উৎস আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছে, এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্রোতকে এদেশে প্রবাহিত করিয়াছে। তাই বলি, ইংরাজের সাহিত্য-সেবা আমাদের পক্ষে সঞ্জীবনী-শক্তির কাজ করিয়াছে।

সাহিত্যের এমনই প্রভাব। সাহিত্য মৃতপ্রাণে চেতনা সঞ্চার করে। তারপর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মোসলেমত্বের উপর সাহিত্যের প্রভাব কতদূর? আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, আমাদের জাতিভেদ, দেবদেবীবাদ ও শান্তিপ্রিয়তা এ সকলের মূলে সাহিত্যের প্রভাব কত অধিক! আজ যে এ দেশে কুলি-রমণী হইতে রাজরাণী পর্য্যন্ত সতীত্বধর্ম্মকে মস্তকের মণি করিয়া রাখিতেছে তাহার মূলে কি? রামায়ণ ও মহাভারতের স্মৃতি যদি হিন্দু মুছিয়া ফেলিতে পারিত, সীতা সাবিত্রীর কথা যদি সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারিত, তবে হিন্দুজাতি থাকিত না। সাহিত্য ব্যক্তিকে গড়ে, সমাজকে গড়ে, জাতিকে গড়ে। সাহিত্যের শক্তি অসাধারণ, প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড। এই জন্যই সুসাহিত্যে প্রবল শক্তিশালী, কুসাহিত্যের প্রভাবও অল্প নহে। কিন্তু যাহা মন্দ, কু, তাহা সাহিত্যের প্রকৃতি নহে, বিকৃতি। কুসাহিত্য—ভ্রান্তি-পূর্ণ সাহিত্য, অশ্লীল সাহিত্য মানবজাতির প্রচুর অকল্যাণ সাধন করে। আমাদের জীবনের অবসাদ ও জড়তার জন্য আমাদের সাহিত্য অল্প দায়ী নহে। বঙ্গের একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি একদিন বলিয়াছিলেন, অদৃষ্টবাদ ভারত-বাসীর অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণও যেমন অদৃষ্টের দোহাই দেন তেমনি রাস্তার মজুরও বলে, "রামজী যো লিখল্ বারে সো ত হইবেই করে।" যুগ যুগান্তরের গর্ভ হইতে, সুদূর অতীতের উৎস হইতে কে এই অদৃষ্টবাদকে বহন করিয়া আমাদের হাড়ে হাড়ে মিশাইয়া দিয়াছে—আমাদের পুরাণ, মহাকাব্য—আমাদের সাহিত্য। সুতরাং সাহিত্যের প্রভাব অনন্যসাধারণ।

এখন প্রশ্ন এই, ভগবান্ এমন শক্তিশালী পদার্থ যে সাহিত্য তাহার সেবা করিবার, তাহার পূজা করিবার অধিকার আমাদিগকে দিয়াছেন, আমরা এ অধিকারের কিরূপ ব্যবহার করিতেছি? বঙ্গের একজন খাঁটি সাহিত্যসেবক আমাদের সাহিত্যের অবস্থা সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"কাব্য, উপন্যাস ও কথাসাহিত্য পরিত্যাগ করিলে সাহিত্য পদবাচ্য রচনা অতি অল্পই আমাদের ভাণ্ডারে পড়িয়া থাকে। ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তুলনামূলক ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালী কাহাকে বলে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়

না সমালোচনা-বিজ্ঞানের সূত্রপাতই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি মাসিক সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবং বিদেশীয় সাহিত্য হইতে কাব্যাদির অনুবাদ মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা দার্শনিক জাতি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি কিন্তু উচ্চ অঙ্গের দর্শন-চর্চ্চা আমাদের সাহিত্যে অতি সামান্য স্থানই অধিকার করিয়াছে। যে সকল দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিতে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য মুখ্যস্থান অধিকার করে তাহাদের সহিত তুলনা করিলে আমাদের সাহিত্যের দারিদ্র্য ও অপ্রাচুর্য্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।"

অর্থাৎ ভগবান্ আমাদিগকে যে অধিকার দিয়াছেন আমরা তাহার অপব্যবহার বা অব্যবহার করিতেছি। অপব্যবহারের কথা এখানে আলোচনা করিব না, অব্যবহার সম্বন্ধেই দু একটী কথা বলিতেছি। অভাবের কথা বলিতে গেলেই পূর্ব্বে ভাবের কথা বলিতে হয়। সাহিত্যের জন্ম কিসে? প্রাণময়তা, আন্তরিকতা হইতে ভাব জন্মগ্রহণ করে, ভাবের প্রকাশেই সাহিত্যের সৃষ্টি। চোর চুরি করে কেন? অভাবের তাড়নায় বা অর্থের লোভে। অভাব যখন সে তীব্রভাবে অনুভব করে, অথবা লোভ যখন ঐকান্তিক ভাবে তাহার হৃদয়কে অধিকার করে তখনই সে চুরি করে। পরদুঃখে লোকে প্রাণদান করে কেন? না অপরের দুঃখকে আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে বলিয়া। সেইরূপ প্রত্যেক আন্তরিকতাপূর্ণ কাজ হইতে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। সখ করিয়া কবিতা লিখিতে গেলে তাহা কখনই কবিতা হয় না। পত্রিকা-সম্পাদকগণকে এই সখের জ্বালায় কত জ্বালাতন হইতে হয় সতীর্থ সম্পাদক-গণ তাহা বিশেষভাবে অবগত আছেন। আমরা সখ করিয়া ইতিহাস লিখিতে যাই—ইংরেজীর অনুবাদে সে ইতিহাস পর্য্যবসিত হয়। ইতিহাস লিখিতে যে অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন আমাদের তাহা নাই। আন্তরিকতা ছাড়া সাহিত্য হয় না। অভাব-বোধ হইতে এই আন্তরিকতার জন্ম। মানব অনন্তের সন্তান, তাহার অভাব অনন্ত। আমি শারীরিক অভাবের কথা বলিতেছি না, শরীর ক্ষণবিধ্বংসী, তাহার অভাব যত কম হয় ততই ভাল। যে জাতি সভ্যতার যত নিম্নস্তরে অবস্থিত তাহার অভাবও তত অল্প। আমাদের অভাববোধ-হীনতা আমাদের জীবনের হীনতারই পরিচায়ক।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যসেবার অধিকারের যে যথোচিত ব্যবহার হয়

না, তাহার কারণ আমাদের অভাববোধ-হীনতা। শত অভাবের মধ্যে বাস করিয়াও আমরা অভাব বোধ করিতেছি না। আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মন্দ হইয়া গিয়াছে তাই আমাদের অনুসন্ধিৎসা কমিয়া গিয়াছে। এই কৌতূহল ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করিতে হইলে চতুর্দ্দিকে শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যক। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় সমগ্র জাতির তুলনায় সমুদ্রসমক্ষে গোস্পদবৎ। মাখনটুকু যেমন ঘোলের উপর উপর ভাসিয়া বেড়ায় আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় তেমনি সমগ্র জাতির মধ্যে নিতান্ত বিশ্লিষ্টভাবে ভাসিতেছেন। সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হইলে জাতিগতভাবে আমাদের জ্ঞানপিপাসা শিকড় গাড়িবার জমি পাইবে না, তাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার ন্যায় তরলতায়ই পূর্ণ থাকিবে। সুতরাং সারবান সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। সুখের বিষয় এই যে, সাহিত্য-সম্মিলন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করাকে স্বীয় উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। এই জনসাধারণের সম্পূর্ণ অর্দ্ধাংশ নারীজাতি। বঙ্গ সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে বঙ্গীয় সমাজে জ্ঞানবিস্তার করিতে হইবে। বড়ই দুঃখের কথা, এই নারীসমাজে জ্ঞানবিস্তার সম্বন্ধে বঙ্গীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায় নিতান্তই উদাসীন।

আপনারা ক্ষমা করিবেন, এই অপরাধে আমি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীদিগকেই প্রধানভাবে অপরাধী মনে করি। সাহিত্য-সেবকগণ হয়ত বলিবেন, "আমাদের অপরাধ কি এই, যে আমরা গ্রামে গ্রামে যাইয়া বালিকাবিদ্যালয়ের পত্তন আরম্ভ করি না?" না—তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কার্য্য রহিয়াছে, জনসাধারণের অন্তরে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত করা, ইহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া—এই কর্ত্তব্য প্রধানভাবে সাহিত্যসেবীদিগেরই। লেখকগণ সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন দেখি, জনসাধারণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যগ্র হয় কি না? নারীর উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আমি বি, এ, এম্ এ, পড়িবার কথা বলিতেছি না। আমাদের মনুষ্যত্ব, নারীত্ব যাহাতে পূর্ণরূপে বিকশিত হয় সেই শিক্ষাকেই আমি আমাদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা বলিতেছি। এ বিষয়ে যতক্ষণ আপনাদের মনোমত আয়োজন আপনারা করিতে না পারেন ততক্ষণ যে সকল নারী ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে বি, এ, এম্, এ-ই পড়িতে দিন, তাহার পথে যে

বাধা আছে তাহা দূর করুন। অনেকে হয়ত বলিবেন, "তাহা হইলে যে আমাদের মেয়েরা বিবি হইয়া যাইবে, বিকৃত হইয়া যাইবে। সে ভয়ের তেমন কোন কারণ আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। দক্ষিণ ভারতে যে সকল মহিলা বি, এ, এম্, এ, পড়িতেছেন, শুনিয়াছি তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারের সহিত অন্যান্য অল্পশিক্ষিতা নারীগণের আচার ব্যবহারের কোনই পার্থক্য নাই। বঙ্গদেশে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি—দেখি নাই, সুতরাং অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। নিজে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা আমাদের কোন বিকৃতি ঘটায় না। গৃহকার্য্যে অপ্রবৃত্তি জন্মায় না। যদি কাহারো অন্তরে সাময়িক বিকৃতি ঘটায়, আপনারা ভীত হইবেন না. হিন্দুনারীর হৃদয়ে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত এমন শক্তি—এমন Potentiality আছে যে বিকৃতি তাহাতে বেশী দিন টিকিতে পারে না।

সাহিত্য শুধু লিখিবার পড়িবার জিনিষ নহে, সাহিত্য ভোগেরও জিনিষ! গৃহকর্ম্মে সাহিত্য উপভোগ করা যায়, পরিবার-ধর্ম্মপালনে সাহিত্যিক জীবন যাপন করা যায়। স্বামীপুত্র ও আত্মীয় স্বজনের জন্য রন্ধন করিতে গেলে প্রীতির অমৃতরসে সে অন্নব্যঞ্জন অভিসিঞ্চিত হইয়া তাহাকে যেমন সুমিষ্ট করে, তেমনি তরকারী কুটিতে কুটিতে Botanyর (উদ্ভিদবিদ্যা) স্মৃতি, মৎস্য রাঁধিতে রাঁধিতে ইলিস মৎস্যের বংশবৃদ্ধির প্রণালী এবং চিংড়ি মাছ যে কোন্ বিশেষ জাতীয় জীব, মনে মনে তাহার আলোচনা রাঁধুনীকে কম আনন্দ দান করে না। এই সকল জ্ঞানে ব্যঞ্জনের মিষ্টতা না বাড়িতে পারে কিন্তু সন্তান মাতৃস্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহৃদয় ও মাতার মস্তিষ্করস পান করিয়া যে স্বীয় মস্তিষ্ক পুষ্ট করে এবং দেশের শক্তি বৃদ্ধি করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এই বিরাট সভায় এই সামান্য প্রবন্ধ পাঠ করা উচিত হইয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু দেশের এতগুলি সাহিত্যসেবীকে একত্র উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের একটা অতি প্রধান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহারা যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন নারীজাতির পক্ষ হইতে তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে হইল। এ দেশের সাহিত্যসেবিগণ, দেশের নায়কগণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য কিছুই করিতেছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা নারীদের ইংরেজী উচ্চশিক্ষায় আপত্তি করেন, পুরুষদের সহিত এক-

পাঠ্য পড়িতে দিতে আপত্তি করেন, কিন্তু যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে কি স্ত্রীশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাহার পাঠ্য-তালিকা দেখিলে মনে হয় এদেশে যেন নারীজাতির অস্তিত্বই নাই!

সাহিত্যের শক্তি, সাহিত্যের সঞ্জীবনী প্রভাব ও সাহিত্যসেবার গৌরব ও আনন্দ আমি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। বঙ্গনারীও মানুষ, তাঁহারা কেন জাতিগতভাবে এই আনন্দরসে, এই পবিত্র শক্তির অধিকার-লাভে বঞ্চিত থাকিবেন? এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার শক্তি আপনাদের আছে, তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন, আর সমগ্র জাতি তাহার ফলভোগ করিবে।

বঙ্গনারী যে সাহিত্যসেবা করিতে জানে, শ্রদ্ধেয় স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও মানকুমারী বসু প্রভৃতি বঙ্গমহিলাগণ আপনা-দিগকে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া পত্রযোগে অনেক সামান্য শিক্ষিতা বঙ্গনারীর সহিত পরিচিত হইয়া থাকি। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অভিযোগের কথা জানিতে পারি। তাঁহাদের মধ্যে দুএকজন এমন প্রতিভাশালিনী নারীর পরিচয় পাই, যে মনে হয় তাঁহারা যদি শিক্ষার সুযোগ পাইতেন তবে বঙ্গসাহিত্যকে, দেশকে গৌরবান্বিত করিতে পারিতেন, আমরা ধন্য হইতাম। হে বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণ, আপনারা আপনাদের গুরু কর্ত্তব্য স্মরণ করুন।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ভাষা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার বি এ, লিখিত।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষার ইতিহাস সংগ্রহে অনেকে যত্নশীল। উভয় বঙ্গের ভাষার তুলনা করিলে তাঁহাদের যত্ন অনেকদূর সফল হইতে পারে মনে করিয়া আমি পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের ভাষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এ স্থান বাঙ্গালার রাজধানী হইতে বহুদূরে এক প্রান্তে অবস্থিত, পশ্চিম-বঙ্গের ভাষা অপেক্ষা এখানকার ভাষায় বঙ্গভাষার প্রাচীন আকার অধিকতর পরিমাণে বর্ত্তমাণ থাকা সম্ভবপর।

কিন্তু এই প্রান্তবাস বশতঃ ইহা কর্ম্মক্ষেত্র ও সভ্যতার কেন্দ্র হইতেও

সরিয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য অধিবাসিগণের প্রকৃতিগত দোষ ইহার অঙ্গে লিপ্ত হইয়াছে। এই লেপনের নিম্নস্তরে ইহার পূর্ব্বাবয়ব অবলোকন করিতে হইবে।

আমি এস্থানের একজন অধিবাসী, সুতরাং আমাদিগের প্রকৃতিগত কি দোষ ভাষাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহা কতক কতক বুঝিতে পারি। সভ্যতা ও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে বাস হেতু আমাদিগের ব্যবহার অমার্জ্জিত এবং স্বভাব শিথিল; আমরা সময়ের মূল্য বুঝিনা এবং সহজে কোন কথার ভিতরে প্রবেশ করিতে ও করাইতে চাহিনা। এই সব কারণে (১) আমরা কোমল বর্ণস্থানে রুক্ষবর্ণ ব্যবহার করি, যথা, ক স্থানে গ, ট স্থানে ড; এবং চন্দ্রবিন্দু ও ম ফলা বর্জ্জন করি। (২) ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ কালে আমাদের উচ্চারণ যন্ত্রের পরস্পর আঘাত অপেক্ষাকৃত কোমল হয়; যথা চ বর্ণ স বা Sএর ন্যায় এবং জ বর্ণ Zএর ন্যায় উচ্চারিত হয়। কোন কোন বর্ণ হকারের ন্যায় এবং হকার অকারে পরিণত হয়। (৩) আমাদিগের শব্দ সকল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ. যথা, করূর—কর্‌বাম্। (৪) শব্দের ও বাক্যের যথাস্থানে জোর প্রয়োগ হয়না, যথা; কি কর?-কি কর? এই শেষ দোষটাই প্রধান দোষ এবং আমাদের বাঙ্গালত্বের প্রধান লক্ষণ মনে করি।

গৃহরহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি মনে করিয়া আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন ভাষাতে কোন দোষ থাকিতে পারেনা। দোষ বক্তার। লিখিত ভাষার ন্যায় কথিত ভাষাও মনোগত ভাব প্রকাশের সঙ্কেত মাত্র। ভাষায় সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়। জ্ঞান, বুদ্ধি, ও সভ্যতার উন্নতি হইলে ভাষা আপনিই উন্নীত হইবে। পশ্চিম বঙ্গের ও আমাদের কথিত ভাষার চিরকালই পার্থক্য থাকিবে। তাহা বাঙ্গালত্বের কারণ হইতে পারে না। স্কচ ও ইংরেজের কথিত ভাষার পার্থক্য আছে বলিয়া একে অপরকে বাঙ্গাল মনে করেন না।

বিভক্তিই ভাষার প্রাণ। ইহা এক ভাষাকে অন্য ভাষা হইতে পৃথক করে। "থিয়েটারে অ্যাক্‌ট্রেসগণের নৃত্যদর্শনে সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন।" এই বাক্যে ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষার শব্দই আছে। অথচ বিভক্তিগুণে বাক্যটি বাঙ্গালা ভাষা। অতএব আমরা নিম্নে প্রথমতঃ বিভক্তির আলোচনা করিতেছি।

শব্দ বিভক্তি।

বহুত্ববাচক বিশেষ্য পদ কিম্বা তাহার সঙ্কুচিত আকার বহুবচন বাচক বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে বোধ হয়। যথা—গণ, সকল, সমস্ত, গুলিন। 'দিগ' বোধ হয় 'দিক'-শব্দ। আমাদিগের=আমার দিকের, আমার পক্ষের। 'রা' বিভক্তির পূর্ব্বাবয়ব নির্ণয় করা কঠিন।

১। পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় আমাদের বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের বহুবচনে 'দিগ' বা 'দের' প্রয়োগ হয় না। তৎস্থানে 'রা' প্রযুক্ত হয়। যথা, আম্‌রা, তুম্‌রা।

২। সর্ব্বনাম বহুবচনের রূপ।

১মা। আম্‌রা। তুম্‌রা, তরা, আপ্‌নেরা। তারা, তানারা।

২য়া। আম্‌রারে। তুম্‌রারে, তরারে, আপনেরারে। তারারে, তানারে।

৩য়া। আম্‌রারে দিয়া। তুম্‌রারে দিয়া, ইত্যাদি—

৪র্থী। ২য়া বৎ

৫মী। আম্‌রার থাকিয়া। তুম্‌রার থাকিয়া, ইত্যাদি।

৬ষ্ঠী। আম্‌রার। তুম্‌রার, ইত্যাদি।

৭মী। আম্‌রারে বা আম্‌রার মধ্যে।

৩। বিশেষ্য শব্দের প্রথমাদি বিভক্তির প্রায় উপরি-উক্তরূপ ঈষৎ পার্থক্য আছে। যথা—

মানুষ শব্দ।

	এক বচন।	বহুবচন।
১মা।	মানুষ	মাইন্‌ষেরা
২য়া।	মানুষরে, মাইন্‌ষেরে	মাইনষেরারে
৩য়া।	মানুষ দিয়া মাইন্‌ষেরে দিয়া	মাইন্‌ষেরারে দিয়া
৪র্থ।	দ্বিতীয়াবৎ	
৫মী।	মানুষের থাকিয়া মাইন্‌ষের থাকিয়া	মাইন্‌ষেরার থাকিয়া
৬ষ্ঠ।	মানুষের, মাইন্‌ষের	মানুষরার মাইন্‌ষেরার

৭মী। .মাইন্নষ, মান্নুষ (অকারান্ত)
মাইন্‌ষে, মান্নুষে
মাইন্‌ষের মধ্যে, মান্নুষের মধ্যে } মান্নুষ্‌রার মধ্যে
মাইন্‌ষেরার মধ্যে

৪। মনুষ্য ও দেবতা বাচক পদের বহুবচনে 'রা' প্রয়োগ হয়। যথা—দেব্‌তারা, পণ্ডিতেরা, প্রজারা।

৫। ইতরপ্রাণী ও অচেতন পদার্থবাচক শব্দের বহুবচনে 'গুলাইন' (গুলিন) বা 'গুলাক' প্রত্যয় হয়। যথা, গরুগুলাইন, গাছগুলাইন, বাক্সগুলাক।

৬। স্বরান্ত শব্দের ৫মী দুইরূপ। যথা,—গাছ (অকারান্ত) থাকিয়া, গাছের থাকিয়া।

৭। সপ্তমীতে 'অ', 'এ', 'ৎ', 'মধ্যে' এই কয়েকটী প্রত্যয় হয়। যথা—
অ প্রত্যয়—ঘর (সে ঘর নাই)।
এ প্রত্যয়—ঘরে (ঘরে দুয়ারে পড়ছে)।
ৎ প্রত্যয়—পুষ্কনিৎ (পুষ্কনিত্‌মাছ নাই)।
মধ্যে প্রত্যয়—(সম্পর্কের মধ্যে মাম।)।

৮। বহুবচন বাচক গুলিণ শব্দ 'গুলাইন' এবং গুলাইন সঙ্কুচিত হইয়া 'আইন' হয়, যথা—ছেড়া(ছেড়া)গুলিন=ছেড়া গুলাইন = ছেড়াইন্‌। বেডা(বেটা)গুলিন=বেডা গুলাইন = বেডাইন্‌। এইরূপ—বেট্টিয়াইন, পুলাইন, মাগ্‌গিয়াইন।

ক্রিয়া বিভক্তি।

১। সর্ব্বনাম শব্দ সকল সঙ্কুচিত হইয়া ক্রিয়া বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে বোধ হয়। তাহার কালবাচক অংশ অস্ (আছ), নী (লী), 'ভূ' ধাতু এবং 'ক্ত' বিভক্তি দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকা সম্ভব।

২। সর্ব্বনাম শব্দ সকলের রূপান্তর নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

সংস্কৃত	হিন্দী	পূর্ব্ব ময়ময়মনসিংহ	পশ্চিম বঙ্গ
অহম্‌	হাম্‌	আমি	আমি, মুই
ত্বম্‌	তুম্‌, তুহু, তুহি, তুহ	তুমি, তুইন	তুমি, তুই
সঃ	সো	হে, হেই, হি	সে, সেই
তদ্‌	—	তাইন্‌	তাহা, তিনি

৩। অস্ (অছ বা আছ) ধাতুর রূপ—

উত্তম পুরুষ	পূর্ব্ব ময়মনসিংহ	পশ্চিম বাঙ্গালা
আছ+মুই—আঁছুই	আছি	আছি
আছ+লী+হাম	আছ্লাম	ছিলাম
আছ+তুহ=আছহ	আছ	আছ
আছ+লী+তুহি=আছিলিহি	আছিলি, আছিলা	ছিলে, ছিলা
প্রথম পুরুষ—		
আছ+হে=আছহে	আছে	আছে
আছ+লী+হে=আছলী হে	আছিল	ছিল

৪। ভূ ধাতুর রূপ—

উত্তম পুরুষ		
ভূ+মুই=হুঁই	হই, অই	হই
ভূ+লী+হাম্	হইলাম, অইলাম	হইলাম
ভূ+ক্ত+হাম্	হইতাম, অইতাম	হইতাম
ভূ+হাম	হইবাম, অইবাম	হইব
ভূ+মুই	অইমু (পশ্চিম ময়মনসিংহ ও বিক্রমপুর)	
মধ্যম পুরুষ।		
ভূ+তুহ=হউ	হও, অও	হও
ভূ+লী+তুহি=হইলি হি	হইলি,হইলা,অইলি,অইলা	হইলি,হইলে
ভূ+অহ+তুহি=হইছহি	হইছিস, হইছ, অইছিস, অইছ	হচ্ছিস,হ'চ্ছ
ভূ+ক্ত+তুহি=হইতহি	হইতা, অইতা	হতিস, হোতে
ভূ+তুহি=	হইবি, হইবা	
ভূ+উহি=ভবহি=হবই, অবই	অইবি, অইবা	হইবি, হবে
প্রথম পুরুষ।		
ভূ+হি=হয়ই	হয়, অয়	হয়
ভূ+লী+হি=হইলী	হইল, অইল	হইল
ভূ+অছ+হে	হইছে, অইছে	হ'য়েছে
ভূ+ক্ত+হি =হইতই	হইত, অইত	হতো
ভূ+হাম	হইবাম্, অইবাম্	হইবে, হবে

৫। কৃ-ধাতুর রূপ (ময়মনসিংহের) ভূধাতুর ন্যায় সাধিতে হইবে। যথা,---

উত্তমপুরুষ।

বর্ত্তমান { কৃ+মুই=করুঁই=করি
কৃ+লী+হাম=করিলাম

ভূত { কৃ+অস+মুই=কর্‌ছি
কৃ+অস+লী+হাম=কর্‌ছিলাম
কৃ+ক্ত+অস+লী+হাম—কর্‌তেছিলাম।
কৃ+ক্ত+হাম=কর্‌তাম

ভবিষ্যৎ { কৃ+ভূ+অহম্=কর্‌বাম্
কৃ+মুই=কঁর্‌মু (পশ্চিম ময়মনসিংহ)
কৃ+হাম=করুম্ (বিক্রমপুর)

মধ্যম পুরুষ।

বর্ত্তমান কর, করছ, কর্‌লা, কর্‌লে।

ভূত—করছ, করছ্ছ, করছিলা, করছিলে, কর্ত্তাছ্‌লা, কর্ত্তাছ্‌লে, কর্‌তা, কর্‌তে।

ভবিষ্যৎ—করবা, করবে।

প্রথম পুরুষ।

বর্ত্তমান—করে, করলো।

ভূত—কর্‌ছে, কর্‌ছিল, কর্‌তাছিল, করতো।

ভবিষ্যৎ—কর্‌বো।

৬। সম্মানার্থে মধ্যম পুরুষ-

	পূর্ব্বময়নসিংহ,	পশ্চিম বঙ্গ
কর্‌+তিনি=কর্‌+তাইন=কর্‌+আইন	করইন	করেন

এইরূপ কর্‌ছইন, করলাইন, করছিলাইন, কর্ত্তাছ্‌লাইন্, কর্ত্তাইন, কর্‌বাই।

৭। সম্মানার্থ প্রথম পুরুষ

	পূর্ব্ব ময়মনসিংহ,	পশ্চিম বঙ্গ
কর্‌+আপনি=কর+আইন—	করইন	করেন

অন্যান্য কালেও মধ্যম পুরুষের ন্যায়।

৮। তুম স্থানীয়তে প্রত্যয়ান্ত পদ ভূতকাল বাচক ক্ত-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পদের ন্যায় রূপান্তরিত হয়। যথা—

উত্তম পুরুষ—আমি কর্ত্তাম পারি।

মধ্যম পুরুষ—তুমি কর্ত্তাপার, আপনে কর্ত্তাইন পারইন।

প্রথম পুরুষ—হি কর্ত্তাপারে, তাইন কর্ত্তাইন পারইন্।

৯। না যোগে ভূতকাল বাচক ক্ত-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ ভবিষ্যৎকাল-বাচকরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—

উত্তম পুরুষ—আমি কর্ত্তাম্না = আমি করবোনা।

মধ্যমপুরুষ—তুমি কর্ত্তানা = তুমি করবে না।

প্রথমপুরুষ—হি কর্ত্তোনা = সে করবেনা।

আমার বোধ হয় এই ক্রিয়াপদগুলি বাস্তবিক ক্ত-প্রত্যয়ান্ত নহে। ইহারা 'তুম্' প্রত্যয়ান্ত।

আমি কর্ত্তাম্না = অহম্ কর্ত্তুং ন (ইচ্ছুকঃ)।

আমার করবার ইচ্ছা নাই।

তুমি কর্ত্তানা ? = তোমার কি ইহা করবার ইচ্ছা নাই ?

বর্ণের উচ্চারণ।

১। আমরা ৫টি স্বরবর্ণ ব্যবহার করি—অ, আ, ই, উ, এ।

২। ঊ, ঈ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ,র ব্যবহার নাই। 'এ'কার অধিকাংশ স্থলেই 'Bat' শব্দ মধ্যস্থ a বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—নে, কেবল, এবং, হাতে, করে, দেখে। ক্বচিৎ ate শব্দস্থ a বর্ণের ন্যায় হয়। যথা দে, কে।

৩। ওকার সর্ব্বত্রই উকারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা—চুর, দুষ।

৪। ঐ = অই। ঔ = অউ। কৈবর্ত্ত = কইবর্ত্ত। ঔষধ = অউষধ।

৫। ঋ স্থানে 'ইর' হইয়া উচ্চারিত হয়। যথা—মৃদঙ্গ = মির্দ্দঙ্গ। ঘৃত = ঘির্ত্তি, নৃত্য = নির্ত্তি।

৬। বর্ণের পরবর্ত্তী ই, উ সময় সময় আগে যায় যথা—যিনি = যাইন। তিনি = তাইন। ঠাকুরাণী = ঠাউকুরাইন (পশ্চিম ময়মনসিংহ ও বিক্রমপুরে 'ঠাইকুরাইন)।

৭। পশ্চিম বঙ্গের আকারস্থলে স্থলবিশেষে একার হয়। যথা পাঁচ=পেচ। বাঁকা=বেকা। টাকা=টেকা। ফেলান=ফালান।

৮। শব্দশেষে স্বরান্ত ক খ জিহ্বামূল ও কণ্ঠ কোমল ভাবে সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়, কখনো বা, বিশেষতঃ পশ্চিম ময়মনসিংহে, সংযুক্ত না হইয়া সম্পূর্ণ হ-কারের ন্যায় হয়। যথা—কাকা=কাহা। টাকা=টেহা, দেখা =দেহা। পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ক অর্দ্ধ উচ্চারিত হয়, পশ্চিম ময়মনসিংহে একেবারেই হ-কারের ন্যায় হয়।

৯। শব্দান্তে ক সময় সময় গ-বৎ হয়। যথা—ঠক=ঠগ, বক=বগা।

১০। ঘ প্রায় গ তুল্য কিন্তু জোর দিতে হয়। যথা—ঘাম=গাম্, ঘট=গট, ঘোড়া=গূরা। স্বরবর্ণ 'ঘ'র পরে থাকিলে পূর্ব্ব স্বরে জোর পড়ে।

যথা—বাঘ=বাগ।

১১। চ, ছ, জ, ঝ প্রায় দন্ত্যবর্ণ। ইহারা তালু ও দন্তের মধ্যস্থানে জিহ্বার কোমল আঘাতে উচ্চারিত হয়। চ=সংস্কৃত স বা ইংরেজী s। জ=ইংরেজী z।

১২। শব্দান্তে স্বরযুক্ত ট=ড। যথা বেটা=বেডা, পিঠা=পিডা, বট=বড।

১৩। শব্দারম্ভে ঢ প্রায় ড কারের ন্যায়। কিন্তু জোর দিতে হয়। যথা ঢাক=ডাক, ঢোল=ডুল।

১৪। ড় এবং ঢ় কার র-কারের ন্যায়। যথা পড়া=পরা, আষাঢ়=আষার।

১৫। ধ-কার (বিশেষতঃ দীর্ঘস্বরান্ত) প্রায় দ তুল্য। কিন্তু জোর দিতে হয়। যথা—ধান=দান, ধর=দর।

১৬। প অধর ওষ্ঠাপেক্ষা অগ্রসর করিয়া কোমল চাপ দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। ফ স্পষ্টতঃ দন্তোষ্ঠ।

১৭। ভ (বিশেষতঃ দীর্ঘস্বরান্ত) প্রায় ব-কারবৎ। কিন্তু জোর দিতে হয়। যথা—ভাত=বাত, ভয়=বয়।

১৮। চন্দ্রবিন্দুর ও ম-ফলার উচ্চারণ নাই। অনুস্বার স্থানীয় চন্দ্রবিন্দু একদা লোপ হয়। ন স্থানে চন্দ্রবিন্দু না হইয়া অধিকাংশ স্থলে 'ন' ই থাকে। যথা—পদ্ম=পদ্দ, হাঁস=হাস, বাঁশ=বাশ, চাঁদ=চান্দ, বাঁদর=বান্দর, কাঁধ=কান্ধ।

কিন্তু দাঁত = দাত, কণ্টক = কাটা বা কাডা, বণ্টন = বাডন বা বাটন।

১৯। শ, ষ, স অনেক স্থলে হ-কারবৎ হয়, কিন্তু সকল স্থানে নয়। যথা—সলা = হলা, ষাঁড় = হার, সাধা = হাদা, শসা = হসা, বসো = বহ = বও।

২০। হ অনেক সময় অ-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা—হরিণ = অরিণ, হাত = আত।

২১। আ-কারের পরস্থিত ই-কারান্ত ত দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যথা—হাতি = আত্তি। লাথি = লাত্থি।

২২। অসমাপিকা ক্রিয়া-বিভক্তি য়া যোগে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব হয়। যথা—থাকিয়া = থাক্কিয়া, দেখিয়া = দেক্কিয়া।

২১। র-ফলা 'অর' হয়। যথা—ঘ্রাণ = ঘোরণ, ব্রজ = বর্জ, প্রত্যয় = পর্ত্তয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আর অধিক আলোচনার স্থান নাই। নিম্নে একথার প্রচলিত কতকগুলি শব্দের নির্ঘণ্ট প্রদান করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। সুধীগণ অন্যান্য স্থানের প্রচলিত শব্দের সহিত ইহাদের অবয়বাদি তুলনা ও আলোচনা করিয়া বঙ্গভাষার ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য পাইতে পারেন। আমরা দেখিয়াছি অসংখ্য ক্রিয়া-পদ ও তন্নিষ্পন্ন শব্দ, মনুষ্যদেহ, রক্তগত সম্পর্ক, সামাজিক ক্রিয়া কলাপ, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় এবং বৃক্ষ, ফল ও পুষ্পাদির নাম বাচক শব্দে পশ্চিমবঙ্গ ও এ স্থানের শব্দ মধ্যে প্রকৃত প্রভেদ অধিক নহে, উচ্চারণের পার্থক্যজনিত প্রভেদই অধিক।

কিন্তু ইতর প্রাণীর নাম, পর্ণ গৃহের অংশাদির নাম এবং মৃত্তিকা ও বংশাদি নির্ম্মিত সাধারণ বস্তুর নামবাচক শব্দে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়; কৃষি সম্বন্ধীয় অল্প যে কয়টী যন্ত্র আছে তাহার নামে বিশেষ প্রভেদ নাই।

১। কয়েকটী সংস্কৃত-মূলক শব্দ—

কইতর = কবুতর।
উন্দুর = ইঁদুর।
আব (আভ) = অভ্র, মেঘ।
রশি = দড়া।
পুত = পুত্র।
আবুদিয়া, আবু = শিশু, অবোধ।
জিগীসা = হিংসা।
বরই = বদরী।
বাস্না (বাসনা) = স্নেহ, ভালবাসা।
বাসা = (১) পছন্দ করা যথা—এই জায়গা কেমন বাস।
(২) বোধ করা। যথা—শরীরটা কেমন বাস।
পুছুন = জিজ্ঞাসা করা।

পিন্দন = পরা।
হিনান = স্নান।
হিথান = শিরঃস্থান।
পৈথান = পদস্থান।
মিরদারা = মেরুদণ্ড।
বিচরান্ = অনুসন্ধান করা।
মাঞ্জন = মার্জ্জন।
হামান (সমায়ণ) = প্রবেশ করা।
যথা বিদ্যাপতি—"তোহে জনমিপুনঃ তোহে সমাওত"
গতর = গাত্র।
ধলা = ধবল।

২। জীবজন্তুর নাম—

বিলাই, মেকুর = বিড়াল।
বাতারি = নেংটিয়ে।
খাডাস (খাটাস) = খেকশেয়ালী।
গুইল = গোসাপ।
আরইল = টিকৃটিকী।
হাপেরমই (সাপের মাসী) = গিরগিটী।
ওয়াপ = বণ্যবিড়াল।
লঙ্গর (লন্দর) = গন্ধ গোকুল।
হেজা = শজারু।
দামড়া = যুবক বলদ।
ডেকা = ষাঁড় বাছুর।
চিকা = ছুঁচো।
তেলচুরা = আরসুলা
বিথা = সুয়া।
হাপচালা = বিছা।
জির = কেঁচো।
অরজিন্নি = আজ্জুনি
উরস্ = ছারপোকা।
কডা (কটা) = কাঠবিড়াল।
মান্দাইল = বড় পিপীলিকা।
বাথাল্লিয়া = হাঁড়োল।
ঢুপি = ঘুঘু।
কুলি = কোকিল।
কাউয়া = কাক।
কুরুয়া = উৎক্রোশ।
কুরা = কুররী।
বলা = বোলতা।
ইচা = চিংড়ি।
রউ = রোহিত।
ভাঙ্গনা, লাচ, ধুরুয়া = বাটামাছ।
গুল্শা = পাট টেংরা।

৩। ব্যবহার্য্য জিনিষ—

কাঁসা পিতলের।

ঝারি = গাড়ু।
খুরা = বাটি।
আবখুরা = ছোট ঘটী।
লুডা = ঘটি।

মাটির।

ডকি = বড় পাতিল।
ভেটুয়া = ছোট পাতিল।
রাইড্ = গোয়ালার বড় হাঁড়ি বিশেষ
ভার = ছোট কলস।
মুছি = প্রদীপ, কটরা।

বাঁশের।

আগইল = চেঙ্গারি।

বিচুন = পাখা।
মাতলা (পাতলা) = টোকা।
ঝাইল = পেটরা বিশেষ।
বাইর = ঘুনি।
পল = পলুই।
জুলুঙ্গা = খাঁচা বিশেষ।

রান্নাঘরের।

চৌকা = চুলো।
শিল = নোড়া।
পাডা (পাটা) = শীল।
হাচুন = তৃণের ঝাঁটা।
দরম = চাঁচ।

৪। পর্ণ গৃহের অঙ্গ—

থাপ = বাকারি।
খাম, পালা = খুঁটি।
উসারা = বারান্দা।
দাইর = গাও দেয়াল।
কুর = পাটি।
পাইর, মারুল = পাড়।
আন্দারুয়া = ছিটুনি।
ভেল্কি = ঝাঁপ।
ছেইক্কা = ছাঁইচ।
গজ = আড়, পাশ।
ভেজা = ঠেকা।
ঠাউকুরা = মুট।

৫। ফল, তরকারী

সবরি আম = পেয়ারা।
কুডুরা = ডুমুর।
ভুবি = লটকা।
আমলি = তেঁতুল।
বিলাতি লাউ = কুমড়া।
ডেফল = মান্দার।
থরুরা = মোচা।
মুচা = থোড়।
বাইঙ্গন = বেগুন।
লচ্চিয়া = বরবটী।
ডেঙ্গা = ডাঁটা।
উজ্‌কিয়া = উচ্ছে।
করল্লা = করলা, উচ্ছে।
ছিমুর = সীম।
পুরল = চিচিঙ্গা।

৬। দেহ সম্বন্ধীয়।

গতর = গাত্র।
ঠেঙ্‌ = পা।
ছেপ = থুথু।
লগ্‌গি = প্রস্রাব।
জরুয়া = প্লীহা।
ফুল্‌সা = ফুস্‌ফুস্‌।
পাত = যকৃত।
আতুরি, ভুহুরি – আঁত।
ঘিলা = মুত্রাশয়।
বাউ = বাহু।
গরদনা, ঘার = ঘাড়।
জিব্‌বা – জিহ্বা।

৭। সম্পর্ক।

বাপ, বাপা, বাবা = পিতা
মা, মাইয়া = মাতা।
বইন = ভগ্নী।
দুদু – দিদিমা।
মই, মসী = মাসী।

ছেরা, পুলা, পুত = ছেলে, পুত্র।
ছেরি, পুরি, বেডি, মাইয়া = কন্যা।
পুতি = প্রপৌত্র।
চেংরা পেংরা
আবুদাবুদ } = ছেলেপিলে।
হতাল বাই = বিমাতা পুত্র।
পুংড়া = জারজ।

৮। বিশেষণ।

ডাইয়া = ঠাণ্ডা।
বাডি (বাটি) = বেটে।
ঢেঙ্গা (লম্বা) = লম্বা।
অবগু = অশ্লীল।
আবাত্তিয়া = পেটুক।
বাদামিয়া (ভাদামিয়া) = ভবঘুরে।
আৎকা = হঠাৎ।
শক্তে = জোরে।
বাস্কা = সুন্দর।
হাট্‌কালা — কালা।
দুরাবি, দুর = দুর।
ফার = চৌড়া।
ফারাগ = ফাঁক।
বারাত = নিকট।
আবাত্তি = কাঁচা।
করাচ্চিয়া, বাত্তি = বাত্তি।
উবৎ = উল্টা। উপরের দিক নীচে।
আচাব্বুয়া = সামান্য ধনে গর্ব্বিত।
ছেরাবেরা = ছিন্নবিচ্ছিন্ন।
ঠন্‌ঠনাঠন্ = শব্দ মাত্র সার; সার শূন্য
সিদা (সিধা) = সোজা।
ধলা = ধবল, শাদা।
আলিসান = বৃহৎ, মহৎ।
লেংড়া = খোঁড়া।
টালক = ঠাণ্ডা।
টেল্লা = শিথিল, বোকা।
টেড়া = আড়নয়ন।
ডাট, দড় = দৃঢ়।
কুইয়া—পচা।
চিক্কণ = সরু।
বেবাক, তাবত = সকল।

৯। ক্রিয়াপদ।

কাজিয়াকরা = বিবাদকরা, কলহকরা
ফালপায়া = লাফ দেওয়া।
ডেওল = ডিঙ্গান।
হুঙ্গন = ঘ্রাণ লওয়া।
আঙ্গুর দেওয়া = হামাগুড়ি দেওয়া।
খাজুয়ান্ = চুলকান।
খামছান = নখে আঁচড়াণ।
কচলান = হাতে মর্দ্দন করা।
ধাফরাণ = ছট্‌ফট্ করা।
বেদামারা = লাথিদেওয়া।
ঠিস্‌করা = ঠাট্টাকরা।
বাইৎ করা = বমিকরা।
হুতন (সুতন) = শয়ন করা।
ঘুরন = ঢাকা।
খারা হওয়া = দাঁড়ান।
চুবান = জলে নিক্ষেপ করা।
ভেংচান = কথার অনুকরণ করিয় উপহাস করা।
হুইদকরা = সুধান, জিজ্ঞাসা করা।
(দোয়ার) খাটা = বন্ধ করা।

আস্কারা করা = খোলাসা করা

ডিগরা দেওয়া, হাচার দেওয়া } = পশু খোঁট দেওয়া

বাছন = নিড়েন।

দাওন = (ধান্যাদি) কাটা।

চিপন = নিঙড়ান।

১০। সাধারণ।

মেঘ = বৃষ্টি।

ডুগা = আগা।

বদ্‌নাম = দুর্নাম।

অয়রান্ (অরণ্য) = লোকশূন্য।

বউল = মুকুল।

চম্ফ = দন্ত।

কিচকিয়ামি = দুষ্টামি।

পতাকর সময় = প্রভাতের পূর্ব্ব।

বিয়ান = প্রভাত।

তেপরিয়া, সেপরিয়া = তৃতীয় প্রহরের; বিকালের।

হাঞ্জাকাল = সন্ধ্যাকাল।

জুকার (জয়কার) = উলুধ্বনি।

উষ্টা — উছট।

গিরিম্বারি = ঔদ্ধত্য।

পাজন = শলা

বন্দ = মাঠ।

বিচ্‌রা = বাড়ীর সংলগ্ন ক্ষেত্র।

উডান (উঠান) = আঙ্গিনা।

ঢক = গঠন।

ঠাডা = বজ্র।

আডেলা = সমারোহ।

ঠাট্ = জাক জমক।

বুগুইল, থইল্লা = থোলে।

দুঃখু = ব্যথা।

লাগিল্, লাগ্‌গিয়া = জন্য।

মাডা (মাঠা) = ঘোল।

হৎকাল (সৎকাল) = পুরাতনকাল

ব্যাকরণ-বিভীষিকা।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্,এ,-লিখিত।

উপক্রমণিকা।

মুখবন্ধ।

রঙ্গরস অনেক করিয়াছি। আজ একটা কঠিন প্রশ্নের আলোচনা করিব। কিন্তু সম্প্রতি রঙ্গরচনার জন্য বর্ত্তমান লেখকের নামটা যৎকিঞ্চিৎ জাহির হইয়া পড়িয়াছে, গম্ভীরভাবে কোন প্রশ্নের উত্থাপন করিলে তাঁহার শুনানি পাওয়াই শক্ত। তিনি যাহা বলিতে যাইবেন, তাহা 'পরমার্থ' হইলেও

সকলে 'পরিহাস' বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আজ সত্য সত্যই একটা গুরুতর কথা পাড়িব। এবার আর হাসির ফোয়ারা নহে, ব্যাকরণের সাহারা। যদি দুই এক স্থলে আপনাদের ফোয়ারা-ভ্রান্তি হয়, তাহা হইলে জানিবেন উহা 'মায়াবিনী মরীচিকা' বই আর কিছুই নহে।

বিষয়-নির্দ্দেশ।

যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ, অপভ্রংশরূপে নহে, অবিকৃতভাবে বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে সেগুলি কোন ব্যাকরণের শাসনে আসিবে, এই প্রশ্নটি আজ আপনাদের নিকট উত্থাপন করিতেছি।

প্রথম পক্ষের যুক্তি।

বাঙ্গালা সাধুভাষার ব্যাকরণ লইয়া দুইটা দল আছে। দুইটাই প্রবল দল। দুই পক্ষই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিতে চাহেন। এক দলের মতে, যাহা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণবিরুদ্ধ, তাহা বাঙ্গালা সাধু-ভাষাতেও অপপ্রয়োগ; কেন না, সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালা ভাষার জননী (বা মাতামহী)। 'খাঁটি বাংলা' শব্দের বেলায় লেখকগণ যা' খুসী করিতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃত শব্দের বেলায় এরূপ যথেচ্ছাচারে তাঁহাদিগের অধিকার নাই। সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দগ্রহণ করিয়া সেগুলির উপর একটা উদ্ভট-ব্যাকরণের রুলজারী করা নিতান্ত অত্যাচার; কথায় বলে, 'যা'র শিল তা'র নোড়া, তা'রই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া'। [লাটিন, গ্রীক বা হিব্রু হইতে যে সমস্ত শব্দ অবিকল ইংরাজীতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বেলায় ইংরাজীতে কি নিয়ম খাটান হয়? Seraph, cherub, datum, erratum প্রভৃতি শব্দের বহুবচন, superior, inferior, প্রভৃতি শব্দের পরে appropriate preposition, ইত্যাদি ব্যাপারে ইংরাজীর সাধারণ নিয়ম চলে কি?] ফলতঃ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যেমন তাঁহার চতুষ্পাঠীর প্রবেশদ্বারে এই বাক্য ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, 'জ্যামিতি-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইয়া যেন কেহ এখানে দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে না আসে।' 'সংস্কৃত ব্যাকরণে অধিকার লাভ না করিয়া যেন কেহ বাঙ্গালা সাধু ভাষার চর্চ্চা করিতে না আসে'। ইঁহাদের আশঙ্কা, বাঙ্গালা রচনায় একটু শিথিলতার প্রশ্রয় দিলে সংস্কৃত রচনা পর্য্যন্ত দূষিত ও অধোনীত হইবে। এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলকও নহে, কেননা, অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে গিয়া বাঙ্গালা প্রয়োগের অনুযায়ী

প্রয়োগ করিয়া বসেন দেখিয়াছি। ছাত্রেরা ত সংস্কৃত রচনায় এরূপ ভুল প্রায়ই করে।

দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি।

অপর দলের মত, বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যেমন রসায়নিকের বিবেচনায় ঘি ও চর্ব্বি একই পদার্থ, সেইরূপ সংস্কৃত বৈয়াকরণের বিবেচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা একই পথার্থ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল-প্রভেদ। বাঙ্গালা ভাষা স্বেচ্ছায় ও স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ব্যাকরণ গড়িয়া লইয়াছে ও লইতেছে, কেন না ইহা জীবন্ত ভাষা। ইঁহারা আরও বলেন, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতভাষার কন্যা (বা দৌহিত্রী) নহে, কনিষ্ঠা ভগিনী। বাঙ্গালা ভাষা কোন দিন সংস্কৃতভাষার চালে পরচালা বাঁধিয়া বাস করে নাই, এখনও করিবে না। ইহা কুটীরবাসিনী হইতে পারে, কিন্তু ইহা চিরদিনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখায় কোনও ফল নাই। যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকল বাঙ্গালায় ব্যবহৃত, তাহারা যখন বাঙ্গালা মুল্লুকে আসিয়া বসবাস করিতেছে, তখন তাহারা বাঙ্গালার আইন কানুন মানিতে বাধ্য। তাহাদিগের মূলভাষার আইনকানুন এ ক্ষেত্রে চলিবে কেন? When you are in Rome, do as the Romans do; শাস্ত্রে, আছে "প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।" [গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ভাষা হইতে শব্দ লইয়া ইংরাজী ভাষায় তাহাদিগের বহুবচন, প্রত্যয়, বা উপসর্গ যোগ করিবার সময় মূলভাষার নিয়ম রদ হয় না কি? Geniusএর বহুবচন Geniuses, : Genii, দুই প্রকার হয়, তবে অর্থভেদ আছে; radius, focusএর বেলায় দুইরূপ হয়, কোন অর্থভেদ নাই। এক ভাষার শব্দে অন্য ভাষার প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে (hybrid word) দোআঁশ্‌লা-শব্দ-নির্ম্মাণও হয়।] ফলকথা, ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতব্যাকরণের ভেজাল চাহেন না। বিশ্বামিত্র যেমন ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎ ছাড়িয়া দিয়া একটা নূতন জগতের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ একটা অভিনব ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। ইঁহারা আরও বলেন যে, সকল আধুনিক ভাষারই জটিলতা কমিয়া সরলতার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়, বাঙ্গালার বেলায়ই কেন তাহার অন্যথা হইবে? ভাষা-শিক্ষার্থী শিশু ও বিদেশীর শ্রমলাঘবের জন্য ভাষা সহজ করার চেষ্টা আবশ্যক, তাঁহারা কেহ কেহ এ যুক্তিরও অবতারণা করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের আর একটি যুক্তি ও তাহার বিচার।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে আবার এক সম্প্রদায় আর একটা যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা ভাষা এখনও শিশু, এখন হইতেই ইহাকে ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধিলে ইহার স্বাভাবিক গতিশীলতা ও সহজ স্ফূর্ত্তি নিরুদ্ধ হইবে। লেখকসম্প্রদায়কে পদে পদে বাধা দিলে প্রতিভার বিকাশ হইবে না। ইহার ফলে আমরা অনেক প্রতিভাশালী লেখক হারাইব, 'জননী বঙ্গভাষা' দরিদ্র হইয়া পড়িবেন। বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞ অভিভাবকগণ ইহার উত্তরে বলেন, শিশুর উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান নহে কি? শৈশবে সংশোধন না করিলে শেষে যে রোগ মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইবে। পাছে লেখক-সংখ্যা কমিয়া যায় এই আশঙ্কায় ব্যাকরণের নিয়ম শিথিল করা, ও পাছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যায় এই আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আদর্শ খর্ব্ব করা, দুই-ই একপ্রকারের কথা।

বাঙ্গালা ভাষা এখনও শিশু, এ কথাটা আমি অনেকবার অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু ঠিক অর্থপরিগ্রহ করিতে পারি নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে শিশু বলেন, তাঁহাদিগের বোধ হয় বিশ্বাস, মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার পুষ্টি করিয়াছেন; অর্থাৎ, ইংরাজের আমলে ও ইংরাজী শিক্ষার ফলেই এই ভাষার উদ্ভব। ব্রাহ্মাব্দ দেখিলেই এই নবপ্রণীত ভাষার বয়ঃক্রম জানা যায়। কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষা কি এতই অর্ব্বাচীন? সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন না হইলেও বাঙ্গালায় ইংরাজের শুভাগমনের বহুশতবৎসর পূর্ব্ব হইতে বিরাট্ একটা বাঙ্গালা সাহিত্য যে ছিল, তাহা চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি খাঁটী বাঙ্গালী কবিগণের কীর্ত্তিতে স্বতঃপ্রকাশ। এমন কি, প্রাচীন বাঙ্গালায় গদ্যেরও একটা ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত ছিল। তবে ইংরাজী আমলে গদ্য-সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে, গদ্যপদ্য উভয় সাহিত্যে নব ভাব, নব আদর্শ, নব শক্তি আসিয়াছে, ইহা অবশ্য শতবার স্বীকার করি। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সকলেই—অন্ততঃ অনেকেই—সংস্কৃত সাহিত্য-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। অথচ তাঁহাদিগের রচনায়, সংস্কৃত ব্যাকরণমতে যে সব দুষ্টপদ, তাহার অভাব নাই। ইহার কারণ কি? ইহাতে কি মনে হয় না,

প্রাচীন আমল হইতে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকৃতিসিদ্ধ ধারা চলিয়া আসিতেছে? ইহা কোন দিনই সংস্কৃত-ব্যাকরণের ষোল আনা শাসন মানিয়া চলে নাই। হয় ত প্রাকৃত-ব্যাকরণ ইহার কতকগুলি রহস্য বুঝাইয়া দিতে পারে। যাঁহারা প্রাকৃত ও পালিভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা সম্ভবতঃ উপস্থিত প্রশ্নের সমাধান অতি সহজে করিয়া দিবেন। এ দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িবে কি? বর্ত্তমান লেখক শিক্ষা ও সংস্কারবশে অনেক স্থলে সংস্কৃতব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন. প্রাকৃত ও পালিভাষায় তাঁহার অজ্ঞতাই তাহার কারণ।

আধুনিক বাঙ্গালা লেখক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন আমলে দুই সম্প্রদায় বাঙ্গালা লেখক দেখা দিয়াছেন। এক সম্প্রদায় সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ; যথা, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগতি ন্যায়রত্ন ইত্যাদি। অপর সম্প্রদায় ইংরাজীনবীশ; যথা, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইত্যাদি। (জীবিত লেখকদিগের নাম করিলাম না।) সাধারণতঃ ইংরাজীনবীশেরা সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপন্ন নহেন বলিয়া তাঁহাদিগের রচনায় উদ্দেশটা অপপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদদিগের রচনায়ও যে এরূপ দুষ্টপদ খুঁজিলে না মেলে, এমন নহে। এ ক্ষেত্রে কেবল যে ডিগ্রীধারীরা জক্কীজারী করিয়াছেন তাহা নহে, পণ্ডিতেরাও পাঁতি দিয়াছেন। আমার এক এক সময় মনে হয়, দেবীবর ঘটক যেমন প্রত্যেক কুলীনেরই এক একটা দোষ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের কুলীন লেখকদিগের মধ্যেও প্রত্যেকেরই এক একটা দোষ পাওয়া যায়। মহাত্মা রামমোহন রায় 'পৌত্তলিকতা' [illegible] উঠাইতে গিয়া 'পৌত্তলিকতা' উদ্ভট পদটা চালাইলেন;* বিদ্যাসাগর মহাশয় 'উভচর', অক্ষয়কুমার দত্ত 'সৃজন', কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'সক্ষম', বঙ্কিমচন্দ্র 'সিঞ্চন' চালাইলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ন্যায় সংস্কৃতে সুপণ্ডিতজনের 'রোমাবতী' আখ্যায়িকায় 'আত্মাপুরুষ,'

* এ চার্জ্জ আমার মনগড়া নহে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই চার্জ্জ আনিয়াছেন। ('আর্য্যাবর্ত্ত' বৈশাখ-সংখ্যা দেখুন)। কৃষ্ণকমল বাবুর সংস্কৃতজ্ঞানে অবশ্য কেহ সন্দেহ করিবেন না।

'দুরাচারিণী', 'পিতাস্বরূপ', 'একত্রিত', এই সকল প্রয়োগ রহিয়াছে। কেন এমন হয়? ইহার কি কোন মীমাংসা নাই?

সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদদিগের মধ্যেও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে দুইটা দল আছে। এক দল সংস্কৃতরীতিশুদ্ধ প্রয়োগের পক্ষপাতী। অপর দল অনেকপরিমাণে উদারপ্রকৃতি (liberal)। কিন্তু ইঁহাদিগকে দলে পাইয়া বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্যবাদীদিগের গৌরব করিবার কিছু নাই। কেন না, ইঁহাদিগের এই উদারতা অবজ্ঞাজনিত। ইঁহারা বলেন, বাঙ্গালা একটা অপভাষা, প্রাকৃত ভাষা, পামরের ভাষা, পৈশাচিক ভাষার সামিল, অতএব বাঙ্গালায় এত বাঁধাধরা কি? বাঙ্গালায় সবই শুদ্ধ, সবই চলে। এটা ভাষার জগন্নাথক্ষেত্র, এখানে কোন বাছবিচার নাই। এ ক্ষেত্রে ভাষার খিচুড়ী অবাধে চলিতে পারে।

এই মতই কি শিরোধার্য্য করিয়া লইব? বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ দেখিলেই কি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া মানিব, এবং সেটাকে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্ব বলিয়া ধার্য্য করিব? যাহা ভাষায় খুব চলিত, তাহা শুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে ক্ষতি নাই, না মানিলে উপায়ান্তরও নাই; কেন না, তাহার রোধ করা অসম্ভব। 'মনান্তর', 'অঙ্কাঙ্গিনী' প্রভৃতি পদ কথাবার্ত্তায় চলিলেও সাহিত্যের ভাষায় চলিতে দিব না বলিয়া কোট ধরিলে সে কোট বজায় রাখা কঠিন। কিন্তু লেখকসম্প্রদায়ের খেয়ালমত যে সব কৃত্রিম পদ নির্ম্মিত হইবে, তাহাই যে মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে, আমার ইহা সঙ্গত বিবেচনা হয় না। উৎকট মৌলিকতা, অজ্ঞতা, বা অনবধানের ফলে যে সব শব্দ উদ্ভাবিত হইতেছে, সেগুলিতে যে ভাষার শব্দসম্পদ্ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটি কথা।

ব্যাকরণ-সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা কথা এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভাষা নূতনই হউক, পুরাতনই হউক, যতদিন তাহা জীবন্ত ভাষা থাকে, ততদিন ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া তাহার স্বাভাবিক গতিরোধ করা অসম্ভব। অনেক সময় দেখা যায় যে, খরস্রোতাঃ নদীর প্লাবন-নিবারণের জন্য একস্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ফল হয় নাই, আবার অন্যত্র বাঁধ বাঁধা হইয়াছে। এইরূপ বাঁধের পর বাঁধ নদীপ্রবাহের গতির রহস্যটা বেশ বুঝাইয়া দেয়। সেইরূপ পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র,

সূত্রের পরে বার্ত্তিক, তাহার পর ভাষ্য, তাহার পর টীকা, এই ক্রমিক চেষ্টা ভাষার ক্রমবিকাশের রহস্য বেশ বুঝাইয়া দেয়। যেমন নূতন পদ্ম আসিয়াছে, নূতন প্রয়োজনের উদ্ভব হইয়াছে, অমনই নূতন নিয়ম বাঁধিতে হইয়াছে। অতএব ব্যাকরণের সৃষ্টি ভাষার ভবিষ্যৎ পরিণতি বন্ধ করিবার জন্য নহে; অতীত ও বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ পরিলক্ষণ করিয়া নিয়ম আবিষ্কার করাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাই প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। যখন ভাবের বন্যা বহিবে, তখন ব্যাকরণের পুরাতন বাঁধে সকল সময়ে তাহা আটকাইতে পারিবে না, বাঁধ ছাপাইয়া যাইবে। তবে, যদি কোন মনস্বী কাটযুড়ীর বাঁধের ন্যায় এমন শক্ত বাঁধ বাঁধিতে পারেন যে, চিরদিনের মত ভাবের বন্যায় ভাষার খাতে নূতন জলপ্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তিনি সে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্ত্তমান লেখক বাধা দিবেন না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনুসৃত প্রণালী।

আমার কার্য্য অন্যপ্রকারের। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃতব্যাকরণের ব্যতিক্রমের রাশি রাশি উদাহরণ একটা প্রণালী অবলম্বনে শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজাইয়াছি, এবং আমার সাধ্যমত নিয়ম বা কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা হইতে ব্যাকরণজ্ঞান, এবং ঋজুপাঠ হইতে সাহিত্যজ্ঞান সম্বল করিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সংস্কৃতব্যাকরণে সুপণ্ডিত, তাঁহারা এই ভার লইলে বিচারবিতর্ক ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ এ সকল হীন কাযে হাত দেন না। তবে অক্ষমের অকৃতিত্ব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রকৃত অধিকারীরা যদি এ পথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বিফল হইবে না। গালাগালি-টুকু আমার উপরি পাওনা হইবে, মীমাংসায় লাভ হইবে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের।

প্রাচীন ও আধুনিক, সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজীনবীশ, পেশাদার ও সৌখীন, উপাধিকারী ও নিরুপাধি, সকল শ্রেণীর লেখকদিগের রচনা হইতেই উদাহরণ-সংগ্রহ করিয়াছি। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সেই জন্য জীবিত লেখকদিগের নাম উল্লেখ করি নাই। তবে তাঁহাদিগের রচনা হইতে, উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি হইতে, যথেষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করিতে বিরত হই নাই; কেন না, আমার প্রধান উদ্দেশ্য

বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃতিনির্ণয়। যাঁহারা রচনাপ্রকরণ শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত দৃষ্টান্তমালা হইতেও উদাহরণ মিলিয়াছে। যে সকল লেখক এ কারণে বিরক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের আশ্বাসের জন্য বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান লেখকের নিজের রচনায় দুষ্ট পদ আছে, সে দৃষ্টান্তগুলিও ছাড় পড়ে নাই। এমন কি, কতকগুলি গলদ ভুক্তভোগী হিসাবেই প্রথম তাঁহার নজরে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, ভাষা ও সাহিত্যে যথেচ্ছাচারনিবারণের জন্য, ভাষা ও সাহিত্যের উপকার ও উন্নতির জন্য, এরূপ অপ্রিয় আচরণ দোষাবহ নহে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও জগতের স্থায়ী উপকারের জন্য জীবন্তপ্রাণিদেহব্যবচ্ছেদ (vivisection) পর্য্যন্ত নীতিবিগর্হিত বলিয়া নিন্দিত হয় না। ইতি উপক্রমণিকা সমাপ্তা।

(১) বর্ণচোরা শব্দ।

অনেক লম্বশাটপটাবৃত লোককে হঠাৎ দেখিলে ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম হয়; পরে বুঝা যায়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইতর লোক। বাঙ্গালায় কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলির দর্শনধারী চেহারা দেখিলে হঠাৎ সংস্কৃত শব্দ বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু বাস্তবিক সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানে তাহাদের স্থান নাই। প্রবন্ধের প্রথমেই এগুলির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

অপরূপ ('অপূর্ব্ব'র প্রাকৃত রূপ); **আলুয়িত** বা **এলায়িত** (সংস্কৃত 'আলুলায়িত'র সংক্ষেপ); **উলঙ্গ** ও তস্য স্ত্রীলিঙ্গ **উলঙ্গিনী** (বা **উলাঙ্গিনী**); **উপরন্তু** (অপরন্তুর বিকৃত উচ্চারণ?) **কুহেলিকা** বাঙ্গালার আকাশ হইতে কুজ্‌ঝটিকা অপসারিত করিয়া প্রহেলিকার ন্যায় প্রকাশমানা; **গাভী** (সংস্কৃত 'গবী'); **গল্প**; **গোলমাল**; **গোলযোগ**; **চন্দ্রিমা** (সংস্কৃতে চন্দ্র আছে, চন্দ্রিকা আছে, চন্দ্রমাঃ আছে); **চাকচিক্য** ('চাকচক্য' সংস্কৃত অভিধানে আছে); **ছত্র** (সত্র, বিকৃত উচ্চারণ); **জালায়ন** ('বাতায়নে'র দেখাদেখি, 'জাল' সংস্কৃত = জানালা); **ঝটিকা** (সংস্কৃত 'ঝঞ্ঝা' হইতে 'ঝড়', সম্ভবতঃ 'ঝড়ে'র প্রকৃত মূল না জানাতে 'ঝটিকা'র উদ্ভব); **ঝলকিত**; **ঝলসিত**; **তত্রাচ** ('তথাচ'র

অশুদ্ধ রূপ, 'তত্রাপি'র দেখাদেখি); **তাচ্ছিল্য** বা **তাচ্ছল্য** (সংস্কৃতে 'তাচ্ছীল্য' আছে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ, হয় ত 'তুচ্ছ' হইতে বাঙ্গালা শব্দ-দ্বৈতের নিয়মে হইয়াছে : 'কট্‌কাটব্য' সংস্কৃতে চলে ?) : **পুঙ্খানুপুঙ্খ** ; **পুত্তলিকা, পৌত্তলিকতা** (সংস্কৃতে এ দুটি শব্দ নাই, পুত্রিকার প্রাকৃত রূপ) * ; **ভগ্নী** ('ভগিনী'র দ্রুত উচ্চারণ) : **ভরশা** ; **ভাস্কর্য্য** (সংস্কৃতে প্রস্তরমূর্ত্তিনির্ম্মাতা অর্থে 'ভাস্কর' নাই) ; **ভাদ্রবধূ** (ভ্রাতৃবধূর বিকৃত উচ্চারণ) : **মতি** বা **মোতি** (মুক্তার অপভ্রংশ) : **মর্ম্মন্তুদ** ('অরুন্তুদ'র দেখাদেখি) ; **মাত্র** (সংস্কৃতে 'মাত্র' আছে, 'মাত্রচ' প্রত্যয় আছে, স্বতন্ত্র মাত্র শব্দ নাই) ; **মূর্চ্ছাভঙ্গ** (সম্ভবতঃ 'উৎসাহভঙ্গ') : **অন্তঃশীলা** (অন্তঃসলিলা) : **রাণী** ('রাজ্ঞী'র অপভ্রংশ) : **বক্তৃমা** (বক্তৃতা) : **বনানী** ('অরণ্যানী'র দেখাদেখি) : **বালি** ('বালু'র অশুদ্ধ উচ্চারণ) : **বিদায়** (সংস্কৃত ভাষায় ইহা এক স্থলে ভিন্ন প্রয়োগ নাই) : **বিদ্রূপ** : **ব্যবসা** (ব্যবসায়ের দ্রুত উচ্চারণ) . **ব্যামো** (ব্যামোহ) : **শীকার** (বাস্তবিক 'স্বীকারে'র অর্থবিশেষ নহে কি ?) : **সৌদামিনী** ('দামিনী' ও 'সৌদামনী' সংস্কৃতে আছে) : **হুহুঙ্কার** (সংস্কৃত 'হুঙ্কার' . বাঙ্গালী বীরের জাতি, হুঙ্কারে কুলায় নাই, 'অভ্যস্ত' করিয়া হুহুঙ্কার করিয়া লইয়াছে !) ।†

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্, এ, মহাশয় সম্প্রতি সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় (১৭শ ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যা) প্রসঙ্গক্রমে দেখাইয়াছেন,—**গঠিত** ('ঘটিত'র অপভ্রংশ) : **চমকিত** ('চমৎকৃত'র সংক্ষেপ) : **টিকা** ('তিলকে'র অপভ্রংশ, টীকা স্বতন্ত্র শব্দ) : **পুনরায়** ('পুনর্ব্বারে'র অপভ্রংশ) ; **মাকুন্দ** (মৎকুণের অপভ্রংশ) : **মিনতি** ('বিনতি'র অনুনাসিক উচ্চারণ) : **বিজলী** বা **বিজুলী** ('বিদ্যুতে'র অপভ্রংশ) :

* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ বলেন। আর্য্যাবর্ত্ত (১৩১৮) বৈশাখ সংখ্যায় 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য। 'অপরূপ'ও তিনি ধরিয়াছেন।

† লেখকের কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু সংস্কৃত প্রামাণিক অভিধানে কুহেলিকা, ভগ্নী, পুত্তলিকা, সৌদামিনী, আছে জানাইয়াছেন। প্রয়োগ পাইয়াছেন কি না, জানান নাই। কেহ কেহ বলেন, অমরকোষে 'সৌদামিনী' 'সৌদামনী'র অপপাঠ।

ব্যভার ('ব্যবহারে'র দ্রুত উচ্চারণ), সরম ('সম্ভ্রমে'র অপভ্রংশ)। অতএব এগুলিও বর্ণচোরা শব্দ।

(২) ভোলফেরা শব্দ।

১। বিসর্গবিসর্জ্জন করায় কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালায় ভোল ফিরিয়াছে, সমাসপ্রকরণে ও বাণান-সমস্যায় দেখাইব। কতকগুলি হসন্ত শব্দ অজন্ত করিয়া লিখিত হইতেছে, তাহাতে তাহাদিগেরও ভোল ফিরিয়াছে, সমাসপ্রকরণে ও বাণান-সমস্যায় দেখাইব। দুই চারিটি সংস্কৃত শব্দ কেহ কেহ চন্দ্রবিন্দু-সংযুক্ত করিয়া লিখিতেছেন, তাহাতে সেগুলিরও ভোল ফিরিয়াছে। যথা—কাঁচ, শাঁপ, তুঁষ, পুঁষ, পাঁচন। শেষেরটি পাঁচের দেখা-দেখি অলীক সাদৃশ্য-বশতঃ (false analogyতে) হইয়াছে; বাস্তবিক ইহার পাঁচটি উপাদান নহে, ইহা পাচন (decoction) ক্বাথ।

২। 'অ'কার অনুচ্চারিত হওয়া বাঙ্গালায় একটা সংক্রামক ব্যাধি। কিন্তু কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের শেষের 'অ'কার বাঙ্গালায় 'আ'কারে দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয়, প্রকৃত উচ্চারণ করিতে গিয়া ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া লোকে এইরূপ বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা কি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হ্রস্ব 'আ' উচ্চারণের চেষ্টা? উদাহরণ,—মণ্ড (মণ্ডা), মল (মলা বা ময়লা), ছল (ছলা), মূল (মূলা, দুই অর্থের প্রভেদ করিবার জন্য?), তুল (তুলা, তুলাগুর দেখাদেখি), তল (তলা), গল (গলা), ফেন (ফেনা), কাণ (কাণা), অলক তিলক (অলকা তিলকা), দেব (দেবা), রাম শ্যাম (রামা শ্যামা), তমস্ (তমসা), বচস্ (বচসা), মাম (মামা), পৃষ্ঠ (পৃষ্ঠা, 'পৃষ্ঠ' সাধারণ অর্থে আছে, কেহ কেহ বলিবেন, দুই অর্থের প্রভেদের জন্য দুইরূপ বাণান সুবিধা), চোর (চোরা), দার (দারা, নিত্য বহুবচন দারাঃ বিসর্গবিসর্জ্জন অথবা পুংলিঙ্গ দার শব্দের কল্পিত স্ত্রীলিঙ্গ), কণ্ঠ (চলিত ভাষায় কণ্ঠা), শিরোনাম (শিরোনামা), অষ্টমঙ্গল (অষ্টমঙ্গলা), একচ্ছত্র (এক-চ্ছত্রা), মন্বন্তর (মন্বন্তরা), পরিক্রম (পরিক্রমা, যথা—কাশীপরিক্রমা, ব্রজ-পরিক্রমা ইত্যাদি), সুন্দরকাণ্ড, উত্তরকাণ্ড (সুন্দরাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড; লঙ্কাকাণ্ড প্রভৃতির দেখাদেখি), দক্ষিণ (দক্ষিণা, দক্ষিণা বাতাস), নিষ্ফল (নিষ্ফলা; যথা—রবিবার নিষ্ফলা বার, এ মেঘ পশ্চিমে মেঘ, নিষ্ফলা যাবে না), নির্জ্জল (নির্জ্জলা; যথা—নির্জ্জলা দুধ), কর্ম্মনাশ (ও লোকটা

কর্ম্মনাশা), চঞ্চল (চঞ্চলা; স্ত্রীলোকেরা বলেন, 'ছেলেটা বড় চঞ্চলা'), সভা-উজ্জ্বলা জামাই ইত্যাদি।* এগুলি অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গ নহে। কেহ যদি বলেন, এগুলি খাঁটী বাংলা 'আ' প্রত্যয়, তবে নাচার। দুই এক স্থলে পদের আদিস্থিত বা পদমধ্যগত অকার আকার হইয়াছে। যথা—আমাবস্যা, দশহারা (সাধারণ উচ্চারণে), অনুপাম (প্রাচীন কাব্যে)। বাণান-সমস্যায় অন্যান্য প্রকারের উদাহরণ দিব।

কয়েকটি স্থলে অলীক সাদৃশ্যের দরুণ (false analogy তে) 'আ'কার আসিয়াছে। 'হাওয়া'র দেখাদেখি বাঙ্গালায় 'মলয়া' ছুটিয়াছে (মলয়ানিলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ?), 'ছায়া'র আকার থাকাতে 'কায়া'র আকার প্রকট হইয়াছে। এই আকারের সঙ্গে আমাদের সাকারোপাসনার কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে কি?

(৩) লিঙ্গবিচার।

সংস্কৃতব্যাকরণে লিঙ্গজ্ঞান সহজ নহে। ইহার দুইটী নিকট দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। পত্নীবাচক হইয়াও 'কলত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ এবং 'দার' শব্দ পুংলিঙ্গ (ও নিত্য বহুবচন)। চেলীর পুঁটলী কলাবৌ বঙ্গবধূকে দেখিয়া 'কলত্র'-শব্দের ক্লীবত্ব-নির্দ্দেশ ও কাছাকোঁচা দেওয়া মারাঠী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া 'দার'শব্দের পুংস্ত্ব-নির্দ্দেশ, (এবং এরূপ পুরুষাকৃতি নারী একাই একশ বলিয়া নিত্য বহুবচনের ব্যবস্থা) হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না।

বিশেষ্যের বিশেষণপ্রয়োগ পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ।

১। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় শব্দরূপের সময় লিঙ্গজ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না। বিশেষ্যের বিশেষণপ্রয়োগের বেলায় লিঙ্গনির্ণয়ের প্রয়োজন উভয় ভাষাতেই আছে, তবে সমপরিমাণে নহে। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণ যে স্ত্রীলিঙ্গ করিতেই হইবে, বঙ্গালা ভাষায় তৎসম্বন্ধে খুব বাঁধাবাঁধি নাই। সাধারণ লোকদিগের রচনায় স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ বিশেষণ দুই রকম চলিত; স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের একাধিক বিশেষণ থাকিলে কোনটা পুংলিঙ্গে, কোনটা স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। অনেক সময় যেটা শুনিতে ভাল, সেটাই লেখা হয়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর

* আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে 'বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্ রূপ' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

মহাশয় শকুন্তলার বিশেষণ কখন পুংলিঙ্গ, কখন স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করিয়াছেন। পুংলিঙ্গ বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের পরে থাকিলে ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া সেটাকে সমর্থনও করা যায়। 'অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা', 'অমূলক শঙ্কা', 'সুখদায়ক কল্পনা', 'নিরর্থক ক্রিয়া' 'ভ্রমাত্মক ধারণা', সংস্কৃত ভাষা', 'প্রাকৃত ভাষা', ইত্যাদি বাঙ্গালার ধাতে বেশ সহিয়া গিয়াছে। এ সকল স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস করিলে ত সব লেঠাই চুকিয়া যায়। স্থানবিশেষে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ দিলে বিকট শুনায়। 'ভবিষ্যৎ পত্নী' বা 'ভাবী বধূ' না বলিয়া 'ভবিষ্যন্তী পত্নী' বা 'ভাবিনী বধূ' বলিলে বাঙ্গালায় শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। 'বৌটি পয়মন্ত' না বলিয়া 'পয়স্বিনী' বলিলে কেমন শুনায়! ফল কথা, এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রয়োগরীতি সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; সে স্বাতন্ত্র্যটুকু রাখাই ভাল নহে কি?

২। তবে সাধারণতঃ এরূপ শিথিলতা চলিলেও, ইন্, বিন্, তৃন, মৎ, বৎ, ক্বসু প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয়ান্ত ও মহৎ বৃহৎ প্রভৃতি বিশেষণের বেলায় ইহা বড় কাণে লাগে। (এ সব স্থলে সমাস করিয়াছি বলা ত চলে না; কেন না, তাহা হইলে পূর্ব্বপদটি প্রথমার একবচনে রাখা চলিবে না)। এক জন নব্য কবি লিখিয়াছেন,—'যত দূরে যাও, তত শোভা পাও, ধ্রুবতারা জ্যোতিষ্মান্'; আর এক জন নব্য কবি তাঁহার সঙ্গে তাল রাখিয়া লিখিয়াছেন,—'অশ্রুমুকুতার মালা তারি পাশে দ্যুতিমান্'; এখানে 'অশুদ্ধ যা' ব্যাকরণ', তা' মাপ করিতে হইবে কি? 'বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি'তে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা নাই কি? বাঙ্গালা গদ্যে পদ্যে 'মহৎ প্রতিভা', 'সারবান্ রচনা', 'বলবান্ যুক্তি', 'ওজস্বী ভাষা', 'মর্ম্মভেদী বর্ণনা', 'বিশ্বব্যাপী জ্ঞানধারা', 'দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা', 'বহুবর্ষব্যাপী ধনধারার বৃষ্টি', 'অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপী পূজা', 'উপযোগী প্রণালী', 'স্থানোপযোগী প্রস্তাবনা', 'চিরস্থায়ী স্মৃতি', কিছুরই অভাব নাই, কেবল যা লিঙ্গজ্ঞানের অভাব! বাঙ্গালায় কোথাও 'অভ্রংলেহী চূড়া', দেখিতেছি, কোথাও 'যোজনব্যাপী সমাধিনগরী' দেখিতেছি, কোথাও 'ব্রহ্মপুত্র নদী' প্রবাহিত, কোথাও 'বলবান্ বা বেগবান্ শাখা'। এক দিকে 'অসিভল্লভারী মহারাষ্ট্রবামা রাজোয়ারা নারী', অন্য দিকে 'সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গনয়নী'। 'জাগ্রৎ দেবতা', 'মূর্ত্তিমান্ দয়া', 'বিশ্বদ্রাবী করুণা', 'মর্ম্মভেদী তীব্রতা', সবই সমান অসহ্য নহে কি? 'অপঅভাগী জানকী', 'সাক্ষাৎ শরীরী ভগবতী' ও 'মৎস্যবিক্রেতা জেলেনী',

এই ত্রিমূর্ত্তিরই সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। বাঙ্গালায় 'ক্ষমতাশালী লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি' মাঝে মাঝে দেখা দেন, 'বিদ্বান্ ও গুণী ব্যক্তি' ত সর্ব্বত্র। পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করি, সংস্কৃতভাষার নিকট বাঙ্গালা ভাষা 'ঋণী' না বলিয়া 'ঋণিনী' বলিলে, ঋণটা অসহ্য হইত না কি? বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে 'সুখী' না করিয়া 'সুখিনী' করিলে প্রতাপ কি অধিকতর কৃতার্থ হইতেন?

৩। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উৎকট, পুংলিঙ্গ (বা ক্লীবলিঙ্গ) বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ। 'পলাশীর যুদ্ধে'র 'পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী স্বাধীন নরকবাস' এখনও থাকিয়া থাকিয়া 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'র সুরে কাণে বাজিতেছে। বাঙ্গালার আসরে কোথাও বা 'মোহিনী সঙ্গীত' বা "সঞ্জীবনী মন্ত্র' শ্রুত হইতেছে, কোথাও বা 'অমানুষী তত্ত্ব' উদ্ঘাটিত হইতেছে, কোথাও বা 'মানুষী প্রেম' 'উচ্ছলিত' হইতেছে, কোথাও বা 'চিত্তহারিণী চিত্র' প্রদর্শিত হইতেছে, কোথাও বা 'মনোরঞ্জিনী সাহিত্য' সৃষ্ট হইতেছে ও 'নানাবিষয়িণী প্রবন্ধ' পঠিত হইতেছে, কোথাও বা 'শস্যশালিনী ভারতবর্ষে'র 'উর্ব্বরা ক্ষেত্রে'র কথা বিবৃত হইতেছে, কোথাও বা 'গর্ভিণী জীবনাশ' মহাপাপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। কেহ 'রামায়ণী গল্প' লিখিতেছেন, কেহ 'ঐশ্বর্য্যশালিনী পূর্ব্ব-প্রদেশে'র 'মহীয়সী মহিমা' কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ 'বৈশাখী উৎসবে' মাতিয়াছেন, কেহ 'বাসন্তী উপহার' বিলাইতেছেন, কেহ 'অমানুষী শ্রম' স্বীকার করিয়া 'পেষণী চক্র' সবেগে ঘুরাইতেছেন, কেহ 'ভীমা অসি' করে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে নাচিতেছেন। মেয়েলি ছড়ায় 'গুণবতী ভাইটি'র জন্য প্রাণ কেমন করে। 'মর্ম্মভেদিনী দীর্ঘনিশ্বাস', 'নিদ্রাসহচরী মোহ', 'লীলাময়ী কটাক্ষ', 'প্রেমময়ী মুখ', কিছুরই ত্রুটী নাই। 'কেশবর্দ্ধিনী তৈলনিষেকে' বাঙ্গালা সাহিত্যবৃক্ষ 'ফলবতী' হইতে আর বাকী কি?*

ইমন্‌প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের পদ (প্রেমের বেলায় কেবল ক্লীবলিঙ্গ) বাঙ্গালায় চলিত। সেগুলিকে আকারান্ত দেখিয়া স্ত্রীলিঙ্গ-ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। অস্‌ভাগান্ত শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের পদ (যথা চন্দ্রমাঃ) দেখিয়াও (বিসর্গ-বিসর্জ্জনে) এ গোল

* 'লক্ষ্মী ছেলে' না বলিয়া 'নারায়ণ ছেলে' বলিতে হইবে কি? ইহার উত্তরে বলিব, উপমাচ্ছলে এখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাব, বিশেষণবেশে নহে। পুরুষের সরস্বতী উপাধিও ঐ ভাবে।

ঘটিতে পারে। 'কেশবৰ্দ্ধিনী তৈল, চন্দ্রমুখী তৈল, সুকুন্তলা তৈল' প্রভৃতি স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটিকে বিশেষণ না বলিয়া সংজ্ঞা বলিয়া ধরিলে গোল মিটিতে পারে। 'বাসন্তী রং' বা 'বসন্তী রং' খাঁটী বাংলা 'ঈ' প্রত্যয় ধরিলে চলিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি যে অসাবধানতার ফল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৪। আর এক জাতীয় উদাহরণ দিতেছি, সে সকল স্থলে বিশেষ্যটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও সমাসবদ্ধ (অথবা প্রত্যয়ান্ত) থাকাতে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ 'সমস্ত' বা 'অসমস্ত' কোন ভাবেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে চলিতে পারে না। অথচ পুংলিঙ্গ বিশেষণ বসাইলেও কেমন কেমন ঠেকে, উভয়-সঙ্কট। 'প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ', 'প্রিয়তমা পত্নীস্বরূপ', 'জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক', 'সধবা স্ত্রীলোক,' 'মানিনী স্ত্রীলোক', 'অবলা স্ত্রীলোক', 'কৌতুকোচ্ছলিতা সখীদ্বয়', 'গঙ্গাযমুনানাম্নী নদীদ্বয়', 'ধৈর্য্যশীলা বধূকুল', 'পয়স্বিনী গাভীকুল', 'অন্তঃ-পুরবাসিনী দরিদ্রা মহিলাগণ', বীরবিনোদিনী 'বামাগণ': 'জলবিহারিণী কুল-কামিনীগণ', 'আমাদিগের দেশীয়া কোমলাঙ্গী অবলা অঙ্গনাগণ', 'উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গ', এগুলি লইয়া বড়ই বিব্রত হইতে হয়। প্রথম দুইটি উদাহরণে 'বৎ' প্রত্যয় ও 'স্বরূপে'র পরিবর্ত্তে 'মূর্ত্তির বা পত্নীর ন্যায়' লিখিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পরের চারিটি স্থলে 'স্ত্রীলোক' 'স্ত্রীজাতি' বলিয়া সামলান যায়; অন্যগুলিতে 'দ্বয়', 'কুল', 'গণ', 'বর্গ' উঠাইয়া দিয়া খাঁটী বাংলা বহুবচনের চিহ্ন 'দিগ', 'রা' বসাইলে হাঙ্গামা মেটে। কিন্তু এ মীমাংসা কি টিকিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এ সকল স্থলে সমাস হয় নাই, 'গণ', 'কুল', বর্গ, 'সমূহ', 'সকল' ইত্যাদি বহুবচনের চিহ্ন, বিভক্তি (inflection)। ('দ্বয়' শব্দ কি দ্বিবচনের বিভক্তি?)

স্ত্রী-প্রত্যয়।

১। স্ত্রীলিঙ্গে কোথায় 'আ' হইবে, কোথায় 'ঈ' হইবে, তাহা লইয়া প্রাচীন ও আধুনিক উভয় সাহিত্যেই বেশ একটু গোলযোগ দেখা যায়। কবিতায় ও গানে বহু দৃষ্টান্ত আছে, যথা—ত্রিনয়নী, করালবদনী, দিগম্বরী, প্রেমাধীনী, সুলোচনী, মৃগনয়নী, সুচারুবদনী, সুচিরযৌবনী (হেমচন্দ্র) ইত্যাদি; 'নীলবরনী' (বরণ শব্দ অপভ্রংশ হওয়াতে) খাঁটী বাংলার নিয়মে চলিতে পারে। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে 'চতুর্থী কন্যা, পঞ্চমা কন্যা,

('ষষ্ঠা বা ষষ্ঠমা !) কন্যা, সপ্তমা কন্যা'র দর্শনলাভ নিত্য ঘটনা। এক 'ষষ্ঠা কন্যা'র পিতাকে এই ভ্রম দেখাইতে গিয়া জবাব পাইয়াছিলাম—"তিথির বেলায় যা হইবে, কন্যার বেলায়ও কি তাই হইবে ? কন্যা ত আর মা ষষ্ঠী নহেন ! 'একাদশা কন্যা'র বেলায় কি 'একাদশী' লিখিয়া অকল্যাণ করিব ?" এ উত্তরে আমি নিরুত্তর হইয়াছিলাম, কিন্তু বৈয়াকরণ নিরুত্তর হইবেন কি ? এই 'ষষ্ঠা কন্যা'র পিতাকেই বেহাইনকে শ্যালিকার ন্যায় 'বৈবাহিকা' পাঠ লিখিতে দেখিয়াছি ! স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার সময় অনেকে বিশুদ্ধ করিয়া 'মঙ্গলাস্পদা, কল্যাণভাজনা ইত্যাদি পাঠ লেখেন। আস্পদ, ভাজন যে অজহল্লিঙ্গ, তাহা খেয়াল থাকে না। মেঘনাদবধ কাব্যে 'নায়ঁকে ল'য়ে কেলিছে নায়কী'। অনেককে 'রজকী' 'নর্ত্তকী'র ন্যায় 'পাচকী'র চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। ব্যাকরণ অভিধানে যাহা মেলে না, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে পাইলেন কি না, জানি না। 'ভ্রমরী' 'চমরী'র পালের সঙ্গে 'অমরী' 'অপ্সরী'র আমদানী হইতে দেখি, রাজ্ঞীর দেখাদেখি, 'সম্রাজ্ঞী'রও অভ্যুদয় হইয়াছে, 'উদাসীনী' রাজকন্যাও বিরল নহে। ব্যাকরণ মানিতে হইলে, 'প্রেমাধীনী', 'দিগম্বরী', 'সুলোচনী', 'মৃগনয়নী', 'সুচারু-বদনী', 'সুচিরযৌবনী'দের কি দশা হইবে ? 'নীলাম্বরী শাড়ী' লইয়াই বা কি হইবে ? 'বধূবেশী সতী', 'অপূর্ব্ববেশী কন্যা', ইন্‌প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের লিঙ্গবিপর্য্যয়ের উদাহরণ, না স্ত্রীপ্রত্যয়ে প্রমাদ, কে বলিয়া দিবে ? এ সব স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিতে হইবে, না অভিনব 'বাংলা' ব্যাকরণে এগুলি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া গৃহীত হইবে ?

২। 'ইনী' বা 'আনী' যোগ করিয়া কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ-পদ বাঙ্গালায় গঠিত ও ব্যবহৃত, সেগুলির সংস্কৃত ব্যাকরণে অস্তিত্ব নাই। চণ্ডীদাস 'রজকিনী'র চল করিয়াছেন। বলরাম দাস শ্রীরাধার চরণ-নূপুরে 'চটকিনী'র বোল শুনিয়াছেন।* সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ মদনমোহন তর্কালঙ্কার অনুপ্রাস অলঙ্কারের খাতিরে (কুতুকিনী) 'চাতকিনী' কাব্যাকাশে উড়াইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যারণ্যে 'পদ্মিনী', 'শঙ্খিনী' ও 'হস্তিনী'র সঙ্গে সঙ্গে 'নাগিনী, সর্পিণী, সিংহিনী, মাতঙ্গিনী, ভুজঙ্গিনী, বিহঙ্গিনী'র বহুলসমাগম ; তরঙ্গিণীর কূলে 'কুরঙ্গিণী' বিচরণ করিতেছে ; আশঙ্কা হয়, কোন্ দিন

* চরণে নূপুর শবদ শুনায় যৈছে চটকিনী বোলই।

'পুরুষিণী, কোকলিনী'রও সাড়া পাইব। ব্যাকরণের হিসাবে ব্রজের 'গোপিনী', পাড়ার 'কায়স্থিনী' ও কাণাচের 'প্রেতিনী' 'পিশাচিনী' একই পদার্থ। 'উলাঙ্গিনী'* ত 'পাগলিনী'র মত খাঁটী বাঙ্গালিনী কাঙ্গালিনী, তাহার সাত খুন মাপ। 'ননদিনী' বাঙ্গালায় একটি অদ্ভুত জীব। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে সুন্দরীর 'নাপিতানী'বেশ। 'ইন্দ্রাণী, শর্ব্বাণী, রুদ্রাণী'র পাশে 'শূদ্রাণী', 'ঘোষাণী', 'পণ্ডিতানী'কেও স্থান দিতে হইবে কি? 'সুকেশিনী', 'শ্যামাঙ্গিনী' বা 'শ্বেতাঙ্গিনী' বা 'হেমাঙ্গিনী' বা 'গৌরাঙ্গিণী' 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' ত্যাগ করার পরামর্শ দিলে কেহ শুনিবেন কি? 'অনাথিনী', 'নির্দ্দোষিণী', 'নিরপরাধিনী', 'হতভাগিনী', 'দুরাচারিণী' প্রভৃতি লইয়াও বড় মুস্কিল। (সমাস-প্রকরণে এগুলির বিচার হইবে।)

খাঁটী বাংলা শব্দে খাঁটী বাংলা ইনী প্রত্যয় দিয়া কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয় বটে, যথা,—সাপ সাপিনী, বাঘ বাঘিনী, উলঙ্গ উলঙ্গিনী, কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী, পাগল পাগলিনী (পাগলী), গোয়াল বা গোয়াল। গোয়ালিনী বা গয়লানী, নাপ্তে বা নাপিত নাপ্তিনী বা নাপিৎনী। চলিত ভাষার জের সাধুভাষায় পর্যন্ত গিয়াছে। নাপ্তিনী বা নাপিৎনী ভবিযুক্ত হইয়া নাপিতানী হইয়াছে; গয়লানীর দেখাদেখি ঘোষাণী, বাঘিনীর দেখাদেখি ব্যাঘ্রিণী সিংহিনী, সাপিনীর দেখাদেখি সর্পিণী, ধোপানীর দেখা-দেখি রজকিনী হইয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের উত্তর খাঁটী বাংলা প্রত্যয় করিয়া সোনার পাথর-বাটী গড়া উচিত কি? এরূপ দোআঁশলা শব্দের (hybrid word) প্রয়োজনই বা কি? কতকগুলি কবিপ্রয়োগ (poetic license) বলিয়া সোঢ়ব্য হইলেও গদ্যের ভাষায় চলিবে কি না, তাহাও বিচার্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ আছে, ইহা ইংরাজীনবীশ সম্প্রদায়ের হাল আমদানী নহে।

ক্লীবলিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ লইয়াই যখন এই বিভ্রাট, তখন আবার পুংলিঙ্গক্লীবলিঙ্গ-ভেদের জের সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় চালাইতে গেলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। মনে মনে কোষ বা লিঙ্গানুশাসন ঘুষিয়া, লিঙ্গ ঠিক করিয়া,

* বর্ণচোরা শব্দের ফর্দ্দ দেখুন।

বলবান্ নিয়ম, বলবৎ প্রমাণ, বলবতী যুক্তি, হৃদয়স্পর্শী প্রবন্ধ, হৃদয়স্পর্শি বাক্য, হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা, এত ধরিয়া লেখা চলিবে কি ? বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদ যত সহজ লক্ষণে চেনা যায়, পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ-ভেদ তত সহজে ধরা যায় না। অতএব বাঙ্গালায় ক্লীবলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সবই পুংলিঙ্গ, এইরূপ একতরফা ডিক্রী দিলেই আমার যেন ভাল বোধ হয়।*

(৪) সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রকরণ।

বাঙ্গালায় সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের সাধারণতঃ ব্যবহার নাই ; কেন না, বাঙ্গালায় শব্দরূপ ধাতুরূপ স্বতন্ত্র প্রকারের। তথাপি কয়েকটি তিঙন্ত পদ বাঙ্গালায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায় ; যথা,—বৈষ্ণবপদাবলীতে ও কীর্ত্তনে দেহি ও কুরু ; প্রাচীন কাব্যে ছিন্দি ভিন্দি, সংহর, স্মর, ত্রাহি, জয় জয়, অস্তু (তথাস্তু, সিদ্ধিরস্তু, জয়োহস্তু, দীর্ঘায়ুরস্তু) ; দীয়তাং ভুজ্যতাম্ ; (আশ্চর্য্যের বিষয়, সবগুলিই অনুজ্ঞার পদ) ; অস্তি (নাস্তি, যৎপরোনাস্তি, আস্তিক, নাস্তিক) ; মাভৈঃ (বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়)। 'যৎপরোনাস্তি' কি সংস্কৃতে আছে ?

বাঙ্গালায় সুবন্ত পদের চল তিঙন্ত পদ অপেক্ষা অধিক। কতকগুলি স্থলে প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ; যথা—পিতা, মাতা, সখা, বিদ্বান্, রাজা, সম্রাট্, গুণী, হনূমান্, শ্রীমান্, শর্ম্মা, আত্মা ইত্যাদি। 'দম্পতি' নিত্য দ্বিবচন বলিয়া, প্রথমার দ্বিবচন 'দম্পতী' কেহ কেহ বাঙ্গালায় লেখেন ; আবার কেহ কেহ সোজাসুজি 'দম্পতি' লেখেন। 'বলবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, জ্ঞানবন্ত' প্রভৃতি বাঙ্গালায় চলিত ; এগুলি যদি সংস্কৃত পদ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বিসর্গবিসর্জ্জন হইয়াছে ও বহুবচনান্ত পদ একবচনে চলিয়াছে।† 'অগত্যা', যদ্রুগত্যা,' 'যেন তেন প্রকারেণ', এই তৃতীয়ার একবচনের পদগুলি ব্যবহৃত হইতেও দেখা যায়। মম,তব, ষষ্ঠীর পদ পদ্যে চলে। অন্যান্য ষষ্ঠীর পদ, যস্য, অস্য, কস্য, তস্য, তস্যাঃ (অস্যার্থঃ)। হঠাৎ, তৎক্ষণাৎ, দৈবাৎ,

* এই পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল।

† "জীবন্ত, জলন্ত, চলন্ত, ভাসন্ত", এগুলি কি শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ, বিসর্গ বিসর্জ্জন ও এক বচনে ব্যবহার হইয়াছে ? (ভাস্ ধাতু আত্মনেপদী)।

বলাৎ (বলাৎকার), অকস্মাৎ, প্রসাদাৎ, সারাৎ (সার,) পরাৎ (পর), এই পঞ্চমীর পদগুলিও চলিত। 'কস্মিন্' এই সপ্তমীর পদটি 'কস্মিন্ কালে' এই পদসজ্যে (phraseএ) চলিত।

শর্ম্মণ, বর্ম্মণঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ প্রভৃতি ষষ্ঠীর পদ নাম-সহিতে চলে। এ গুলিতেও কখন কখন বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়। 'দেব্যাঃ, দাস্যাঃ' ও 'দেবী' দাসী'র মধ্যে একটা আজগবি প্রভেদ বাঙ্গালায় চলিত। প্রথম যোড়াটি বিধবার বেলা ও দ্বিতীয় যোড়াটি সধবার বেলা প্রযুক্ত হয়। ইহার হেতু কি?

সম্বোধন-পদের ব্যবহার লইয়া বাঙ্গালায় বেশ একটু গোল দেখা যায়। কেহ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে চলেন, কেহ চলেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত—'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?' 'কেন ডর ভারু, কর সাহস আশ্রয়,' 'পর্ব্বতদুহিতা নদী দয়াবতী তুমি,' 'আজ শচীমাতা কেন চমকিলে?' 'সাবধান, সাবধান, ওরে মূঢ়মতি,' 'এই না ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজত্ব তোমার?' 'হা দগ্ধ বিধাতা রে' ইত্যাদি। আমার মনে হয়, শব্দটির রূপান্তর না করিয়া অবিকল রাখিয়া দিলে বাঙ্গালায় ভাগবত অশুদ্ধ হয় না। * তবে ঋকারান্ত শব্দের বেলায় এবং অন্য কতকগুলি স্থলে অবশ্য প্রথমার একবচনকেই (বাঙ্গালার নিয়মে) মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ঋকারান্ত শব্দের বেলায় প্রথমার একবচনকে মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে কিন্তু এক অনর্থ ঘটিয়াছে। দুহিতার সম্বোধনে 'দুহিতে' দেখিয়াছি, মিত্রের দেখাদেখি 'পিতে'ও কবির গানে যাত্রাগানে শুনা গিয়াছে। মাতে, ভ্রাতে, এখনও হইতে দেখি নাই।

মৎ, বৎ, ইন্, বিন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত (অন্‌ভাগান্ত ইন্‌ভাগান্ত) শব্দের বেলায়ও পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচন মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হয় এবং সম্বোধনে ঐরূপই অবিকৃত থাকে; যথা 'দ্রৌপদী কাঁদিয়া কহে বাছা হনুমান্,' 'বৃথা এ সাধনা তব হে ধীমান্', 'কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলিরে?' 'অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা?' 'শুন শুন ওহে রাজা করি নিবেদন' ইত্যাদি। কেহ কেহ 'রাজন্,' 'শশিন্,' 'ধনিন্' ইত্যাদি সংস্কৃতানুরূপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু এক সম্প্রদায় লেখক উৎকট মৌলিকতা দেখাইয়া 'শশি, ধনি,' ইত্যাকার লিখিতেছেন।

গদ্যে ও গানে যেখানে যেমন সুবিধা সেখানে সেইরূপ লেখা হয়। এ স্বাধীনতাটুকু কি থাকা উচিত? এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ লেখক একটু

* রাজসিংহ, চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্রও এই রায় দিয়াছেন।

রঙ্গরসের অবতারণা করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন—'শশি, তুমি রাগই কর আর যাই কর, তোমাকে শশিন্ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিব না।' অবশ্য শশী রাগ করিয়াছেন কি না, চন্দ্রলোক হইতে আজও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে 'শশি' বলিলে শশীর রাগ করিবার কথা; লেখকগণ খেয়াল করেন না যে, 'শশি' বলিয়া সম্বোধন করিলে শশীকে ক্লীবলিঙ্গে পরিণত করা হইল! ধনি' সম্বন্ধেও সেই কথা। গানে স্ত্রীলোককে যে 'ধনী' বলা হয়, সেটা কি? যে সকল লেখক সংস্কৃত ব্যাকরণের মারপেঁচের ভিতর যাইতে চাহেন না, তাঁহারা সোজাসুজি পুংলিঙ্গের প্রথমার এক বচনটাই সম্বোধনে বাহাল রাখিলেই পারেন। উৎকট মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়।

সম্বোধনে বিস্ময়-চিহ্ন দেওয়া বাঙ্গলায় একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

(৫) তদ্ধিত ও কৃৎ প্রকরণ।

তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত কতকগুলি দুষ্টপদ বাঙ্গালায় চলিত। কতকগুলি স্থলে (false analogy তে) অলীক সাদৃশ্য দেখিয়া পদগুলির উদ্ভব হইয়াছে। স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ পদটি দিয়াছি।

তদ্ধিত।

পঞ্চম, সপ্তম এর দেখাদেখি ষষ্ঠম
দশম ,, ,, দ্বাদশম
মধ্যম ,, ,, জ্যেষ্ঠম
} এ তিনটি পদ কচিৎ দেখা যায়

অরণ্যানীর ,, বনানী আধুনিক রচনায় খুব চলিত।

শ্রীমান্ এর ,, লক্ষ্মীমান্
বুদ্ধিমান্ এর ,, জ্ঞানমান্
হনুমান্ এর ,, ভাগ্যমান্
} স্ত্রীলোকের মুখে শুনা যায়, কেতাবেও দেখিয়াছি।

মদীয়, ত্বদীয়, তদীয় র, যাবদীয় তাবদীয় (যাবতীয় তাবতীয়)

তথাচ
তত্রাপি } র ,, তত্রাচ

ইষ্ট, অনিষ্টর ,, ঘনিষ্ট, (ঘনিষ্ঠ, ইষ্ঠ প্রত্যয়)

রথীর ,, দাশরথী (দাশরথি

ঔষধির ,, ঔষধি (ঔষধ)

বাহ্নিক (বাহ্য)। সৌকার্য্য (সৌকর্য্য)।

(/০) দ্বিবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক, রাজনীতিক
দ্বৈবার্ষিক, ত্রৈবার্ষিক, রাজনৈতিক
} দুই রূপই হয় কি?

(৵০) চতুর্দ্দিক্‌ময়, জগৎময়।

এ দুইটি স্থলে সন্ধি হয় নাই কেন? ইহা কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র 'ময়' প্রত্যয় (যেমন ঘরময় জল, পথময় কাদা)?

(৶০) ঘোরতর, গুরুতর, গাঢ়তর বহুতর—শব্দগুলির বাঙ্গালায় যেরূপ অর্থে ব্যবহার হয়, তাহাতে সন্দেহ হয়, এগুলি সংস্কৃত উৎকর্ষবাচক 'তর' প্রত্যয় কি খাঁটী বাঙ্গালা স্বতন্ত্র 'তর' প্রত্যয় (যথা বেতর, কেমনতর, এমনতর)?

(।০) সৎ শব্দের দুই অর্থের প্রভেদ করিবার জন্য :এক অর্থে 'সত্তা' ও অন্য অর্থে 'সততা' পদ প্রস্তুত করা হয়। শেষেরটির বেলায় শব্দটিকে অজন্ত করিয়া লওয়া হয়। অদ্ভুত!

(।/০) বুদ্ধিমন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ, লক্ষ্মীমন্তঃ (লক্ষ্মীবন্তঃ) প্রভৃতি বহুবচনান্ত পদের বিসর্গবিসর্জ্জন করা হয় ও একবচনে প্রয়োগ করা হয়। ইহা কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র প্রত্যয়?

(।৵০) সংস্কৃত শব্দের প্রথমার একবচনকে বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া ধরাতে নিম্নলিখিত অশুদ্ধ পদগুলি হইয়াছে—স্বামীত্ব, কর্ত্তাত্ব, চন্দ্রমাবৎ, অত্মামর, মহিমাময়, কালিমাময়, ভাগ্যবান্‌তর (মাইকেল)!

(।৶০) কেহ কেহ 'ইতিমধ্যে' 'ইতিপূর্ব্বে' অশুদ্ধ বলেন, "ইতোমধ্যে' 'ইতঃপূর্ব্বে' শুদ্ধ বলেন। কেন, তাঁহারাই জানেন। কেহ কেহ আবার 'ইতোপূর্ব্বে' লিখিয়া বসেন!

(॥০) রক্তিমতা, প্রসারতা, বিমর্ষতা, উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, সখ্যতা, মৈত্রতা, ঐক্যতা, হ্রাসতা, লাঘবতা, সৌজন্যতা, আধিক্যতা (ইহা হইতেই কি বাঙ্গালা আধিক্যিতা?) শমতা, শীলতা, এগুলিতে ভাবার্থক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে। বৈরক্তি, বৈভব ঠিক ওরূপ না হইলেও (স্বার্থিক প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন); বিরক্তি বিভব দ্বারাই উহাদের অর্থ প্রকাশ করা যায়। নিরাকার অর্থে নৈরাকার, নিরাশ অর্থে নৈরাশ, বিমুই অর্থে বৈমুখ প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়। 'সৌগন্ধ', 'অনবধানতা,' অজ্ঞানতা, বহুব্রীহি করিয়া রাখা যায়। সংস্কৃতে 'কুতূহল', 'কৌতূহল', দুইই আছে।

(॥/০) মান্যমান্‌, আবশ্যকীয়। এখানে বিশেষণের উত্তর প্রত্যয় করিয়া আবার বিশেষণ করা হইয়াছে।

(॥৵০) শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে।

(॥৶০) পৌত্তলিক, সাহিত্যিক, মানব হইতে মানবিক ও মানবীয়, বৈষ্ণবীয়, নামীয়, নামিক। এগুলি ভুল না হইলেও বাঙ্গালায় উদ্ভাবিত, সংস্কৃতে বোধ হয় প্রয়োগ নাই।

(৷৷০) স্বত্ব ও সত্তা ও সত্ব (গুণ) এই তিনটি শব্দের বাণানে গোল হইতে দেখা যায়।

(৷৷/০) খাঁটী বাংলা শব্দে কথন কথন সংস্কৃত প্রত্যয় লাগাইয়া দোআঁশলা

পদ নির্ম্মাণ করা হয়। যথা, ছোটত্ব, বড়ত্ব, হিন্দুত্ব, একঘেয়েত্ব; এরূপ উদাহরণ খুব কম।

কৃৎ প্রত্যয়।

অরুন্তুদ র দেখাদেখি মর্ম্মন্তুদ
আবহমান র ,, প্রবহমাণ
রোরুদ্যমান র ,, রুদ্যমান
অযশস্কর' র ,, লজ্জাস্কর
পোষ্য র ,, চোষ্য (চূষ্য)
গৃহীত র ,, গৃহীতা (গ্রহীতা)
সজ্জিত র " মজ্জিত (ণিচ করিলে হয়)
চূর্ণিত র ,, পূর্ণিত
উদীয়মান র ,, অস্তমান (অস্তমান বহুব্রীহি?)

'উদীয়মান' অনেকে ভুল বলেন। কিন্তু উৎ+ঈ দিবাদিগণীয় (গত্যর্থক) আত্মনেপদী আছে, অতএব ইহা শুদ্ধ।

(/০) অনট্ প্রত্যয়।

(১) সৃজন (সর্জ্জন) অক্ষয়কুমার দত্ত চালাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যেও দেখা যায়। বিসর্জ্জনে তাল ঠিক আছে।

(২) সিঞ্চন (সেচন) বঙ্কিমচন্দ্র চালাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যেও নাকি আছে।

(৩) বিকীরণ (বিকিরণ) বিকীর্ণর দেখাদেখি? াকরণে তাল ঠিক আছে!

(৪) উদ্গীরণ (উদ্গিরণ) উদ্গীর্ণর দেখাদেখি?

(৫) লিখন, মিলন } দুইই ঠিক।
লেখন, মেলন }

(৵০) ক্ত প্রত্যয়।

আহরিত (আহৃত) ণিজন্ত করিলে আহরিত
উচ্ছন্ন (উৎসন্ন) প্রাকৃতের নিয়মে এরূপ সন্ধি।

সিঞ্চিত (সিক্ত, ণিজন্ত সেচিত) 'সঞ্চিত'র দেখাদেখি?
গ্রন্থিত (গ্রথিত)
সৃজিত (সৃষ্ট, ণিজন্ত করিলে সর্জ্জিত)
বিসর্জ্জিত (বিসৃষ্ট, ণিজন্ত করিলে বিসর্জ্জিত)
খনিত (খাত)
চয়িত (চিত)
বপিত (উপ্ত)

শায়িত (শয়িত, ণিজন্ত করিলে শায়িত)
বরিত (বৃত) বিবরিত (বিবৃত)
কর্ত্তিত (কৃত্ত, ণিজন্ত করিলে কর্ত্তিত)
নিমজ্জিত (নিমগ্ন, ণিজন্ত করিলে নিমজ্জিত)
জানিত (জ্ঞাত, খাঁটী বাংলা 'জানা' ধাতু)
প্রবর্ত্ত (প্রবৃত্ত, উচ্চারণদোষ, যেমন ব্রত বর্ত্ত)
পক্ক (পক্ক)

ইচ্ছিত (ইষ্ট)
স্পর্শিত (স্পৃষ্ট ণিজন্ত করিলে স্পর্শিত)
প্রহারিত (প্রহৃত, ণিজন্ত করিলে প্রহারিত)
অনুবাদিত (অনূদিত)
অবিসংবাদিত (অবিসংবাদী লেখাই সুবিধা)
কেহ কেহ 'তারকাদিভ্য ইতচ্' এই তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া সামলাইতে চাহেন, কিন্তু এগুলি ঐ সূত্রের স্থল কি না, তাহা বিচার্য্য

(৶০), ণক প্রত্যয়।

কৃষক (কর্ষক) } খুব চলিত।
পর্য্যটক (পর্য্যাটক) }

'ণক', প্রত্যয় না করিয়া অন্য প্রকারে নাকি 'কৃষক' 'পর্য্যটক' সাধা যায়।

(।০) শানচ্ প্রত্যয়।

ঘূর্ণায়মান (ঘূর্ণ্যমান)
কম্পবান (কম্পমান, তদ্ধিত হইলে কম্পবান্

(।/০) শতৃ প্রত্যয়।

'অজানত', ধরিলাম শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ, বাঙ্গালায় অজস্র হইয়াছে। 'রাগত করত', 'হওত' এ গুলি কি ?

(।৶০) তব্য অনীয় য।

(১) বর্ণিতব্য (বর্ণয়িতব্য)
(২) পরিত্যাজ্য (পরিত্যাজ্য)
(৩) দোষণীয় (দূষণীয়)
(৪) সহ্যনীয় (সহনীয়) } এ তিনটীস্থলে
(৫) গ্রাহ্যণীয় (গ্রহণীয়) "অনীয়" "য"
(৬) মান্যনীয় (মাননীয) দুইই হইয়াছে।
(৭) দুষ্পাঠ্য, সুপাঠ্য, দুর্ব্বোধ্য সুবোধ্য, প্রভৃতি নাকি 'য' প্রত্যয়ের স্থল নহে ; দুষ্পঠ ইত্যাদি হইবে।

পণ্ডিতজনের মুখে শুনি, 'হত্যা একা বসি বা পূর্ব্বপদ হইলে, যথা হত্যাকারী, হত্যাকাণ্ড "য' প্রত্যয় হয় না। পরপদ হইলে শুদ্ধ প্রয়োগ,—জীবহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা।

চপলিত, প্রফুল্লিত, ব্যাকুলিত, নিঃশেষিত, বিহ্বলিত, উদ্বেলিত এ কয়টি স্থলে 'ক্ত' বা ইতচ্ (তদ্ধিত) উভয়ই অযুক্ত; একত্রিত আরও অযুক্ত, কিন্তু খুব চলিত; প্রথম কয়েকটি স্থলে নামধাতু করা চলে কি ? 'ব্যাকুলিত' পঞ্চতন্ত্রে দুই একস্থলে আছে।

জ্ঞাতার্থে, তদ্দৃষ্টে, বয়ঃপ্রাপ্তে (পদ্মিনী উপাখ্যান), সশঙ্কিত, সভীত, সচকিত, সচেষ্টিত প্রভৃতি স্থলে'ভাবে ক্ত' করিলে চলে না কি ? সংস্কৃত ভাষায় 'চেষ্টিত' প্রভৃতি পদ ভাবে ক্ত করিয়া প্রায়ই সিদ্ধ হইতে দেখা যায়।

'আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম' এখানে জ্ঞাত শব্দের কিরূপে অন্বয় হইবে ? এখানে কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় ধরিতে হইবে কি ?

(।৵০) বিবিধ।

(১) নিন্দুক (নিন্দক)
(২) জাগরুক (জাগরূক)
(৩) সমুদায়, সমুদয় দুইই ঠিক।
(৪) সম্ উপসর্গযুক্ত সম্মান, সম্মতি, সম্মত সম্মিলন, সম্মুখ, অনেকে সন্মান সন্মতি ইত্যাদি বাণান (ও উচ্চারণ) করেন। সৎ শব্দের সঙ্গে সন্ধি করিলে এরূপ হইতে পারে।

(৬) বিশেষ্য-বিশেষণে গোলযোগ।

১। কতকগুলি বিশেষণ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা, 'আবশ্যক' (ইহার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই), 'ভদ্রস্থ' (এখানে ভদ্রস্থ নাই), অগ্রাহ্য' (তিনি এ কথাটা অগ্রাহ্যের সুরে বলিলেন), 'মতিচ্ছন্ন' (তোমার মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে), 'মান্য' (তোমার মান্য বাড়িয়া গিয়াছে), সাক্ষী=সাক্ষ্য (সে সাক্ষী দিবে), সাধ্য (আমার সাধ্য নাই, 'সাধ্য নহে' ঠিক), চেতন পাইয়া 'সাবকাশ' (আমার সাবকাশ নাই), 'সৌরভ' অর্থে 'সুরভি'। সম্ভ্রান্তশালী সহ্যাতীত, সাধ্যাতীত, আয়ত্তাধীন, অধীনস্থ, খ্যাতাপন্ন, এ সকল স্থলে সম্ভ্রান্ত, সহ্য, সাধ্য, আয়ত্ত, অধীন, খ্যাত, এগুলিকে বিশেষ্য ধরা হয় নাই কি ?

২। পক্ষান্তরে, কতকগুলি বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় 'হওয়া বা করা,' দিয়া অধিকাংশ ক্রিয়াপদ নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'হওয়া' দিয়া যে সব ক্রিয়াপদ হইয়াছে, সেইগুলিতেই এই দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। যথা স্কুল বন্ধ হইয়াছে (পূর্ব্ববঙ্গে 'বদ্ধ' হইয়াছে বলে, সেইটাই শুদ্ধ), এক্ষণে বিদায় হই, তিনি আরোগ্য হইয়াছেন, এ কথায় বড় সন্তোষ বা পরিতোষ হইলাম, ইহা বেশ উপলব্ধি হইয়াছে, তিনি নির্বিঘ্নে প্রসব হইয়াছেন, সে ঘোর উন্মাদ হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহেই আমি প্রতিপালন হইতেছি, তাঁহার নাম লোপ হইবে ('নামলোপ' সমাস করিলে আর গোল নাই, তিনি মৌন রহিলেন দেবতা অন্তর্ধান হইলেন, কি কথায় কি কথা উৎপত্তি হইল, তুমি অপমান হইবে (অপ-মান বহুব্রীহি চলে ?), চৈতন্য হইয়া দেখিলাম (কমলাকান্ত)।

৬। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি একটু স্বতন্ত্র। তাঁহাকে বড় বিমর্ষ দেখিলাম, ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্থানটি ধ্বংসপ্রায়, সে নিশ্চয় আসিবে, ইহা অতীব প্রয়োজন, সম্মুখে সমূহ বিপদ। 'অতিশয়' ও 'বিশেষ' প্রায়ই বিশেষণ-রূপে বসে। 'কল্যাণবর' এখানে কল্যাণ বিশেষণ। সংস্কৃত ভাষায় এই তিনটি শব্দ বিশেষণও হয়। ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দকে অনেকে বিশেষণ করিয়া বসেন (রক্তিম হইয়া যায়, নীলিমা নীলিম হইয়া যায়)।

(৭) পুনরুক্তিদোষ (Tautology) ও অবাচকতা-দোষ।

পুনরুক্তি।

১। সহ শব্দ যোগে। সকাতরে, সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, সবিনয়-পূর্ব্বক, সাবধান-পূর্ব্বক, সক্ষম, সঠিক, সচঞ্চল, সচেষ্টিত, সচকিত, সভীত, সশঙ্কিত। এ সকল স্থলে, বিশেষণের সঙ্গে সহ যোগ করা হইয়াছে। 'সচেতন' 'সকরুণ' 'সপ্রমাণ' ভুল নহে, কেন না 'প্রমাণ' 'চেতনা' 'করুণা', ভাবার্থক বিশেষ্যপদ আছে; 'ক্ষমা' শব্দেরও যদি ক্ষমতা অর্থে চল থাকিত, তাহা হইলে 'সক্ষম'ও ঠিক হইত। 'চকিত', 'চেষ্টিত' 'ভীত' 'শঙ্কিত' প্রভৃতি স্থলে যদি ভাববাচ্যে ক্ত ধরা যায়, তাহা হইলে সচকিত ইত্যাদি রাখা চলে। সংস্কৃতে এরূপ 'ভাবে ক্ত' র উদাহরণ অনেক আছে। ভাবে ক্ত করিলে 'তদ্দৃষ্টে' ও 'জ্ঞাতার্থে, ও 'খ্যাতাপন্ন'ও রাখা যায়। বাঙ্গালায় ভাবে 'ক্ত' নাই কি ? 'ইহার একটা বিহিত করিতে হইবে'। এখানে ভাবে 'ক্ত' নহে কি ?

২। ভাবার্থক প্রত্যয় দুইবার লাগান। ঐক্যতা, সখ্যতা, মৈত্রতা, সৌজন্যতা, আধিক্যতা (ইহা হইতেই কি চলিত শব্দ আধিক্যিতা ?) হ্রাসতা, রক্তিমতা, লাঘবতা, উৎকর্ষতা, বিমর্ষতা, প্রসারতা ঔৎকর্ষ, শমতা, শীলতা, ইত্যাদি। 'অনবধান' 'সুগন্ধ' যখন বিশেষ্য হইতে পারে, তখন 'অনবধানতা' ও 'সৌগন্ধ' নিষ্প্রয়োজন। 'অজ্ঞানতা' সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তবে সংস্কৃতেও শব্দ দুইটি আছে। নৈরাশ, নৈরাকার ও বৈমুখ বিশেষণভাবে ব্যবহৃত হওয়া ভুল।

৩। যেখানে বহুব্রীহি হইতে পারিত, সেখানে কর্ম্মধারয় বা তৎপুরুষ সমাস করিয়া অস্ত্যর্থক প্রত্যয়যোগ। যথা, অতিবুদ্ধিমান্, মহাভাগ্যবান্ (চৈতন্যভাগবতে), সাবধানী, নির্দ্দোষী, অরোগী, স্থলচর্ম্মী, নিরপরাধী, নির্ব্বিরোধী, পশুধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, সুগন্ধী নীরোগী, নির্ধনী, বহুরূপী, মহারথী, মহাপাপী খুব চলিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের নাকি ইন্ প্রত্যয় দিয়া দুই এক স্থলে বহুব্রীহি হয়।

'ইনী' দিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে, স্বীকার না করিলে, নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ পদগুলি (ইন্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' ধরিলে) এই শ্রেণীতে পড়ে। যথা অনাথিনী, নির্দ্দোষিনী, নিরপরাধিনী, দুরাচারিণী, সুকেশিনী, হেমাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী গৌরাঙ্গিনী, শ্যামাঙ্গিনী; অর্দ্ধাঙ্গিনী চৈতন্যরূপিণী, জ্ঞানস্বরূপিণী, রুদ্ররূপিণী।

৪। আবশ্যকীয়, মান্যমান্, এ দুইটি স্থলে বিশেষণের উত্তর আবার বিশেষণবাচক প্রত্যয় করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মান্যনীয়, গণ্যনীয়, গ্রাহ্যনীয়, সহ্যনীয়, এ সকল স্থলে 'য' ও 'অনীয়' উভয় প্রত্যয়ই করা হইয়াছে।

৫। শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দুইবার করা হইয়াছে।

৬। বিবিধ। পরমকল্যাণবর, বিবিধপ্রকার, কিরূপপ্রকার, এবংপ্রকারে, যদ্যপিও, তথাপিও, (বাঙ্গালা 'ও' 'অপি'র অপভ্রংশ, সংস্কৃত 'অপি' বাঙ্গালীর মুখে 'ওপি') যদ্যপিস্যাৎ, কেবলমাত্র, সমতুল্য (সমতুল ঠিক)।

'উর্দ্ধোন্মুখ', 'সমতুল্য' প্রভৃতির মত পুনরুক্তি দোষদুষ্ট। 'বিকচোন্মুখ' 'প্রফুল্লোন্মুখ', 'স্খলিতোন্মুখ' এ গুলি কি ?

'যোগাযোগ' 'মতামত' 'পারাপার' 'ভরাভর' বোধ হয় বাঙ্গালা শব্দদ্বৈতের নিয়মে হইয়াছে; (যথা, টপাটপ, গবাগব ইত্যাদি) এস্থলগুলিতে দ্বিতীয়-পদে নঞর্থ সূচিত হইতেছে কি?

অবাচকতা-দোষ।

আগত কল্য, কিঞ্চিৎ, বুঝাইতে কথঞ্চিৎ, বর্ত্তমান অর্থে বক্ষ্যমাণ, অত্রস্থান, চক্ষুঃ মুদ্রিত অর্থে মুদিত, পঠদ্দশা অর্থে পাঠ্যাবস্থা। এ প্রয়োগগুলি অদ্ভুত। 'সশরীরে উপস্থিত' প্রায়ই দেখা যায়। অশরীরেও উপস্থিত হওয়া যায় নাকি? তীর্থ দর্শন করা, অর্থে "তীর্থ করা" ও গয়ায় পিণ্ড দেওয়া অর্থে 'গয়া করা,' চলিত ভাষায় শুনা যায়। এটা কি লক্ষণা?

(৮) সমাসপ্রকরণ।

১। 'সমস্ত' পদ এক সঙ্গে না রাখিয়া অনেক মুদ্রিত পুস্তকে পদগুলির মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান রাখা হয়। 'বাঘ' একদিকে থাকিল আর তা'র 'ছাল' আর এক দিকে থাকিল; 'মাথা' এক পাড়ায় 'ব্যথা' আর এক পাড়ায়; 'একবাক্যে' একবাক্যত্ব-রক্ষা হইল না; 'উভয় তীরস্থ,' 'সরোবর তীরে' ইত্যাদি স্থলে দুইটি পদের মধ্যে যেন এক একটি নদীর ব্যবধান! এইরূপ ব্যবস্থায় কবি উমাপতিধর 'ধর' উপাধিধর বলিয়া অবধারিত হইয়া পড়েন! ভীমসেন কোন্ দিন বা বৈদ্য জাতির মধ্যে পড়িবেন! এই দোষ অবশ্য কম্পোজিটারের অজ্ঞতায় ও প্রুফরীডারের শিথিলতায় ঘটে। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাঙ্গালা লেখকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয়। নাম লেখার সময়, বংশগত উপাধি স্বতন্ত্র লিখিলে বাঙ্গালায় চলিতে পারে, কিন্তু নামের পদদ্বয় (কোথাও কোথাও পদত্রয়) একত্র লেখা উচিত; কেন না তাহারা 'সমস্ত' পদ। ইংরাজী কায়দায় L. K. Banerjee লেখাও সঙ্গত নহে, কেন না F. J. Rowe নামে যেমন দুইটি স্বতন্ত্র Christian name, হিন্দুর নামে সেরূপ নহে। L. Banerjeeই সঙ্গত, অথচ সেইটাকেই অনেকে সাহেবী মনে করেন।

২। কেহ কেহ আসক্তি-চিহ্ন (hyphen) দিয়া পদগুলির সংযোগ নির্দ্দেশ করেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজীর (compound word এর) নকলে এরূপ করা হয়; তবে ইংরাজীতে সর্ব্বত্র (অর্থাৎ সকল compound word

এর বেলায়) এ ব্যবস্থা নাই। হিসাবমত ধরিতে গেলে এ ব্যবস্থা সমাস-স্থলে ঠিক নহে, কেন না যখন 'একপদীকরণং সমাসঃ' তখন পদগুলি একেবারে যুড়িয়া যাওয়াই ঠিক। দীর্ঘসমাসস্থলে বা যেখানে অর্থগ্রহে খট্‌কা লাগিতে পারে (ambiguity) সে সকল স্থলে অর্থগ্রহের সুবিধার জন্য আসক্তিচিহ্ন দেওয়া মন্দ নহে।

৩। চলিত বাঙ্গালা শব্দে বা আরবী পার্শী ইংরাজী শব্দে ও খাঁটি সংস্কৃত শব্দে সমাস হইতে দেখা যায়। এরূপ দোআঁশলা পদ এক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু অনেকগুলি, এতই চলিত যে সেগুলিকে ভাষা হইতে নির্ব্বাসন করা বড় সহজ নহে। যথা কমল আঁখি (প্রাচীন কবিতায়, এখানে সন্ধি হয় নাই), জগৎভরা (এখানেও সন্ধি হয় নাই), সজোরে, সজাগ, সঠিক, নির্ভুল, মাথাব্যথা, মা'রমূর্ত্তি, কাযকর্ম্ম, বিত্তপসার (এই কথাটি বরিশালে শুনিয়াছি), পসারপ্রতিপত্তি, করযোড়ে, কোণঠেসা, আত্মহারা, আপনা-বিস্মৃত, পতিহারা, মুখচোরা, মুখপোড়া, বানরমুখো, একচোখে নাড়ীছেঁড়া, এলোকেশী, ডাকযোগে ; সবুট, কোটপ্যাণ্টধারী, কোয়েটাপ্রবাসী, য়ুরোপপ্রবাসী, ইংলণ্ডেশ্বরী, লিষ্টিভুক্ত, স্কুলভবন, অফিসগৃহ, তৌজিভুক্ত, নথিভুক্ত, অসামী-শ্রেণীভুক্ত, অকুস্থল, বিলাতপ্রত্যাগত, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে গ্যাসালোকিত, হীরামণিখচিত, আলোরক্ষা, গোগাড়ী কেমন কেমন শুনায়। 'শকুন্তলাতত্ত্বে' ফোটনোন্মুখ, 'ফুল ও ফলে' 'ফোটনোন্মুখী', এই জাতীয় উদাহরণ না ছাপার ভুল ?

৪। নিম্নলিখিত 'সমস্ত' পদগুলিতে একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। যথা, 'বাক্য বা প্রবন্ধরচনায়,' 'শিক্ষা ও অভ্যাসসাপেক্ষ,' 'সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক-ভেদে', 'শকুনি গৃধিনী ও শিবাকুল,' 'ভয় ও ভক্তিমিশ্রিত,' 'দুঃখ ও শোক-পরিপূর্ণ', 'অর্থ ও সময় অভাবে,' 'আমিষ ও নিরামিষ আহার,' 'পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, লাহোর, এমন কি সুদূর কোয়েটাপ্রবাসী,' ইত্যাদি। এ সকল স্থলে বীজগণিতের নিয়মে শেষ পদটি উভয় অংশের সাধারণ সম্পত্তি (common factor) বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে কি ? "সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ" ব্যাকরণের এইরূপ কোন সূত্রে ইহার মীমাংসা হয় কি ? [বাঙ্গালায় একরূপ প্রয়োগরীতি আছে, যথা, নীতি ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত, ক্ষুদ্র ও মহতের প্রভেদ, বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে ; এ সকল স্থলে শেষ পদে বিভক্তি দিলেই চলে। উপরি-নির্দ্দিষ্ট সমাসগুলির বেলায়ও কি সমাসের শেষ পদটি বিভক্তির মত সাধারণ সম্পত্তি (common factor) ?

৫। সমাসে প্রত্যয়ের বা প্রত্যয়ের অংশবিশেষের লোপ, বিভক্তিলোপ, আদেশ, আগম, প্রত্যয় প্রভৃতি যে সকল রূপান্তর সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে ঘটে, বাঙ্গালায় অনেকস্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। [পক্ষান্তরে, বাঙ্গালায় এমন কতকগুলি আগম, আদেশ প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে লেখে না ; যথা নিশিদিন, এই স্থলে নিশা বা নিশ্ স্থানে নিশি আদেশ (অলুক্ সমাসের স্থল নহে), হৃদিবৃন্দাবন, এখানে হৃদ্ স্থানে হৃদি আদেশ (এখানেও অলুক্ সমাসের স্থল নহে), সমভূম, মানভূম, বীরভূম, সিংহভূম এই চারিটি স্থলে ভূমি স্থানে ভূম আদেশ ; মরুভূম, বঙ্গভূম, রঙ্গভূমও দেখিয়াছি। বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র 'নিশি' 'হৃদি' ও 'ভূম' শব্দ কল্পনা করিতে হইবে কি ?) উদাহরণ দিতেছি।—

(৴০) পূর্ব্বপদ ঋকারান্ত। বিধাতাপুরুষ, পিতারূপী, দুহিতানির্বিশেষে, ভ্রাতাদ্বয়, দুহিতামঙ্গল, পিতাস্বরূপ, ভ্রাতা অর্থে, শাসনকর্ত্তারূপে, বিধাতানির্ম্মিত সবিতাদেব, শ্রোতাগণ, ক্রেতাগণ, বক্তাগণ ; স্বসাসুখ (হেমচন্দ্র)। পরপদ ঋকারান্ত, সভ্রাতা।

(৵০) পূর্ব্বপদ অন্‌ভাগান্ত বা ইন্‌ভাগান্ত। যুবাপুরুষ, আত্মাপুরুষ, পরমাত্মারূপে, রাজাভ্রমে, রাজাপ্রজাসম্বন্ধে, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর, ব্রহ্মাকমণ্ডলে (হেমচন্দ্র), মহাত্মাগণ, দুরাত্মাগণ, মহিমারঞ্জন, মহিমাধ্বজা, মহিমাহার (হেমচন্দ্র) মহিমানাথ, মহিমাপ্রচার, মহিমাকিরণে (হেমচন্দ্র), গরিমাবৃদ্ধি (মহিমা বা গরিমার পর একটা 'আ' উপসর্গ ধরিব ?), হস্তীপৃষ্ঠে, তপস্বীবেশে, পক্ষীশাবক, শিখীপুচ্ছ, শিখীসহ, বাজীপৃষ্ঠে, বনকরীযূথ, অশ্বারোহীদ্বয়, অধিবাসীবর্গ, স্বামীগৃহে, স্বামী-পুত্র স্বামীরত্ন, রোগীচর্য্যা, পরীক্ষার্থীমাত্রেই, প্রাণীশূন্য, শশীরশ্মি (হেমচন্দ্র), শশীভূষণ, গুণীগণ, গুণীবিশারদ (হেমচন্দ্র, সাক্ষীস্বরূপ, ধনীদরিদ্র, সন্ন্যাসীদত্ত, শাস্ত্রীবিরচিত, শর্ম্মাকর্ত্তৃক, বৈরীপদধূলি, কারাবন্দীসম, প্রাণীহাহাকার, কেশরীনাদ, প্রাণীবৃন্দ, রাঘবশর্ম্মাসমভিব্যাহারে, মহাত্মাদ্বয়, রক্তিমাবর্ণ, উত্তরাধিকারীবিরহিতা।

(৶০) পূর্ব্বপদ বৎ, মৎ, শতৃ, স্যতৃ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত (তান্ত)। ভগবান্ চন্দ্র, হনুমান্ প্রসাদ ভগবান প্রদত্ত কীর্ত্তিমান্ গণ। জগবন্, জগমোহন এই দুইটিস্থলে 'ৎ' র লোপ প্রাকৃতেও আছে। হসন্তবর্ণকে অজন্তভ্রমে—জগত-জীবন, জগত-মাতা, বিদ্যুতাগ্নি, বিদ্যুত-অনলে, তড়িত-কিরণ। (সব কয়টি হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে আছে)।

(।০) পূর্ব্বপদ অস্‌ভাগান্ত বা বিসর্গান্ত। বিসর্গবিসর্জ্জনে এই পদগুলি

হইয়াছে। কুযশকাহিনী (ভারতচন্দ্র), চক্ষুকর্ণের, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুরোগ, চক্ষুদান, চক্ষুদ্বয়, চক্ষুপীড়া, চক্ষুগোচর, চক্ষুজল, দীর্ঘায়ুলাভ, আয়ুক্ষয়, আয়ুহীন, ধনুদণ্ডে (হেমচন্দ্র), জ্যোতীন্দ্র, তেজসখা, তেজসম্পন্ন, শিরশোভা, সন্তোভিন্ন, শঙ্করশির-শোভিনী, তেজেন্দ্র, তেজেশ, রক্ষেন্দ্র, স্রোতমুখে, স্রোতমধ্যে, স্রোতশীলা, স্রোতবেগে, স্রোতাভ্যন্তরে, সন্তোমুক্ত, সন্থবিধবা, অপগণ্ড, বয়ক্রম, বক্ষোপরি, বক্ষবসন, ছন্দৈশ্বর্য্য, ছন্দালোচনা মনমত, মনচোরা, মনমরা, মনহর, মনসাধ, মনপ্রাণ, মনমোহন, মনমোহিনী, মনকল্পিত, মনাগুন, মনান্তর, মনচিত্রে (হেমচন্দ্র), যশ-পিপাসা (হেমচন্দ্র), চন্দ্রমাকিরণে। পরপদ অস্‌ভাগান্ত। সতেজ নিস্তেজ কৃত্তিবাস ঠিক, কেননা বস্ত্র অর্থ 'বাস' শব্দ আছে), প্রফুল্লমন (বহুব্রীহি), অন্যমনা, দৃঢ়চেতা, অহরহ (বিসর্গবিসর্জ্জন)। অস্‌ভাগান্ত শব্দকে অজন্ত করিয়া লইয়া 'বয়সোচিত' হইয়াছে, অপ্সরস্‌ শব্দের প্রথমার একবচনের পদ 'অপ্সরাঃ' কল্পিত করিয়া লইয়া তাহার বিসর্গবিসর্জ্জনে অপ্সরা হইয়া অপ্সরাগণ (ভারতচন্দ্র) হইয়াছে? অপ্সর শব্দও বাঙ্গালায় দেখি।

(।/·) বিবিধ। মহারাজ্ঞা (মহারাজ; আগে সমাস না করিলে মহারাজ্ঞী চলে, তবে মহারাজের স্ত্রীলিঙ্গ নহে), উভচর (উভয়চর, বিদ্যাসাগর মহাশয় চালাইয়াছেন), নিরাশা (নিরাশ, নিরাশা স্ত্রীলিঙ্গে চলে) মহদুপকার মহদাশয় (ষষ্ঠী তৎপুরুষে চলে, কর্ম্মধারয়ের সঙ্গে অর্থভেদ যথেষ্ট), পিতামাতা (মাতাপিতা), পিতৃমাতৃহীন (মাতাপিতৃহীন), পিতৃমাতৃঅঙ্কে (মাতাপিত্রঙ্কে), সত্যসখা (বহুব্রীহি সমাস হইলে চলে), প্রিয়সখা, সখাভাবে (সখিভাবে), স্ফুরন্তযৌবনা (স্ফুরদ্‌যৌবনা) সখারূপে (সখিরূপে) বিদ্বান্‌সমাজ (বিদ্বৎসমাজ)।

সুগন্ধী [সুগন্ধি, 'সুগন্ধ' শব্দে ইন্‌ প্রত্যয় ধরিলে পুনরুক্তি (tautology) হয়], অতিমাত্রা (অতিমাত্র], পন্থানুসরণ (পথানুসরণ) অসৎপন্থাচারিণী (অসৎপথচারিণী) খ্রীষ্টপন্থা (খ্রীষ্টপথ)। নানকপন্থী কবীরপন্থী কি ব্যাকরণ পরিপন্থী নহে? পথশ্রম, পথরোধ, পথ দর্শক (পথিন্‌ শব্দ হইলে পথি হইবে, সংস্কৃতে নাকি 'পথ' শব্দও আছে), অহোরাত্রি, দিবারাত্রি, দিনরাত্রি, অহর্নিশি, দিবানিশি, দিবাসনিশায় (হেমচন্দ্র) (অহোরাত্র, দিবারাত্র, দিনরাত্র অহর্নিশি দিবানিশ)।

সমর্থনের যুক্তি।

কতকগুলি স্থলে সংস্কৃত পুংলিঙ্গের (ঋকারান্ত শব্দের বেলায় স্ত্রীলিঙ্গেরও) প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া স্বীকার করিলে এ সম

সমাসের সমর্থন চলে। যথা বাঙ্গালায় পিতৃ শব্দ নহে পিতা শব্দ, মাতৃশব্দ নহে মাতা শব্দ, সখিশব্দ নহে সখা শব্দ, আত্মন্ শব্দ নহে আত্মা শব্দ, স্বামিন্ শব্দ নহে স্বামী শব্দ, হনূমৎ শব্দ নহে হনূমান্ শব্দ। এইরূপ বণিক্, সম্রাট্, বিদ্বান্, মহিমা, যুবা। বাস্তবিকও ত প্রথমান্ত শব্দগুলিতেই বাঙ্গালায় বিভক্তি লাগান হয়, যথা পিতার (পিতৃর নহে) স্বামীকে (স্বামীন্‌কে নহে)। পিতৃমাতৃহীন, পিতৃমাতৃ অঙ্কে এ দুইটি স্থলে সমাসে কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমরা মহতের লিখি, মহানের লিখি না। এস্থলেও ব্যতিক্রম। এইরূপ বাঙ্গালায় মহৎ, মহান্, মহা * শব্দত্রয়, পন্থাঃ পন্থা, পথ শব্দত্রয়, চক্ষুঃ চক্ষু চক্ষ শব্দত্রয়, দিক্ দিশ দিশা দিশি শব্দচতুষ্টয়, নিশা নিশি শব্দদ্বয়, হৃৎ হৃদি শব্দদ্বয়, ভূমি ভূম শব্দদ্বয় উপরি উপর শব্দদ্বয় বলবান্ বলবৎ বলবন্ত ইত্যাদি ধরণের শব্দত্রয় আছে বলিলে প্রশ্নটি অনেক সরল হয়। গণ, সমূহ, বৃন্দ, কুল, চয়, বর্গ শব্দগুলিকে বহুবচনের চিহ্ন, (বিভক্তি), 'দ্বরা' 'কর্ত্তৃক' 'সহ' 'সমিব্যাহারে'কে করণকারকের চিহ্ন (বিভক্তি) ধরিয়া লইলেও সুবিধা হয়।

[বিসর্গান্ত শব্দকে বিকল্পে অকারন্ত ধরিবার সংস্কৃতেও নাকি নজীর আছে। 'পিণ্ডং দত্বাৎ গয়াশিরে' এইরূপ একটা শিষ্ট প্রয়োগ থাকাতে 'শির' শব্দও আছে, কেহ কেহ বলেন।]

পূর্ব্বপ্রদত্ত যুক্তির খণ্ডন।

ইহার উত্তরে অপর পক্ষ বলেন, যখন সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত শব্দে সন্ধিসমাস হইবে, তখন সংস্কৃতের ধাতটা ঠিক বজায় রাখাই সুযুক্তি। যখন 'রা' দিগ' 'দিগের' প্রভৃতি খাঁটি বাংলা বিভক্তি দিয়া বহুবচন করিতেছ, তখন খাঁটি বাংলার নিয়মে কর। কিন্তু সংস্কৃত-শব্দযোজনাকালে সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়ম বাহাল রাখাই কর্ত্তব্য। লেখকদিগের শিক্ষা ও সংস্কারের তারতম্য অনুসারে উভয় প্রকার প্রয়োগই চলিত দেখা যায়।

সাবধানী, নির্দ্দোষী, নির্ব্বিরোধী, অরোগী, নীরোগী, নিরপরাধী (বঙ্কিমচন্দ্র), নির্ধনী, মহারথী, মহাপাপী, বহুরূপী, সুগন্ধী, বিধর্ম্মী, পশুধর্ম্মী, স্থূলচর্ম্মী অতিবুদ্ধিমান মহাভাগ্যবান, সুকেশিনী, অনাথিনী, নির্দ্দোষিনী, নিরপরাধিনী, দুরাচারিণী, শ্যামাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী গৌরাঙ্গিনী, হেমাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, রুদ্ররূপিণী, চৈতন্যরূপিণী, জ্ঞানস্বরূপিণী।

* নতুবা 'মহা আনন্দ 'মহা আস্ফালন' হয় না।

এ গুলির বিষয় পুনরুক্তিদোষ-প্রকরণে বলিয়াছি। সংস্কৃতব্যাকরণের, ইন্ প্রত্যয় দিয়া বহুব্রীহি দুই এক স্থলে হয়।

(৯) সন্ধি।

১। সমাস স্থলে সন্ধি অপরিহার্য্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের এই নিয়ম। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এক পক্ষ বলেন, বাঙ্গালায় এ সকল স্থলে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটুতা দোষ হয়। প্রতিপক্ষ বলেন; "সংস্কৃতভাষার ন্যায় শ্রুতিমধুর ভাষা জগতে অতি অল্পই আছে। সংস্কৃতভাষায় সন্ধি করিলে শ্রুতিমধুরতা নষ্ট হয় না, আর বাঙ্গালার বেলায় হয়? তবে কি বুঝিব, বাঙ্গালা লেখকদিগের মাধুর্য্যবোধশক্তি কালিদাস-বাণভট্ট শ্রীহর্ষ-জয়দেব অপেক্ষাও অধিক? ইহারও একটা জবাব সম্প্রতি মিলিয়াছে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলিয়াছেন, প্রাকৃত ভাষাগুলি সংস্কৃতভাষা অপেক্ষা অধিকতর শ্রুতিমধুর ও 'গউড়বহো' এবং কর্পূরমঞ্জরী হইতে এই মতের পোষক প্রমাণও দিয়াছেন। ('সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব', প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৭)। বাঙ্গালা কথাবার্ত্তার ভাষায় সন্ধি না করার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। আমরা শত অন্ন বলি শাতান্ন বলিনা, শাক অন্ন বলি শাকান্ন বলিনা, ষোড়ষ উপচারে পূজা বলি ষোড়শোপচারে বলি না, রক্ত আমাশয় বলি রক্তামাশয় বলি না, জ্বর অতিসার বলি জ্বরাতিসার বলি না। বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্র সন্ধির প্রযত্নটুকু করিতে নারাজ। তবে কথাবার্ত্তার এই বিশেষত্বটুকু লিখিত ভাষায়ও থাকা উচিত কিনা, তাহা বিচার্য্য।

২। এ সকল স্থলে সমাস করি নাই বলিয়া পার পাইবার যো নাই। কর্ম্মধারয় সমাসের বেলায় না হয় এ কথা বলিলেন; কেননা বাঙ্গালায় যখন বিশেষণে বচনকারক বুঝাইতে বিভক্তি দেওয়ার নিয়ম নাই, স্ত্রীলিঙ্গ (বা ক্লীবলিঙ্গ) বিশেষ্যের বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইলেও চলে, তখন কোন একটা স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে কি না, বলা কঠিন। তবে অবশ্য অসমস্ত পদ হইলে ব্যবধান থাকা উচিত। (সমাস করিলে অন্‌ভাগান্ত ইন্‌ভাগান্ত অস্‌ভাগান্ত প্রভৃতি শব্দ পুর্ব্বপদ হইলে সে গুলির প্রথমার একবচন কিন্তু 'সমস্ত' চলিবে না।) কিন্তু দ্বন্দ্ব বা তৎপুরুষ বহুব্রীহির ত কথাই নাই) সমাসের বেলায় সমাস না করিলে কিরূপে অর্থপ্রকাশ হইবে এবং কি করিয়াই বা অন্বয় হইবে? দ্বন্দ্ব সমাসেও না হয় বলা যাইতে পারে, উভয়পদের মধ্যে 'ও' 'বা' 'এবং' উহ্য আছে; বাঙ্গালার প্রয়োগরীতিতে যখন তিন চারিটি এককারকের

পদের বেলায় শেষ পদটির পূর্ব্বে 'ও' 'বা' এবং দিলে চলে (যথা—রাম সত্য ও হরিকে ডাক) তখন এরূপও চলিতে পারে। কিন্তু তৎপুরুষের বেলায় কি উপায়? 'কার্য্য উদ্ধার করা' এখানে না হয় উদ্ধারকে ক্রিয়াপদের অংশ ধরিলাম, ষষ্ঠী তৎপুরুষের প্রয়োজন হইল না; কিন্তু, কার্য্য উদ্ধারকল্পে, এখানে কি হইবে? 'বঙ্গমাতা উদ্ধারের'ই বা কি উপায়? বাঙ্গালায় 'দ্বারা' 'কর্তৃক' প্রভৃতিকে যেমন বিভক্তি-চিহ্ন (বা postposition) ধরিয়া লওয়া হয়, 'অনুসারে 'অনুযায়ী' 'অবলম্বনে' 'উপলক্ষে' 'কল্পে' প্রভৃতিকে সেইরূপ ধরা চলে কি? আকর্ষণ প্রভৃতির (verbal nounএর) ক্রিয়াপদের স্থায় কর্ম্ম থাকিতে পারে, এইরূপ ধরিলে 'ভক্তিআকর্ষণের' প্রভৃতিস্থলে সমাস হয় নাই, বলা চলে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বাঙ্গালায় কৃদন্ত পদের কর্ম্ম থাকে, যথা 'অন্ন আহার', এ সব স্থলে কর্ম্মকারকে বিভক্তি থাকে না, (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, অষ্টমভাগ প্রথম সংখ্যা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'।)

পদ্যে এইরূপ উদাহরণ খুব বেশী। হেম বাবুর কবিতাবলীতে প্রায় প্রতি পত্রে উদাহরণ পাইয়াছি। ছন্দের খাতিরে এরূপ হইয়া পড়ে বলিয়া সমর্থন করা চলে। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় ছন্দের জন্য ত এতদূর শিথিলতা আসে না।

উদাহরণমালা।

(১) দ্বন্দ্বসমাসে সন্ধির অভাব।

স্বরসন্ধি—সমার্থ বা বিপরীতার্থ বা সমপর্য্যায় শব্দযুগ্মকে সমাস।

(/০) সমার্থ—* আরাম আনন্দে, আদর আপ্যায়নে, উদ্যোগ আয়োজন, অর্চ্চনা আরাধনা, আমোদ আহ্লাদ, রত্ন-আভরণ, ধন-ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি।

(৵০) বিপরীতার্থ—ক্ষমতা অক্ষমতা, মান অপমান, ন্যায় অন্যায়, শুদ্ধ অশুদ্ধ, পক্ক অপক্ক ইত্যাদি।

* দ্বন্দ্বসমাসে সমার্থ শব্দব্যবহার, বাঙ্গালার একটা বিশেষত্ব। কখন দুইটি শব্দই সংস্কৃত কখন একটি সংস্কৃত অপরটি চলিত শব্দ, কখন একটি সংস্কৃত বা অপভ্রংশ শব্দ, অপরটি পার্শী বা আরবী। যথা, ভ্রমপ্রমাদ, পসারপ্রতিপত্তি, ভুলভ্রান্তি, বাছবিচার, ঝগড়াবিবাদ কাজিয়া-কলহ। ইহাকে নিরর্থকতাদোষ বলিয়া আলঙ্কারিকেরা নির্দ্দেশ করেন।

(১/০) সমপর্য্যায়—অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা, নিদ্রিত-অচেতন, অভাব-অভিযোগ, রথ-অশ্বের, অনাদর অত্যাচার, দেবতা ব্রাহ্মণ অতিথির, সত্য অহিংসাদি ধর্ম্মঅর্থ-সুখমোক্ষদায়িকে, কুণ্ঠা-উৎকণ্ঠা, বন-উপবন, বেদ-উপনিষদ্, হুহুঙ্কার-উত্তেজনায়, কলিঙ্গ-উৎকলের, অজ-ইন্দুমতী, পুরাণ-ইতিহাস, বিষ্ণুইন্দ্র, আকৃতি-অবয়ব, ইত্যাদি।

(২) তৎপুরুষ ও অন্যান্যসমাসে সন্ধির অভাব।

(/০) স্বরসন্ধি—পুলক-আলোকে, সংযম অভ্যাস, সময়-অভাবে, বিদ্যা-বিনয়-অলঙ্কৃত, যবনিকা-অন্তরালে, প্রতিমা-অর্চ্চনা, দেব-আরাধনা, আত্ম-অভিমান, অত্ম-উপকার, বিষয়-অধিকারী, রামায়ণ-মহাভারত-অবলম্বনে, জীবন-আদর্শ, বজ্র-আঘাতে (বাজ পড়া অর্থে), ছায়া-অবলম্বনে, আদেশ-অপেক্ষায়, দৈর্ঘ-আশঙ্কায়, স্নেহ-আহ্বান, প্রেম-আহুতি, কীট-আকারে, দেব-আকাঙ্ক্ষিত, মঙ্গল-আলয়, চির-অকীর্ত্তিকর, রচনা-অংশে; স্বইচ্ছায়, অরুণ-উদয়ে (পদ্মিনী-উপাখ্যান), কার্য্যউদ্ধার, দীন-উপহার, ভারতউদ্ধারকাব্য, সুরথউদ্ধারযাত্রা, শুভ-উপনয়নউপলক্ষে, চিরউল্লসিত, চিরউন্মুক্ত, বিজয়উল্লাস, আনন্দ-উজ্জ্বল, আনন্দ-উৎফুল্ল, চিকিৎসা-উপযোগী, মৃগয়া উপলক্ষে, বিদ্যাউপার্জ্জন, ভাষাউদ্ভাবনের কল্পনাউৎস, সুউন্মুক্তনীল, অৰ্দ্ধেন্দুউজ্জ্বল, উপরিউক্ত, শান্তিঅন্বেষী, ভ্রান্তিঅপনো-দনের, প্রকৃতিঅনুমোদিত, পদ্ধতিঅনুসারে, ভক্তি আকর্ষণের, প্রণালী-অবলম্বনের নারী-অধিকারের, ভারতী-অর্চ্চনা, করি-অরি, দেবী-অংশে, পদ্মিনী আখ্যান, স্ত্রীআচার, স্ত্রীঅত্যাচার। স্বরাদিনামের পূর্ব্বে শ্রী যথা শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র, শ্রীঅঙ্গে; শক্তিউপাসক, ভক্তিউচ্ছ্বাসের, ভীতিউৎপাদক, স্মৃতিউৎসব; তনুঅঙ্গে, তরুঅন্তরালবর্ত্তী, গুরুআজ্ঞা, পিতৃআজ্ঞা, পিতৃআদেশ, মাতৃঅভিষেক, মাতৃউদরে, নিদ্রাউত্থিত, বহু অশ্ব-পদ সঞ্চারিত।

(৵০) ব্যঞ্জনসন্ধি—বাক্‌দত্তা, বাক্‌দান, বাক্‌বিতণ্ডা, দিক্‌বলয়, তির্য্যক্‌-ভাবে সম্যকভাবে, ঋত্বিকৃগণের, চতুর্দ্দিকস্থ (অকারান্ত দিক শব্দ ধরা হইয়াছে) জগৎআনন্দ, জগৎগুরু, জগৎলক্ষ্মী শরৎচন্দ্র, জগৎব্যাপী, ভগবৎমূর্ত্তিত্রয়, মরুৎমণ্ডল, কিঞ্চিৎমাত্র, প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ, জগৎমঙ্গলকার, সুহৃৎ রঞ্জন (হেমচন্দ্র), বিদ্যুৎলতা (হেমচন্দ্র), জগৎ-বিখ্যাত (হেমচন্দ্র) যোষিদ্‌মণ্ডলী, সাহিত্যপরিষৎ-মন্দির। জলছবি, স্নানছলে, অঞ্চলছায়ায়, আলোকছটায়, তরুছায়া; হেমচন্দ্রের কবিতা-বলীতে—অনলছবি, মহিমাছটাতে, রাহুগ্রহছায়া, দেবছটা, শশীতনুছটা, ভানুছটা।

(৶৹) বিসর্গসন্ধি—ধনুঃধারী (হেমচন্দ্র), শিরঃচূড়ামণি (মাইকেল) চক্ষুঃজল।

(৩) ভুল সন্ধি।

(৵৹) স্বরসন্ধি—আয়ুর্র্দ্ধ্যান্ন, শুদ্ধ্যাশুদ্ধি, অধ্যায়ন, ভূম্যাধিকারী অনুমত্যানুসারে, পশ্বাধম, খ্যাতাপন্ন (খ্যাত্যাপন্ন), উপরোক্ত (বাঙ্গালায় 'উপর' শব্দ ধরিব ?), জনেক (জনেক দুজন) দিনেক, বারেক, ক্ষণেক, বৎসরেক, তিলেক। অনাটন, দুরাবস্থা, দুরাদৃষ্ট এই দলে ফেলা যায়। কেহ কেহ 'অনা' খাঁটি বাংলা উপসর্গ যোটাইয়া অনাটন রাখিতে চান। 'দুরা' খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে নাকি ? তিনটি স্থলেই 'আ' উপসর্গ ধরিলে রাখা চলে।

(৶৹) ব্যঞ্জনসন্ধি—মহদেচ্ছা, সুহৃদোত্তম, বিদ্যুতালোক, মরুতাদি (হসন্ত শব্দকে অজন্তভ্রমে), ষড়বিধ; পৃথগান্ন, আরও বাড়াবাড়ি। হৃদ্‌পদ্ম, চতুর্দ্দিগ্‌স্থিত, বাগ্‌নিষ্পত্তি।

(৶৹) বিসর্গসন্ধি—মনোকষ্ট, মনোসাধ, মনোক্ষেত্রে, মনোসুখে (হেমচন্দ্র), মনোতুলিকা, মনোচোর, কায়মনোচিত্তে, নভোতলে, ইতোপূর্ব্বে, বয়োপ্রাপ্ত, শিরোশোভা সদ্যোপ্রস্ফুটিত, সদ্যোচয়িত, জ্যোতি-উপবীত (হেমচন্দ্র)।

কলিকাতাভিমুখে'র বেলায় সন্ধি, 'বারাণসী অভিমুখে' ও 'দিল্লী অভিমুখে'র বেলায় সন্ধির অভাব। বোধ হয় শ্রুতিকটুদোষ-পরিহারার্থে এই প্রভেদ। তিনি ভারতের 'মুখোজ্জ্বল' করিয়াছেন, আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি,' ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ? 'আপনাপনি' 'আপনাপন,' এসবস্থলে সন্ধি বাঙ্গালার ধাতের সঙ্গে মিলে না। কিন্তু অনেককে করিতে দেখি। মহেশ্চন্দ্র সুরেশ্চন্দ্র, রমেশ্চন্দ্র, গিরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি অদ্ভুত সন্ধির পদ মাঝে মাঝে দেখা যায়। (হরিশ্চন্দ্রের দেখাদেখি ?)

(১০) শব্দের অর্থব্যতিক্রম।

অনেকগুলি শব্দ সংস্কৃতভাষা হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় সংস্কৃত হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ইংরাজীতেও ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের অর্থব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।] সংস্কৃত ভাষায় এরূপ অর্থে শব্দগুলির ক্বচিৎ কুত্রচিৎ প্রয়োগ আছে কি না তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন, কেন না এই ভাষায় গ্রন্থাদি ভূরিপরিমাণ এবং আমার বিদ্যা নিতান্ত অল্প। তবে যতদূর জানি, এই অর্থগুলি সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন। এগুলি অপপ্রয়োগ বলিয়া ধরিতে হইবে, কি ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োজন

অনুসারে যখন এরূপ অর্থব্যতিক্রম হইয়াছে, তখন তাহা ভাষার স্বাভাবিক গতি ও পরিণতির ফলে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার সুধীমণ্ডলীর উপর।

আকিঞ্চন=দৈন্যের ভাবে প্রকাশিত ইচ্ছা (সংস্কৃত দৈন্য অর্থ হইতে লক্ষণা ?)

আক্ষেপ=বিলাপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন (সংস্কৃতে নিন্দা বা অঙ্গবিক্ষেপ। বিলাপকালে অঙ্গবিক্ষেপ ঘটে অথবা অদৃষ্টের নিন্দা করা হয়, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে কি ?

আচ্ছন্ন=অজ্ঞান অভিভূত। জ্বররোগী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিকারের ঘোরে জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে ?

আদ্যোপান্ত=আদ্যন্ত (শেষটুকু পঠিত হয় না, এইরূপ একটা শাস্ত্রবচন আছে। সেইজন্য কি এই অর্থ ?)

আরাম=সোয়াস্তি, ফুরফুরে হাওয়ায় বড় আরাম (বিশ্রাম অর্থ হইতে লক্ষণা ?)

আশ্চর্য্য=বিস্ময়াপন্ন (সংস্কৃতে বিস্ময় ও বিস্ময়জনক এই দুই অর্থ আছে।)

উপন্যাস=নভেল। সংস্কৃতে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' থাকিতে সংস্কৃত শব্দের অপপ্রয়োগ কেন ?

উপায়=রোজগার, দশ টাকা উপায় করিতেছে। সংস্কৃত সাধন অর্থের লক্ষণা ?

এবং=ও, and সংস্কৃত "এইরূপ" অর্থ হইতে পরিবর্ত্তন অতি সহজ।

কথা=শব্দ, word। কল্য=আগামী দিন বা বিগত দিন (সংস্কৃতে 'প্রত্যূষ' অর্থ)।

জীবনী=জীবন-চরিত। তত্ত্ব=কুটুম্ববাড়ী প্রেরিত মিষ্টান্ন (সংস্কৃত বার্ত্তা অর্থ হইতে লক্ষণা ? সন্দেশ দেখুন)

নিরাকরণ=নিরূপণ। (সংস্কৃতে নিবারণ)। পরশ্ব (পরশ্বঃ)=বিগত দিনের পূর্ব্বদিন।

প্রজাপতি=পতঙ্গবিশেষ। প্রশস্ত=চওড়া broad।

ভাসমান=যাহা ভাসিতেছে floating (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি ?)

ভাসুর = স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ভাস্কর = প্রস্তরমূর্ত্তিনির্ম্মাতা।

মন্বন্তরা (মন্বন্তর) = দুর্ভিক্ষ। যথা—আমিও বৈষ্ণব হ'লাম, দেশেও মন্বন্তরা লাগ্‌ল।

মর্ম্মর = মারবেল পাথর marble। মলয় = দক্ষিণ বায়ু (মলয় পর্ব্বত হইতে লক্ষণা ?)

রহস্য = ঠাট্টা (সংস্কৃতে গোপনীয়)। রাগ = কোপ rage (ক্রোধে মুখেচোখে রক্তিমা আসে।)

রাষ্ট্র = জানাজানি। ব্যঙ্গ = ঠাট্টা (ব্যঞ্জনার প্রকার ভেদ ?)

বাধিত = উপকৃত, obliged, indebted। ব্যাপার = ঘটনা। ব্যামোহ = রোগ।

বিমান = আকাশ (সংস্কৃতে আকাশগামী রথ)। বিষয় = জমীদারী (সংস্কৃতে 'দেশ' বা 'সম্পত্তি' অর্থ হইতে লক্ষণা ?)

বেদনা = ব্যথা (সংস্কৃতে অনুভূতি, সঙ্কীর্ণার্থে কষ্টানুভূতি; ইংরাজী pensive শব্দেও কতকটা এইরূপ হইয়াছে।) বেলা = পক্ষে, 'আমার বেলায়'

শুশ্রূষা = রোগীর সেবা (সংস্কৃতে 'সেবা'; সঙ্কীর্ণার্থে রোগীর সেবা।)

শ্লেষ = ঠাট্টা। (সংস্কৃত অর্থ হইতে লক্ষণা আসে কি ?)

সংবাদ = খবর, news (সংস্কৃতে বার্ত্তা, খবর; কুটুম্ববাড়ী খোঁজখবর লইতে বা পাঠাইতে হইলে লোক মারফত মিষ্টান্ন পাঠান রীতি। এইরূপে অর্থ-ব্যতিক্রম হয় নাই কি ? 'তত্ত্ব' শব্দ এখনও দুই অর্থেই চলে, (১) আমাদের তত্ত্ব লওনা (২) কি তত্ত্ব এল ?

সমারোহ = জাঁকজমক (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, সংস্কৃতে এ অর্থ নাই।*)

সুতরাং = তজ্জন্য, therefore (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি ?)

সেনানী = সৈনিক বা সৈন্য (সংস্কৃতে 'সেনানায়ক' অর্থ); এটা ডাহা ভুল, অথচ দুইজন প্রসিদ্ধ জীবিত লেখক ভুল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

* আর্য্যাবর্ত্ত, মাঘ ১৩১৭, পুরাতন প্রসঙ্গ।

উপসংহার।

পাঠকগণের মনে নানারূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া এতক্ষণে এই সুদীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ শেষ হইল। আমার সংস্কৃতজ্ঞানের অল্পতাবশতঃ, যদি কোন শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এড়াইয়া গিয়া থাকে অথবা প্রবন্ধনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, সুধীগণ সেগুলি দেখাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব। 'সাহিত্যে' এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আমি পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করিতেছি। সুযোগ্য 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয়ও এই আহ্বানে যোগদান করিতেছেন। এরূপ কার্য্য অনেকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

পরিশেষে আমার নিজের মনের কথা খুলিয়া বলিবার যদি অধিকার থাকে, তাহা হইলে এই কথা বলিব—বাঙ্গালার ধাত (genius) অবশ্য সংস্কৃতের ধাতের সঙ্গে ঠিক এক নহে। এতএব অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগে প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া যে কথাবার্ত্তায় প্রচলিত অশুদ্ধ-পদ মাত্রই সাহিত্যের ভাষায় চালাইতে হইবে, ইহা ঠিক নহে। তবে যেখানে নাটক নভেলে কথাবার্ত্তার ভাষাই যথাযথ দিতে হইবে, সেখানে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ইংরাজীতেও এই নিয়ম দেখিতে পাই

প্রাচীন সাহিত্যে আছে বলিয়া যে কতকগুলি অপপ্রয়োগ মৌরসী স্বত্ব ভোগ করিবে, তাহারও কোন যুক্তি দেখি না। যেমন সামাজিক কুপ্রথা উঠানর চেষ্টা আবশ্যক, সেইরূপ মামুলি ভুলগুলিরও সংশোধন আবশ্যক। আধুনিক লেখকদিগের খেয়ালবশতঃ যে সব অপপ্রয়োগ সাহিত্যে আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে বিশুদ্ধিপ্রিয় ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশবাণী উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

"মাতৃভাষার সেবা করিতে হইলে, ভক্তির সহিত করা কর্ত্তব্য, এবং শব্দপ্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিলে, মায়ের অবমাননা করা হয়।" "আমরা মাতৃভাষার সেবা করিতে যাইয়া একটুকু ভক্তির ভাব দেখাইব না, ইহা কেমন কথা? হাতে কলম লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া যাইব, শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিব না, ইহা বড়ই অসঙ্গত।" "যা'র যেমন শক্তি, মাকে তেমনই অলঙ্কার দাও, কিন্তু এমন অলঙ্কার কখনই দিও না, যাহাতে মায়ের অঙ্গ বিকৃত দেখায়।"

অন্ন-সংস্থান

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, লিখিত

আমাদের দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি বিধান করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় উদ্ভাবনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের বৈষয়িক জীবনধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ, মন্দগতি ও অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আমরা যে জীবনসংগ্রামের আবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি তাহাতে জয়লাভ করিবার উপযোগী সামর্থ্য আমাদের একেবারেই নাই; এবং পাশ্চাত্য জগতের সহিত শিল্প-ও-বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। প্রথমতঃ, আমাদের সমাজের যে শ্রেণীর লোক প্রধানতঃ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত। আর যাহাদেরই বা কিঞ্চিৎ বুদ্ধিশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য আছে তাহারাও সাধারণতঃ নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন উপায় উদ্ভাবন অথবা নবাবিষ্কৃত উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধনিসম্প্রদায় এবং মহাজনগণ অতিশয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তাঁহারা শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একেবারেই অনুৎসাহী এবং এক প্রকার উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার, যে পরিমাণ মূলধনের সাহায্যে আমাদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য চলিতেছে তাহাও ব্যক্তিগত এবং পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ, সমবেতব্যবসায়, যৌথকারবার, মহাজনসঙ্ঘ, প্রভৃতির অভাবে আমাদের জাতীয় ধন ভাণ্ডার নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তৃতীয়তঃ, যে উৎসাহ, পরিচালনাশক্তি ও নায়কোচিত দায়িত্ববোধের ফলে জগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিচিত্র শক্তি একস্থানে এবং এক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া বিরাট শক্তিসমুচ্চয়ের সংঘটন করে সেই কর্ম্মকৌশল, ব্যবসায়বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও ঐক্যবিধায়িনী ক্ষমতা আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থায় বিকশিত হইতে পায় না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসায়কে অপসারিত করিয়া সাহিত্যশিক্ষাই একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিয়াছে। কাজেই আমাদের শিক্ষিত সমাজ প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক জগতের তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় আমাদের বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যে সন্দিহান হইব, এবং শিল্প-সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা দুরাশা থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলে চলিবে না; উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে। এই জীবনসংগ্রামে সফলতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মুখে যে কয়টি পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়, এবং গ্রামগত ও পরিবার-বদ্ধ শিল্প পদ্ধতিই প্রচলিত। এখানে পাশ্চাত্য জগতের বিপুল আয়োজন, বিরাট কারখানা-সংঘটন ও বিশাল ব্যবসায়-কলেবরের সৃষ্টি হয় নাই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ, মূলধনের সমবায়সাধন, বিচিত্র বিজ্ঞাপনপ্রণালী, পণ্যসরবরাহের শৃঙ্খলা এবং শ্রমবিভাগনীতির প্রবর্ত্তন প্রভৃতির ফলে ইউরোপীয়েরা সমগ্র পৃথিবীর দেশ প্রদেশ গুলিকে যে ভাবে করতলগত করিয়া বিশাল বিশ্ববাজারের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলে তাহাদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রতাপে অন্যান্য জাতির বৈষয়িক সাধনা যে ফলবতী হইতে পারিবে তাহার আশা করা সুকঠিন। এই শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগত বৈষয়িক জীবন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না তাহাই প্রধান ভাবিবার বিষয়। আমাদের যে সামান্য ধনশক্তি, ব্যবসায়বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা আছে তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা বাচিয়া থাকিতে পারিব কিনা—ইহাই আমাদের প্রথম সমস্যা।

শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশেই বৃহৎ আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়-পদ্ধতিও আনুষঙ্গিকভাবে অথবা স্বাধীনরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই জন্য আধুনিক পাশ্চাত্যজগতে কলকারখানাগুলি, গৃহশিল্প, গ্রাম্যব্যবসায় ও হস্তনির্ম্মিত কাজের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবার এইরূপে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া বহুলোকের স্বাধীন অন্নের সংস্থান করিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে শিল্প ও ব্যবসায়ের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলিই শিল্পজগতে সম্পূর্ণ স্থান অধিকার করে নাই।

জীবজগতের সর্ব্বত্রই এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য চলিতেছে; এবং প্রকৃতিদেবী অসমর্থ ও অনুপযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকে অপসারিত করিয়া উপযুক্ত ও সামর্থ্যবান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকেই অঙ্কে স্থান দিয়াছেন। যে ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান নিজের প্রয়োজন মত পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জ ব্যবহার করিয়া নিজের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারে, সেই ব্যক্তি, সমাজ ও

প্রতিষ্ঠানই প্রকৃতির নিয়মে জীবনসংগ্রামে পুষ্টি ও বিকাশলাভের অধিকারী। কলেবরের আয়তন, আকার ও বিস্তৃতিই এই উপযোগিতালাভের একমাত্র অঙ্গ নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন এবং জগতের বিবিধ ভাব ও শক্তিসমুচ্চয়ের ব্যবহার করিতে হইবে।

জীবনবিকাশের এই নিয়ম শিল্পজগতেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, অনেক সময়ে ক্ষুদ্র কারবারই বৃহৎ অনুষ্ঠান অপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এমন অনেক অবস্থা আছে, যেস্থলে বিরাট আয়োজন করিলে লাভবান্ হইবার আশা অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাই বেশী। সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের স্থান কোন রূপেই বিনষ্ট হইতে পারে না। মানবের অভাব বৈচিত্র্য এবং অভাবপূরণ করিবার ক্ষমতা, শ্রমবিভাগনীতির প্রবর্ত্তন, ভাবের আদানপ্রদানের সুবিধা, রাষ্ট্রীয় সুব্যবস্থা প্রভৃতির উপরেই বৃহৎ অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এই সমুদয় সকল সমাজে সকল সময়েই থাকে না; সুতরাং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া বৃহৎ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সকল সময়েই উপস্থিত হয় না।

এতদ্ব্যতীত সুকুমার শিল্প, চিত্রকলা, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যে সমুদয় যন্ত্রাদিপ্রয়োগে সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। তাহাদের উৎকর্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র শিল্প-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এ সকল স্থলেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়-পদ্ধতিই বৃহত্তর অনুষ্ঠান গুলিকে পরাজিত করিয়া শিল্প-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

আবার, বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলির অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে; ইহাদের সাহায্যে অল্প সময়ে বহুদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে বটে; কিন্তু এই সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে বিতরণ করিতে বহুকালব্যাপী বহুলোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। অধিকন্তু, কেবলমাত্র বৃহৎ কারবারের দ্বারাই মানবের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জনপদের মধ্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তি ও সুযোগসমূহ এমন বিচিত্রভাবে পড়িয়া থাকে, যে সেইগুলিকে মানবের অভাব-মোচনের জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে বিবিধ পরস্পরসম্বন্ধ, আনুষঙ্গিক অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন শিল্প ও ব্যবসায়ের আয়োজন করা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক কলকারখানার প্রসার যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন, এবং শ্রম-বিভাগ-নীতি প্রয়োগ করিয়া বিরাট ব্যবসায়-পদ্ধতি যতই প্রতিষ্ঠিত

হইতে থাকুক না কেন, মানবের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য বিচিত্র অভাব-মোচনের জন্য বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইবে না।

আমাদিগকে শিল্প-জগতের এই নিয়মানুসারেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের মধ্যে যে অসংখ্য সুযোগ রহিয়াছে তাহারই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়-ও-শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইজন্য আমাদের শ্রমজীবিগণের কায়িক পরিশ্রম, ব্যবসায়িগণের উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি এবং মহাজনগণের ব্যবসায়-প্রযুক্ত মূলধন যে ভাবে পরিচালিত করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফললাভ হইতে পারে, আমাদিগকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, দেখা যাউক আমরা কি উপায়ে আমাদের শ্রম-জীবিগণের পরিশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য, উদ্ভাবনী শক্তি, কলা-চাতুর্য্য, এবং হস্ত বা চক্ষুরিন্দ্রিয়গত কৌশল একেবারেই জন্মিতে পায় না। এ অবস্থায় জাতিভেদের ফলে যাহারা পুরুষানুক্রমে কোন শিল্প বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বংশগত নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে, আমাদের প্রাচীন সামাজিক ও বৈষয়িক সভ্যতার নিদর্শন সেই শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতির বিদ্যা বুদ্ধি, স্বভাব ও অভ্যাসের সাহায্য গ্রহণ না করিলে আমাদের আর সম্বল কোথায়? এই সুযোগগুলি ব্যবহার করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, এবং উন্নত প্রক্রিয়া ও প্রণালীগুলি ক্রমশঃ আয়ত্ত করিয়া জাতিগত বিদ্যার পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বাস্তবিকই কি আমাদের শিল্পিকুল এবং ব্যবসায়ী জাতির শিল্প ও ব্যবসায়-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত নহে? যাহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছে; এবং এখনও বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ বৈষয়িক অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া স্বকীয় কার্য্যদক্ষতা ও শিল্পপটুত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের শিক্ষার যতই অভাব থাকুক না কেন, আমাদের এখনও ভাবিবার প্রয়োজন নাই, যে আমাদের শিল্পীও ব্যবসায়িগণের উন্নতি একেবারে অসম্ভব। বাস্তবিক

পক্ষে, যাঁহারা প্রচার করিতে চেষ্টা করেন যে ভারতবর্ষের শ্রমজীবিগণ যুগে যুগে একই অবস্থায় থাকিয়া একই জাতিগত নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে, এবং কখনও কোন বিষয়ে অবস্থোচিত নূতন ব্যবস্থা করিয়া উদ্ভাবনী শক্তি এবং পরিবর্ত্তনশীলতার পরিচয় প্রদান করে নাই তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি একই অবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের নিত্যনব ভাব ও শক্তিপুঞ্জ সম্বন্ধে একেবারে নিস্পন্দ ও উদাসীন হইয়া থাকিত, তাহা হইলে কি ভারতীয় চিত্রকলা, রঞ্জনশিল্প, হস্তনির্ম্মিত কারুকার্য্য এবং বিবিধ পরিবারবদ্ধ ব্যবসায়-প্রসূত বিলাসদ্রব্য বহুকাল ধরিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইত? কৃষিক্ষেত্রেও ভারতীয় কৃষকসম্প্রদায় আমেরিকাখণ্ডের আবিষ্কারকাল হইতে যে সকল নূতন নূতন উদ্ভিজ্জ পদার্থ এদেশের জল-বায়ু ও ভূমির উপযোগী করিয়া চাষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারই ফলে আমাদের আধুনিক কৃষিজাত-দ্রব্যের অর্দ্ধভাগেরও অধিক পাইয়া থাকি।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, আমাদের শিল্পিকুল স্বকীয় শিল্প ও ব্যবসায়েই নবাবিস্কৃত যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদি অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। স্বকীয় জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে যেরূপ পরিবর্ত্তনসাধন ও নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন করিতে হয় সেরূপ ক্ষমতা তাহাদের নাই।

যাহা হউক, এই জাতিগত শিল্প-ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের অন্য কোন গতি নাই। যাহারা আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের শিল্পের অধ্যক্ষগণ এবং ব্যবসায়ের ধুরন্ধরেরা যেন একথা ভুলিয়া গিয়া কারখানাসমূহে সমাজস্থ যে কোন শ্রেণীর লোক নিযুক্ত না করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে মসীজীবী বাঙ্গালী সন্তানকে হঠাৎ বিচিত্র শিল্পী জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টায় বৈষয়িক জগতের এই সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে, ইহার ফলে বয়ন এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যে কয়েকটী প্রয়াস হইয়াছে সমস্তগুলিই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়া সমাজে ঘোরতর নৈরাশ্য ও অবসাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

শিল্পিগণের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের উন্নতি বিধান করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, কি উপায়ে আমাদের সমাজে শিল্প-

প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিচালক এবং ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ ও ধুরন্ধরের সৃষ্টি হইতে পারে। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসায়ক্ষেত্রে ধুরন্ধর এবং অধ্যক্ষেরাই সমাজের বৈষয়িক জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা; মহাজনগণ এবং ধনিসম্প্রদায় নহে! ইঁহারাই সমাজের প্রয়োজন ও অভাবানুসারে উপযুক্ত আয়োজন করিয়া বৈষয়িক সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করেন। ইহাঁদেরই ব্যবসায়বুদ্ধি, ধনবিজ্ঞানে বুৎপত্তি, সর্ব্ববিধ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি এবং কর্ম্ম-তৎপরতার প্রভাবে বিভিন্ন স্থান হইতে মহাজনগণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রম-জীবীরা আকৃষ্ট হইয়া স্বকীয় শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁরাই সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন এবং মূলধন প্রয়োগের অভিনব করবার আবিষ্কার করেন। ইহাঁদেরই চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালী এবং ব্যবসায়-পাণ্ডিত্য ধনী মহাজনদিগের গন্তব্যপথ এবং কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া দিয়া তাঁহাদের ভাগ্যগঠন করিয়া দেয়। ইহারই ফলে ধনী সম্প্রদায়ের মূলধন সর্ব্বত্র ধুরন্ধরের পরিচালনা-শক্তি এবং ব্যবসায়বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া পরাধীনভাবে কার্য্য করে! বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র মূলধনের সাহায্যে মহাজনগণ কখনও নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি অথবা নূতন কারবার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন না। ধনী সম্প্রদায় সাধারণতঃ গতানুগতিকভাবে কার্য্য করিয়া অভ্যস্ত, কারবারে এবং পুরাতন ব্যবসায়েই সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন। লাভবান হইবার নূতন নূতন সুযোগ আবিষ্কার দ্বারা ধুরন্ধরেরা নূতন নূতন ব্যবসায়ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিলে এই লাভজনক কারবারের প্রতি ধনবান্ মহাজনগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

এইরূপ ধুরন্ধর আমাদের দেশে এখনও আবির্ভূত হয়েন নাই। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমরা এরূপ ব্যবসায়বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মবীরের সাক্ষাৎ না পাই, ততদিন আমাদের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকিবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার এবং অভিনব শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্ভাবন দ্বারা ধনী মহাজনগণের মূলধন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ, উপযুক্ত ধুরন্ধর ও পরিচালকের সৃষ্টি হয়।

আমাদের সমাজে এরূপ কর্ম্মবীর এবং ব্যবসায়ের ধুরন্ধর নাই কেন? ব্যবসায় এবং শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার ফলে শাসনকার্য্য-

নির্ব্বাহোপযোগী কেরানী, হাকিম ও উকিলের সৃষ্টি হইতে পারে মাত্র। শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রের ভার বহন করিবার সামর্থ্য, এবং নানা উপায়ে সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধান করিবার ক্ষমতা বিকাশ করিতে হইলে আমাদের এমন শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষার্থিগণ প্রথমাবস্থায় সাধারণ সাহিত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা করিতে পারে; এবং ক্রমশঃ কেবলমাত্র ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ধনাগম সম্পর্কীয় বিদ্যা সমূহেই সমগ্র শক্তি ও সময় প্রয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মে বৈজ্ঞানিক কলকারখানা, ভারতীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা, এবং আমাদের সমাজের বিচিত্র অভাব পূরণ করিবার প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুবিধা সহজেই উপস্থিত না হয়; এবং বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন, বিবিধ যন্ত্র ব্যবহার, বিচিত্র স্থানে পরিভ্রমণ ও প্রদর্শনী পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের কার্য্যকারিণী বৃত্তিসমূহের উন্মেষ, হস্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির পরিচালন এবং বৈষয়িক জগতের বিবিধ ঘটনা পর্য্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে আবিষ্ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন, উদ্ভাবনীক্ষমতাবান্ ধুরন্ধর ও কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইবে না।

এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সঙ্গে সঙ্গে, যাহাতে আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ দেশের বিবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের বৈজ্ঞানিক ও রসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া উপযুক্ত অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানে আলোচনা, অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হয়েন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাহাতে কেবলমাত্র আদান প্রদান, বিতরণ সরবরাহ, বাজারপরীক্ষা, অভাব ও প্রয়োজন অনুসন্ধান, এবং আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি প্রকৃত ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতে পারে সেইরূপ উচ্চ অঙ্গের ব্যবসায় শিক্ষারও আয়োজন করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মূলধন কোন্ প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের ধনিসম্প্রদায় মূলধনের সমবায়সাধন করিয়া যৌথ কারবার, সমবেত-ব্যবসায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে অপারগ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বকীয় ব্যবসায়-প্রযুক্ত ধন যে একীকৃত হইয়া জাতীয় মূলধন-ভাণ্ডারের আয়তন ও প্রভাব বৃদ্ধি করিতে পারিবে তাহার আশা অতি অল্প। বর্ত্তমান অবস্থায়

আমরা ইহার উপর নির্ভর করিতে পারি না; প্রত্যেক মহাজন ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণের চেষ্টায় এবং লাভবান হইবার আশায় নিজ নিজ মূলধন প্রয়োগ করিতে উৎসাহী হইবেন, আমাদিগকে এইরূপ ভাবিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

যদি অল্প মূলধন লইয়াই শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহা হইলে যে সকল কারবারে শীঘ্র শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সকল কারবারই অবলম্বন করিতে হইবে। এই মূলধন যাহাতে ব্যবসায়ে অনেক কাল আবদ্ধ না থাকে এবং যাহাতে ইহা বৎসরে বহুবার কার্য্য করিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে অল্পধন বিশিষ্ট মহাজনেরা কখনও লাভবান্ হইতে পারেন না। একই মূলধনের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে যে ফললাভ হয় প্রচুর মূলধনের একালীন ব্যবহারেও সেইরূপ ফললাভ হয়; কারণ ইহার ফলে মূলধন প্রকৃত প্রস্তাবে বহুগুণিত হইয়া যায়, সুতরাং প্রতিবারে অতি সামান্য লাভ রাখিলেও মোটের উপর বৎসরান্তে লাভের পরিমাণ অতি সন্তোষজনক হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, যে সকল ব্যবসায়ী এককালে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করেন, অথবা যাহারা তাঁহাদের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া একই মূলধন বহুবার প্রয়োগ করিতে পারেন তাঁহারা প্রতি কারবারে শতকরা একটাকা হিসাবেও লাভ রাখিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু অল্প মূলধন লইয়া কার্য্য করিতে হইলে ব্যবসায়ীকে অতি বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইতে হয়। যে সমুদয় জিনিষের কাট্তি খুব বেশী এবং যাহার অভাব হইলে সমাজের বাস্তবিক কষ্ট হইবে, সুতরাং সামান্য কারণে যে সমুদয় প্রয়োজনের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিয়া কেবলমাত্র সেই সমস্ত জিনিষই প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। দ্রব্য সমূহের বিশিষ্ট উৎকর্ষ বিধানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাদের অভাব মোচনোপযোগিতা এবং মূল্যের অল্পতার প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। যাহাতে ব্যবসায়ী অল্প মূল্যে বহু জিনিষ বিক্রয় এবং সমাজের প্রধানতম ও সার্ব্বজনীন অভাবগুলি পূরণ করিতে পারেন কেবলমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তাঁহার মূলধন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনগুলি বর্দ্ধিত করিবার আর একটী উপায় আছে। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের দ্বারা এই কার্য্য সুসাধিত হইয়া থাকে; কোনও দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ না করিয়াও কেবলমাত্র বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানী

রপ্তানি, এবং বিবিধ সমাজের প্রয়োজনানুসারে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। আর বাস্তবিক, এইরূপ ব্যবসায় প্রথা অবলম্বন না করিলে ধনভাণ্ডার কখনও পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। শিল্পপ্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যে পরিমাণ লাভের আশা থাকে, কেবলমাত্র সরবরাহ ও কাট্‌তির অনুরূপ জোগানের আয়োজন করিয়াই তদপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। ইহার ফলে দ্রব্য-উৎপাদনকারী শিল্পিগণের লভ্যাংশ হইতে নিজ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া এইরূপ ব্যবসায়ী এবং জোগানদারেরা প্রচুর ধনলাভ করিতে সক্ষম হয়েন। ব্যবসায়ের ফলে মূলধন এইরূপে সংগৃহীত হইলে পর, বৃহৎ বৈষয়িক অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে পারে।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া বৈষয়িক উন্নতি বিধানের যে কয়টি নিয়ম ও প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইবে। এই জন্য দুই প্রকারের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অল্পায়তন কারখানার ব্যবস্থা ; দ্বিতীয়তঃ, কোনরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠা না করিয়া গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের দায়িত্ব প্রদান করিয়া পরিবারবদ্ধ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা।

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিতে ত্রিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হস্ত নির্ম্মিত কার্য্য ; দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রাদি ব্যবহৃত দ্রব্য ; তৃতীয়তঃ, রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বিত শিল্প।

এই সমুদয় কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ, জাতিগত নৈপুণ্যবিশিষ্ট কারিগরদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার ভিতর সমবেত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মানবচালিত অথবা বাষ্প-নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এন্‌জিনের সাহায্যে উন্নত যন্ত্রাদি প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে হইবে ; তৃতীয়তঃ, উদ্ভিজ্জ, ও খনিজ উপকরণ গুলির রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া উন্নত শিল্পের আয়োজন করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, উৎকৃষ্ট কৃষিজাত দ্রব্যের ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের ব্যবহার করিতে হইবে। এই জন্য বিজ্ঞানসিদ্ধ কৃষি বিদ্যাবিশিষ্ট তত্ত্বাবধায়কগণের অধীনে কৃষকদিগকে কার্য্য করাইয়া ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

নিম্নে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় এইগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১—বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণ—তৈজস পত্র নির্ম্মাণ, তার প্রস্তুতকরণ, বোতাম, ঘণ্টা ও অলঙ্কার গঠন, সোণা বা রূপার ছাঁচ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি।

২—বিভিন্ন রকমের কালী প্রস্তুত করণ, জুতার কালী, ঘোড়ার সাজের কালী, ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর কালী, নিয়ুবিমন কালী, ছাতার কালী, ইত্যাদি।

৩—বিভিন্ন বারনীস ও মসৃণ করিবার দ্রব্য—ঘোড়ার সাজ, কাঁসা, পিতল, কাচের জিনিষ, দস্তার কাজ, ছুরি, কাঁচি, পালীশ, হাড় ও সিংএর কাজ, কাঠের কাজ।

৪—জল হইতে রক্ষা করিবার পদার্থ—চামড়ার কাজ রক্ষা, কাপড়ের জিনিষ, কাগজ রক্ষা করিবার উপায়, অয়েল্‌ক্লথ, ছাতার কাপড় ইত্যাদি।

৫—পরিষ্কার করিবার জিনিষ—তেল ও চর্ব্বী, তুলা ও রেশমের কাপড় ধোয়া, রং পরিষ্কার করা।

৬—পিতল—রং করণ, পালীশ করণ, জল ও বায়ু হইতে রক্ষা করণ।

৭—সংযুক্ত করিবার বিভিন্ন দ্রব্য—কাঠের কার্য্যে যোড়া লাগাইবার আঠা, স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারের কার্য্য উপযোগী সংযোজন দ্রব্য, সিমেণ্ট।

৮—বিভিন্ন দ্রব্য পরিষ্কার ও রক্ষা করিবার উপায়—অয়েল্‌ক্লথ পরিষ্কার করণ, দাঁড় রক্ষা করণ, ছবি বাঁধাইবার কাঠ রক্ষা করণ, চিত্র পরিষ্কার করণ, দাগ নিবারণ, জুতা কাঁচ, রেশমের জিনিষ, সোণা, রূপা ও কাঠের কাজ প্রভৃতি পরিষ্কার করণ।

৯—বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করণ, দুর্গন্ধ নিবারণ।

১০—এনামেলের কাজ, গিল্টি করণ, তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য ধাতু লাগান।

১১—ফল ও ফুল প্রভৃতি হইতে নির্য্যাস প্রস্তুত করণ, সুগন্ধি, খাদ্য, সরবৎ, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১২—ফল, ফুল, দুগ্ধ, মাছ, মাংস, চামড়া, পালখ্, লোম প্রভৃতির রক্ষা করণ।

১৩—উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে—দড়ি প্রস্তুত করণ।

১৪—বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, মাদুর, আসবাব, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১৫—মোজা গেঞ্জী, টুপী, প্রভৃতি।

১৬—পুস্তক শেলাই, বাধাই।

নিম্নে কতকগুলি সস্তা যন্ত্রের নাম করা যাইতেছে—এইগুলি হাতে চালান যাইতে পারে, অথবা ছোট ছোট এঞ্জীনের সাহায্যে চলিতে পারে।

১—মোমবাতীর পলিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

২—বিভিন্ন রকমের ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৩—মোম বাতী প্রস্তুত করিবার ছাঁচ।

৪—বিভিন্ন আকারের খাম বা এন্‌ভেলাপ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৫—মোটা কাগজের বাক্স প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৬—জুতার ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৭—ঝিণুকের বোতাম করিবার যন্ত্র।

৮—ছোট ছোট টিনের কৌটা তৈয়ারী করিবার ছাঁচ ও যন্ত্র।

পূর্ব্বে পরিবারবদ্ধ গৃহগত শিল্পের কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশে কৃষিজীবীরা কার্য্যাভাবে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সেই সময় তাহাদিগের দ্বারা অল্পশ্রম এবং অল্পকালসাধ্য অনেক করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। কাদা মাটীর কাজ, খেলনা তৈয়ারী, বেত ও বাঁশের কাজ, মাদুর, দড়ি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহৃত শিল্প প্রভৃতি বিচিত্র কার্য্য এই সুযোগে তাহারা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। মহাজন এবং ধুরন্ধরের একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমাদের শ্রমজীবিগণের উদ্বৃত্ত সময় প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া, সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের বিশেষ সহায়তা করিতে পারে।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারবদ্ধ ব্যবসায় ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থাই কতকগুলি বৃহৎ কারবারের প্রতিও আমাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য এ সকল কাজের কয়েকটা অংশ মাত্রই আমরা অবলম্বন করিতে সমর্থ। লোহার কাজের মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষবিশিষ্ট শিল্পের জন্য চেষ্টা না করিয়া যদি সাধারণ প্রয়োজনোপযোগী ছুরি, কাঁচি, পেরেক, কব্জা, বাল্‌তি, ছাঁচ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হই; কাচের কার্য্যের মধ্যে সামান্য রকমের শিশি বোতল অথবা মেরামতী কাজ প্রভৃতি গ্রহণ করি; বয়নকার্য্যের মধ্যে যদি উন্নত হাতের তাঁত, সুতা প্রস্তুত করণ প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হই; অথবা রঞ্জনকার্য্যের মধ্যে ছিট্ রংকরা, সাধারণ কাপড়ে রং লাগান, দেশীয় রং প্রস্তুত করণ, অথবা মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া সোডা, ক্ষার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা, তাহা হইলেও আমাদের অনেক অভাবই স্বদেশীয় শিল্প এবং ব্যবসায়ের সাহায্যে পূরণ হইতে পারে; এবং বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা উন্মুক্ত হয়।

যে কয়টী সুযোগ ও পন্থার কথা উল্লিখিত হইল, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তদ্ব্যতীত আরও অনেক স্বাধীন অন্নসংস্থাপনের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। এইরূপ কতকগুলি পন্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য কতিপয় উপযুক্ত শিল্প-ও বিজ্ঞানবিৎকর্ম্মী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা দেশের বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিচিত্র সুযোগগুলির সহিত পরিচিত হইবেন; এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সামান্য ধনশক্তি ও অশিক্ষিত পটুত্বের উপরেই নির্ভর করিয়া, অথবা সামান্য রকমের শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষায় সাহায্যে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈজ্ঞনিক যন্ত্রাদির প্রয়োগে কোন্ কোন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহার অলোচনা করিবেন। এইরূপ অনুসন্ধান, আলোচনা ও পরীক্ষা-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য কোন্ মহাত্মা অগ্রসর হইবেন—তাহারই জন্য আমাদের সমাজ উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

"অদ্বৈতবাদ ও স্পিনোজা।"

শ্রীযুক্ত শশিমোহন বসাক লিখিত

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধীরে ধীরে কিন্তু অনবসন্ন গতিতে অপরিচ্ছিন্ন কালের গভীর গহ্বরে আরাম লাভ করিয়াছে—সেই আদিম সময়—চিন্তার অরুণ শৈশবে—মানব সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে—আত্মনীন ঋজু-প্রকৃতি আর্য্য হিন্দু প্রাণের কি যেন এক অপূর্ব্ব অতৃপ্য পিপাসার অতি অদম্য, অবোধ্য শাসনে বা অলক্ষ্য আহ্বানে জাগতিক আদিতত্ত্বের বিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্ত-বৈচিত্র-চিত্রিতা জননী ভগবতী প্রকৃতির অনন্ত-পথ-বিসারি সৌন্দর্য্য-মধুর-সিগ্ধ-পটে যখন যে কোন মহিম ময় দৃশ্য সন্দর্শন করিয়াছেন, প্রাণের দুর্ব্বার আকর্ষণে, পিপাসার সন্তর্পণে, তাঁহারা তাহারই অসীম প্রীতি সুষমার উপহার লইয়া উপাসনার অমৃত সিঞ্চনে আত্মাকে চরিতার্থ করিয়াছেন! প্রকৃতির অনন্ত-রাজ্য-ভাগবত মহাশাস্ত্র-মাধুরীময় বিশ্বসঙ্গীত—এই অনন্ত রাজ্যের স্তরে স্তরে অনন্ত

মহিমা—অপ্রতিসংখ্যেয় গৌরব প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত তরঙ্গময় সানন্দ বিকাশ অবলোকন করিয়া, সেই আদিম মুগ্ধহৃদয় মহাতত্ত্বান্বেষী আর্য্যগণ কি যেন এক অজ্ঞেয় মহাভাবাবেশে উর্দ্ধমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে, গদ্‌গদ্‌ভাবে ভক্তির অমৃত ও পূত উপচারে প্রকৃতির অর্চ্চনা করিয়াছেন। সেই পুরাকালে বিশ্বরাজ্যরূপ মহানাটকে নানা অঙ্কের নানাভাবের চারুদৃশ্য অবলোকন করিয়া প্রকৃতির অন্তরালে বা অভ্যন্তরে যে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড জ্ঞান বা জ্ঞানানুস্যূতা ভাগবতী শক্তি বিরাজমানা আছেন, সরল হিন্দুবুদ্ধির তদানীন্তন অনিবার্য্য অথচ ভয়াবহ বিপাকে নিপতিত হইয়া, সেই গূঢ় রহস্যের নিঃসংশয় অবধারণে অসমর্থ হইয়া, কিছুদিন ভাববিক্ষোভে অশেষ যন্ত্রণায় আকুলতা ও অধীরতা প্রকাশ করিয়াছেন।

চিন্তার প্রাথমিক অভ্যুদয়ে এই ভাবসার্ব্বভৌম। আরম্ভ, দ্বৈতভাবে—চরম পরিণতি অদ্বৈত জ্ঞানে—অদ্বৈত জ্ঞানেই হিন্দু আর্য্য আত্মার পরিতর্পণ করিয়াছিলেন। সে অতি বহুদিনের ইতিহাস। বিপুলজ্ঞান—গৌরবোদ্ভাসিত মহা বিজ্ঞান নিধান মানবজাতির অক্ষয়পুণ্যপুঞ্জ বেদান্তের মাঙ্গলিক আবির্ভাবে মানবজাতির আর সংশয় বা ভীতির বিকট শাসনে অধীর হইতে হইল না; বহুত্বের তমোময়ী প্রহেলিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া সেই সকল পুণ্য স্মরণীয় আর্য্য এক অনন্ত, অখণ্ড, অব্যয় তত্ত্বের মধুময়ী সত্তার আবিষ্করণে আনন্দের অমৃত হ্রদে অবগাহন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। (অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিপাদক সেই মহাসত্য ভাণ্ডার বেদান্তের পরিকীর্ত্তনে, হিন্দুগৌরবের চরম বিকাশে জাহ্নবী-বিধৌত হিন্দুস্থানের আদিম হিন্দু উন্মত্ত হইয়াছেন।)

সুদূর ইউরোপখণ্ডের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়েও এই সার্ব্বজনীন ভাবই পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানগরীয়সী গ্রীস ভূমিতে যখন নৈশ অন্ধকারের পর অতি ধীরে ধীরে জ্ঞানের প্রসন্ন উষা আবির্ভূতা হইলেন, তখনও সেই ভাব—সেই জড়দ্বৈতভাবের আলোড়নে গ্রীসবক্ষঃ যেন একেবারে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত। জ্ঞানের সেই আনন্দ-লীলানিকেতনে প্রকৃতির একত্বে বা অদ্বয়ভাবে গ্রীক্‌গণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। জ্ঞানেতিহাসের এই প্রথম দৃশ্যে কয়েকজন প্রদীপ্ত মনীষা সম্পন্ন মহাপুরুষের পবিত্র পাদচারণে এই মহীয়সী ভূমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

তাঁহারা চিন্তার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনাদি তত্ত্বের আবিষ্করণরূপ সনাতনধর্ম্মের বলীয়সী প্রেরণায় বিজ্ঞানের নিখিল সংশয়চ্ছেদিনী যুক্তির আশ্রয়ে এই গূঢ় সত্যের অবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম কয়েকদিন মতবৈষম্যের

বাদবিতর্কের নিবিড় কুয়াসা পরিদৃষ্ট হয়। "জড়দ্বৈতবাদের উন্মাদিনী শক্তিতে গ্রীসের এক অতি ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু, শুভসময় গ্রীসের জ্ঞানগগনে প্রাকৃতিক নিয়মের অনিবার্য্য, শুভাবহ শাসনে বুধবর পারমিনিটিস্ অকস্মাৎ সুখতারার ন্যায় সহাস্যবদনে প্রাদুর্ভূত হইলেন। জড়দ্বৈতবাদের ধূলিপটল সমাকীর্ণ বসনের উন্মোচন করিয়া তিনি অজড়া দ্বৈতজ্ঞানের মোহন দৃশ্যের অবতারণা করিলেন। মনুষ্য বিস্ময় স্তিমিত নেত্রে সেই আনন্দ দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া প্রাণ জুড়াইয়াছে। তাহার কিছুকাল পরেই মানবজাতির পুঞ্জীভূত পুণ্য পরিপাকে সেই দূর আকাশে প্রচণ্ডতেঃ মধ্যাহ্ন মার্কণ্ডের আবির্ভাব হইল। তাঁহার সর্ব্বাতিসারিণী প্রজ্ঞায় এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। তিনি মহর্ষি সক্রেটিসের প্রিয়তম শিষ্য জ্ঞানী গুরু প্লেটো। এইরূপে ধীরে ধীরে জড়দ্বৈতবাদের অবসানে, অজড়া দ্বৈতবাদের অবতারণায় পৃথিবীর ইতিহাস অলৌকিক গৌরব-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"ইউরোপে আবার মধ্য যুগে ভীষণ সমস্যা উপস্থিত হইল, বাদবিতর্কের আলোড়নে বিলোড়নে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লব সংগঠিত হইল; ঠিক সেই সময়—সেই অতি ভীষণ সময়—মনুষ্য জ্ঞানেতিহাসের সেই ভয়াবহ সমস্যার সময়—আমষ্টার্ডমের পুণ্য ভূমিতে যোগরত তাপসের ন্যায় জ্ঞানোপাসনার মহীয়ান্ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সরলতার সাক্ষাৎ পুণ্য বিগ্রহ স্বরূপ পার্থিব-ভোগ-বিলাস-বিনির্ম্মুক্ত জ্ঞানবীর স্পিনোজা আবির্ভূত হইলেন।"

তাঁহার বহুঅঙ্ক সমন্বিত জীবন সাংসারিক ইতিহাসে এক আশ্চর্য্য মহাপর্ব্ব। তিনি ধীর উদাত্ত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "একমেবা দ্বিতীয়ম্" ভ্রমের ভীষণ বিপাকে নিপতিত হইয়া মনুষ্য এক অনাদি অনন্ত স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের অবধারণে বঞ্চিত হইয়াছে। জগৎ এক অখণ্ড সত্তা; এই চিরন্তনী আত্মসত্তা ভিন্ন আর কাহারও অস্তিত্ব নাই। বহুত্ব ভ্রমময় মায়িক মোহ—বুদ্ধির বিকৃত বিড়ম্বনা, স্বাতন্ত্র্য কাহারও নাই। এক অনাদি সিদ্ধ অনন্ত অব্যয় সত্তাই সারাৎসার। তুমি, আমি, ঘট, পট, সবই মায়িক বিজৃম্ভণ—সবই অলীক ভ্রম বিকার, কাহারও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; এই অখণ্ড অনাদি তত্ত্বের বহির্ভাগে আর কিছুরই নিরপেক্ষ বিদ্যমানতা নাই। ইনি সৎ, স্বতঃসিদ্ধ, শুদ্ধ। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাতীত—সময়দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়েন না। স্থান ইঁহাকে নিরুদ্ধ করিতে পারে না।

যাহা কিছু প্রতীয়মান হইতেছে, অথবা কার্য্যকারণের বিচিত্র পটে যাহা কিছু

সংঘটিত হইতেছে, সবই কেবল এই মহা-সত্তারই বিভিন্ন স্ফূরণ মাত্র। মহার্ণবে অনন্ত তরঙ্গে—তরঙ্গের বিচিত্র বিলাস—মহাসমুদ্রের .বহির্ভাগে তরঙ্গের দ্বিতীয় অস্তিত্ব কোথায়? তরঙ্গ এই উঠিল—আবার নৈসর্গিক ধর্ম্মে কার্য্যকারণের শাশ্বত অচ্ছেদ্য নিয়মে—অনন্তের কোন্ অতল গর্ভে কোথায় তাহার বিলয় হইল—কোথায় চলিয়া গেল! কোথায় চলিয়া যাইবে? যে মহাসত্যের সাময়িক স্ফুরণে বা দুর্জ্ঞেয় বিজৃম্ভণে এই তরঙ্গ নিচয়ের ক্ষণিক আবির্ভাব, নৈসর্গিক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম-শাসনে সেই মহাকারণে কার্য্য প্রপঞ্চের একেবারে বিলয়!! বহির্জ্জগৎ ভাবাবলির প্রমোদ লীলা বিলাস—বৈচিত্র্য সম্পদ বিলসিত বাহ্য জগতের মায়া কাননে যাহা কিছু দেখিতেছ যাহা কিছুর প্রতীতি হইতেছে, তাহার সবই সেই মহাসত্যেরই নানা ভাবময়ী স্ফূর্ত্তিমাত্র। বিকারা সংস্পৃষ্ট বিক্ষোভাতীত বিপরিবর্ত্তন শূন্য এক নিত্য সত্তার বহু আবর্ত্ত বিলসনে জগতের বৈচিত্র্য; বিশ্বের অস্তিত্ব। তাই বলিতেছি, স্বাতন্ত্র্য কাহারও নাই, কার্য্যকারণের অচ্ছেদ্য অনন্ত শৃঙ্খলে নৈসর্গিক প্রতীয়মান পদার্থ নিচয় একবারে অপ্রতিবিধেয় অপরিহার্য্যরূপে সমাবদ্ধ। ভূতসঙ্ঘের কি শক্তি এই শৃঙ্খলের উন্মোচন করে!! বহির্জগতের নিখিল ঘটনাবলী এক অটুট দুশ্ছেদ নিরবচ্ছিন্ন নিয়মসূত্রে গ্রথিত। ঐকিক নিয়মের অনতিক্রমনীয় মহাশাসনের নিকট সকলই অবনত মস্তক, একই ভাগবত শাসনের সকলই পূজা করিতেছে।

এই নিয়ম প্রবাহের—এই অনন্ত ভাব নিবহের—কোন ক্ষুদ্রতম অংশের অণুমাত্র বিপর্য্যাস করে এমন সাহস জগতে কাহার? এই অনাদি অখণ্ড সত্তা সর্ব্বেশ্বর; ইনি অনন্ত তরঙ্গ বিমণ্ডিত মহার্ণব; আমরা ক্ষুদ্র স্রোতস্বরূপে এই মহার্ণব হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছি। পরিশেষে এই মহার্ণবেই বিলীন হইব। আমাদের অস্তিত্ব এই মহাসত্তায়—আমাদের স্থিতি এই মহাতত্ত্বে, আমাদের প্রলয় এই মহাসত্যে। দৃশ্যমান ভূতগ্রাম সেই মহালোকেই সমুদ্-ভাসিত; পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তে গভীর মধুর কণ্ঠে একদিন মহাজ্ঞান বিজ্ঞান ভাণ্ডার বেদান্ত কহিয়াছিলেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশান্তি' তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি সোঽয়ম্ পুরুষোজ্ঞায়মনিঃ শরীরমভি সম্পদ্যমান ইতি।"

চিন্তার চরম শিখরে সমারূঢ় হইয়া মনীষি প্রবর স্পিনোজা সেই অনাদি-নিধন অপ্রমেয় অক্ষয় মহাসত্যের বিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই মহা পারমার্থিক সত্তাকে "Substance" এই মহাভিধানে সংজ্ঞিত করিলেন

তিনি শিখাইলেন—এই মহাতত্ত্ব অনাদি, অনন্ত এবং স্বতঃসিদ্ধ। তিনি সকলেরই সূক্ষ্ম কারণরূপে বিরাজমান; কিন্তু, তাঁহার কোন কারণ নাই। অব্যয়, অপরিবর্ত্তনীয় ও অখণ্ড। তিনি সকলের মৌলিক শক্তি-প্রস্রবণ বেদিতব্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত। তাঁহা হইতেই জগতের উদভব, প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার অনন্ত বিস্তারেই সকলের ঐকান্তিক বিলয়। তিনি কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাতীত। তিনি দিক্ ও কালের বাহিরে। স্পিনোজা সেই জগদাদি কারণ, পরিবর্ত্তন প্রবাহ-বিরহিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণসূত্র, অতীন্দ্রিয় পরম সত্তাকেই 'Substance" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

একদিকে বাহ্য জগতে নৈসর্গিক অনন্ত ঘটনা প্রবাহ প্রকৃতির প্রীতিময়ী ধাত্রীর ন্যায় নিরন্তর বেশ-বিন্যাস সংসাধন করিতেছে। ঘটনার পরিসমাপ্তি নাই। কোন্ অলক্ষ্য ভাবে কোন অসীম পথে এই জড় ঘটনাবলী অবিরাম দুর্ব্বারবেগে ছুটিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? অহো ভাবাবলীর অনন্ত বীচি-বিক্ষুভিত মহাসমুদ্র!—ভাবিলে বুদ্ধি অবসাদ গ্রস্ত হইয়া পড়ে। সুদূর গগনপটে অসংখ্য তারকাবলী দীপ্যমান সুবর্ণখণ্ডের ন্যায় বিরাজমান রহিয়া নিসর্গের কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পৎ প্রবর্দ্ধিত করিতেছে! শশধরের বিশ্ববিমোহন রূপৈশ্বর্য্য দিনমণির অপ্রমেয় তেজোভাণ্ডার সমুদ্র-পথাভিসারিনী তটিনীর অব্যক্ত মধুর কুলকুলু ধ্বনি; বিশ্বরাজ্যের অতুল বৈভব, কুসুমের চিত্তহারিনী সুষমা, অনন্তোর্ম্মিবিলসিত মহার্ণব, বিরাট দেহ শৈলশ্রেণী, বহিঃ প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবতীয় পদার্থ-পুঞ্জ যেন অপ্রতিহত গতিতে অনন্তপথে সমাধি লাভ করিবার জন্যই প্রধাবিত!! অনন্তের কোন্ প্রান্তে ইহারা চলিতেছে তাহাই বা কে কহিবে? বহিঃ প্রকৃতির এই বিলাস সম্রাজ্যের অবধি নাই!

আবার অন্তর্জগতে দৃষ্টিপাত কর। ভাবের অনন্ত মহাসমুদ্র অসংখ্য ক্রিয়া! অগণ্য উচ্ছ্বাস! ভাবাবলীর নিরন্তর প্রবল প্রবাহ অবিরাম পরিবর্ত্তন স্রোতঃ—বড়ই অধার! যেন কোন অনন্ত পথগামিনী ভাবধারা মানব মনোরাজ্যে অসীমবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই অনন্ত সুখ-ভাব-নিবহ কোথায় পরিসমাপ্ত, কোথায় পরিব্যাপ্ত, আর কোথায় হইতে সমুদ্ভূত কে তাহার অবধারণ করিবে? একদিকে বহিঃ প্রকৃতির অবিরল অসংখ্য বিলসনা! অপর দিকে অন্তর্জগতের অনন্ত পথাভিমুখী গতি একদিকে ভৌতিক

রাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পৎ ইন্দ্রিয় গ্রামের বহু উপহারে পূজা করিতেছে। আর দিকে অন্তর্জগতে কি যেন কি এক দুর্জ্জয় দুর্ব্বার বেগে ভাবসঙ্ঘ উদ্ভূত হইতেছে। প্রকৃতির বৈভব কি অন্তর্জগতে কি বহির্জগতে উভয়ত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। প্রকৃতির এই নানা বিলাসভঙ্গীই অন্তর্জগতের এই আনন্দ স্ফূর্ত্তি; কোথায় বা সূক্ষ্ম জগতে অনন্ত বৈভবময়ী বিচিত্র ক্রিয়া আর কোথায় বা স্থূল প্রকৃতির ভাব-মহিমান্বিত অসংখ্য ঘটনার চারুদৃশ্য—সর্ব্বত্রই এক ভাব; এক অবস্থা; এক অনাদি সিদ্ধ—অনন্ত সত্তা তাহারই অনন্তভাব—বিজৃম্ভণ, এক অনন্ত মহার্ণবেরই অনন্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস। অন্তঃ প্রকৃতির অতল স্পর্শ মহাসমুদ্র—বহিঃ প্রকৃতির অনন্ত বিস্তার—সর্ব্বএই সমভাবে কি যেন অজ্ঞেয় নিয়মক্রমে একই স্বতঃসিদ্ধ সত্তার অনন্ত লীলা। ইহার কাহারও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই দুই জগতের গতি ও প্রসার জ্যামিতিক সমান্তরাল সরলরেখা ক্রমে সমাহিত হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকারণের কোন সম্পর্কে সম্বন্ধ নহে। ইহারা উভয়েই এক মহাতত্ত্বের দুই পার্শ্বস্বরূপ। ইহাদিগকে একই চিত্রের উত্তান ও ন্যুব্জ ভাব বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয় কোনরূপেই অসঙ্গত হইবে না। এক অনাদি পদার্থেরই দুই ভিন্ন রূপ বা উপাধি বিশেষ। ইনি কারণানুবিদ্ধ দুই জগতেরই মহা কারণ স্বরূপ। কারণের সূক্ষ্ম রন্ধ্রে এই দুই জগতই সমভাবে অনুপ্রবিষ্ট: উভয়েরই ক্রিয়া আছে; উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যক্ষ নিখিল ঘটনাবলী সেই আদি জ্যোতির ক্ষীণাভাস মাত্র। এই দুই জড়জগতের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য কোথায়? কোন্ অগম্য অনির্দ্দেশ্য অগাধ মহাসত্য এই দুই বিরুদ্ধ জগতের ঐকিক সূত্র? অনন্তর কোন বিন্দুতে ইহাদের একত্ব? ইহাদের বহির্ভাগে বা অন্তরালে কি মধ্যে কোন্ আদ্যাসত্তা স্বীকার্য্য? বুধবর স্পিনোজা অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে জড়েও নয়, অজড়েও নয়, এই দুইয়ের মিশ্রণও নয়, এতাদৃশী মহাসত্তার পরিকল্পনায় অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতির ঐক্য সম্পাদন করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তি অস্পষ্ট যুক্তি-পরম্পরা প্রথিত স্বমতাভিমানিন কারটিজিয়ান্ দর্শনশাস্ত্র বহু উপায়ে বিরুদ্ধ অশুদ্ধ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া এই দুনিরাক্ষ্য মৌলিক সত্যের অন্বেষণে নিরত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অসীম পরিধির উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেই মনোবুদ্ধির অতীত পারমার্থিক অনন্ত সত্যাবধারণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বুদ্ধিদোষে সেই উচ্চপথ হইতে মহাবেগে চ্যুত হইয়া পড়িলেন। বহিঃ প্রকৃতি ও অন্তঃ প্রকৃতির যে অনাদি মৌলিক

সত্তায় সন্ধি, সম্মিলন এবং একীকরণ বহুচেষ্টায় কারটিজিয়ান্ দর্শন সেই অক্ষয় ও সনাতনী সত্তার সমীপবর্ত্তী হইতে না হইতেই বহুদূর মোহাবেশে সরিয়া পড়িলেন। দ্বৈতরাজ্যের ঘোর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া অদ্বৈত তত্ত্বের মহাসূত্র ভুলিয়া গেলেন। অন্তর্‌জগৎ ও বহির্জগৎ অনন্তের কোন বিন্দুতে আশ্রয় লাভ করিয়া ময়াময় দ্বৈধ ভাব দূরীভূত করিল? এই দর্শন শাস্ত্র কোনও ক্রমেই তাহার নিশ্চিত মীমাংসায় সমর্থ হইল না।)

দার্শনিক ইতিহাসে স্পিনোজার এই সমন্বয় চেষ্টা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎ-পাতের ন্যায় ইয়োরোপীয় বুধমণ্ডলীকে একেবারে সন্ত্রাসিত করিয়াছিল? যাঁহারা পূর্ব্বতন শিশুস্বভাবসুলভ অনিয়ত নিরর্থক বাগ্ বিন্যাসে অথবা অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক কল্পনার বৃথা কথায়, মনুষ্যজাতিকে উৎপথগামী করিতে প্রবৃত্ত ছিল, তাহারা স্পিনোজার জ্ঞান প্রভায় অতি দূরে অপসৃত হইয়া পড়িলেন। তিনি অভ্রান্ত সুস্পষ্ট বাক্যে কহিলেন, এক অনাদি মহাকারণের অনন্ত বিবর্ত্তনে এই —পরিদৃশ্যমান সংসার প্রপঞ্চ; তিনি সৎ ও শুদ্ধ Natura (লীলা Naturata শুধু Natura Naturans এরই নিত্যের—অনন্ত বিপরিবর্ত্তন প্রবাহ।*

বিবর্ত্তন প্রবাহের আদি অন্ত মধ্য এই অনাদি অখণ্ড স্বতঃসিদ্ধ সত্তার অপরিসংখ্যেয় ভাব নিবহ দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে অনুবিদ্ধ। সত্তাই—তাঁহার চিরন্তন ধর্ম্ম; তাঁহার এই অনাদি সত্তা কোন বাহ্য কারণাপেক্ষিণী নহেন! কেননা, তাহার বহির্ভাগে কিছুই নাই। অনন্ত বিবর্ত্ত-সজ্ঞ এই মৌলিক কারণভূত মহাতত্ত্বের মহা কেন্দ্রকেই সমাশ্রয় করিয়া অবস্থিত; বাহ্যজগত্ ও অন্তর্জগত্ উভয়ই যেন সরল রেখা ক্রমে গতি, প্রসার ও পরিণতি লাভ করিয়া চরমে সেই চরমস্তরে মহাকারণের মহাসত্তার বিলয় লাভ করে। তুমি, আমি, ঘট পট সেই সূক্ষ্ম কারণানুস্যূত; কাহারও বাস্তবী বিদ্যমানতা নাই।

অন্তর্জগতের ভাব বিশেষ সেই রাজ্যেরই ভাবান্তর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতেছে; আবার বহিঃ প্রকৃতি বহিঃ প্রকৃতিরই নিয়তি নির্দ্দিষ্ট মহাশাসনে সতত প্রতিহত।

স্পিনোজা এই মহাসত্তাকে গুনাধিষ্ঠাত্রী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহার এক গুণ Extension (জড়) এবং অপর গুণ Thought (অজড়) এই দুই গুণ বিজৃম্ভণেই বাহ্য ও অন্তর্জগতের লীলাময়ী বিদ্যমানতা।

এই অনাদি নিধন পারমার্থিক তত্ত্ব বুদ্ধির সম্পর্ক পরিশূন্য; বুদ্ধি জীবা-শ্রয়িনী অসম্পূর্ণতার জ্ঞাপিনী "স্বতঃপূর্ণ, স্বতঃসিদ্ধ, অক্ষর সত্তায় তাদৃশী অপূর্ণতা

কেমন করিয়া থাকিতে পারে? যিনি সকল শক্তির মূল শক্তি যিনি অনন্ত জ্ঞানের অনন্ত প্রস্রবণ, যিনি সারাৎসার, তিনি জীবাধিষ্ঠিতা বুদ্ধি সংযোগে কেন সীমা-চক্রের অন্তর্বর্ত্তি হইবেন, তাহা যুক্তির অগম্য। পরম বিজ্ঞানের চরণোপসনায় জ্ঞানবীর স্পিনোজা এই অক্ষয় সত্যকে অপূর্ণতা দ্যোতিনী অভাবভূতা গুণা বলম্বিনী ইচ্ছাকে যেন ভীতিসঙ্কোচ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনেক দূরে পরিহার করিয়া কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন। অনন্ত কার্য্যকারণের সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের আদিম প্রদেশে যাহার অবস্থিতি, তিনি কিরূপে বাহ্যকারণ স্পৃষ্ট হইয়া আপনাকে অপূর্ণতার গাঢ় তমিস্রাময়ী বিভিষিকারূপে প্রতিপাদন করিতে পারেন। বুদ্ধি, ইচ্ছা, অভাব, উদ্দেশ্য, অপূর্ণতা, অনাদি, পূর্ণ, অতীন্দ্রিয় অদ্বৈত সত্ত্বে কেমন করিয়া পরি পন্থী হইতে পারে? বিবর্ত্ত-পরিণামে বুদ্ধির আবির্ভাব—বিবর্ত্ত আকর্ষণে ইচ্ছার স্ফূরণ এইরূপ ভৌতিক ভাব জড়াতীত মহাসত্যের অভিব্যক্তি বলিয়া কদাচ পরিগৃহীত হইতে পারে না। বুদ্ধি বাসনা ভৌতিক জগতের ক্ষণিক আবির্ভাবে বৈচিত্র্য বিধান করিতেছে। অনাদি সিদ্ধ, পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্বার তদ্বিধ কোন বৈচিত্রের প্রয়োজন করে না।

আবার এই অনাদিসিদ্ধ সারাৎসার তত্ত্বই বিশ্বের নৈমিত্তিক উপাদান কারণ। ঊর্ণনাভ যেরূপ অন্তঃস্থ কোন অজ্ঞেয় শক্তি প্রভাবে সূত্রের উদ্ভাবনে তদ্দ্বারাই জাল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আপনার প্রয়োজনে সিদ্ধকাম হইয়া আপনারই মহানন্দে সতত বিভোর রহে, সেইরূপ সেই দেবাদিদেব মহাতত্ত্বও আপনার কি যেন এক দুর্জ্ঞেয় অসীম আভ্যন্তরীণ শক্তি ক্রমে উপাদান সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মাণ্ডের রচনা করিতেছেন। সেই বিরাট কার্য্যের মূলে বা মধ্যে বা অন্তরালে কোন্ অপ্রতিসংখ্যেয় শক্তির সমুচ্ছ্রায়, জীব-বুদ্ধি কেমন করিয়া তাহার ইয়ত্তা করিবে! এই অনন্ত মহিমময়ী নিগূঢ় সত্তার অসংখ্য বিবর্ত্ত প্রবাহে ভৌতিক পদার্থ মণ্ডলের প্রবৃত্তি। অনন্তের বহির্ভাগে উপাদানের পরিকল্পনা অবোধ শিশুকল্পনারই উপমাস্থল। অনন্তের বাহিরে উপাদানের অস্তিত্ব অথবা অনাদি উপাদানের উপর এই মহাসত্তার ক্রিয়া বিশেষে জগৎসৃষ্টি, অদ্বৈতবাদের ঘোরতর বিরোধী এই অনাদি নিত্যসত্তা—তৎসঙ্গে ভূত নিচয়ের অস্তিত্ব স্বীকার এবং তদুপরি কোন অলক্ষ্যউদ্দেশ্যের চরিতার্থতার জন্যে তাহার ভৌতিক ক্রিয়া—ইহার কিছুই বিশুদ্ধ সত্যান্বেষিণী যুক্তি আদৌ পরিগ্রহ করিতে পারেনা। নানাবিধ যুক্তিতে এই মতের অসমীচীনতা সপ্রমাণ হইতে পারে। প্রথমতঃ,

দুইটী অনন্ত তত্ত্বের পরিকল্পনা; দ্বিতীয়তঃ, স্বতঃসিদ্ধ মহাসত্যকে বাহ্য প্রয়োজনাধীন করিয়া তাহার অনন্ত শক্তির সঙ্কোচ সাধন এবং বহিঃস্থ উদ্দেশ্যের পরতন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সামান্য লৌকিক পদার্থের ন্যায় প্রতিপাদন করা, ইহার কিছুই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানানুগত নহে। কুম্ভকারের সহিত ঘটের যে সম্বন্ধ বিশ্বের সহিত বিশ্বস্রষ্টার কদাপি সে সম্বন্ধ নহে। কুম্ভকরা ঘটের উপাদান কারণ নহেন। কি শক্তি তিনি মৃত্তিকা সৃষ্টি করিয়া ঘটকার্য্যের সমাধান করিতে পারেন? এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল কার্য্যে অনন্ত অনাদি অনন্ত সত্তা বহিঃস্থ কারণান্তর বা উদ্দেশ্য বিশেষের পরতন্ত্র হইতে পারেন না; সেই জন্যই তাহাকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ স্বীকার করা ভিন্ন কোনক্রমেই সেই দেবাদিদেব সর্ব্বেশ্বরের অসীমতা, অনন্ত শক্তিমত্তা এবং অদ্বিতীয়তা সপ্রমাণ করিয়া দ্বৈতবাদের উপর অদ্বৈত বাদের বিজয়শ্রী সংস্থাপন একেবারেই অসম্ভব।

আবার স্পিনোজা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের অপৌরুষেয়ত্ব এবং কর্তৃকারকত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। অসীমসত্তা ব্যক্তিত্বের আরোপে সান্ত, সসীম হইবে, অদ্বৈততত্ত্ব দ্বৈতের মোহকূপে নিমগ্ন হইবে—মনীষি অগ্রগণ্য স্পিনোজা এই ঘোরতর প্রতিবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। অমিত প্রজ্ঞাবলে জড়াজড় জগতের বহির্গত অলক্ষ্য অনন্তের আদিবিন্দুতে এক নিরবচ্ছিন্ন অদ্বয় সমন্বয় সূত্র অবলোকন করিয়া কার্‌টিজিয়ান্ দর্শন শাস্ত্রের মহা ভ্রমের অপনোদন করিয়াছেন। দ্বৈতের নিবিড়চ্ছায়া এই পারমার্থিক সত্তার বিপ্রকর্ষ ঘটাইতে পারে নাই। অনন্তের পার্শ্বে আর কাহারও স্বাতন্ত্র্য ঘটিতে পারে না। অনন্তের অসীম বিস্তারে দ্বিতীয় সত্তার কল্পনা সত সত্যই যুক্তিবিরুদ্ধ। মহার্ণবে জলবিম্ব মহার্ণব হইতে পৃথক্ সত্তা নহে। অনাত্ম পদার্থ ব্যতীত আত্ম পদার্থ কদাচ হৃদয়ঙ্গম হয় না। অনাত্ম বস্তু আত্ম পদার্থের প্রতিযোগী ও বিপ্রকর্ষক। সত্যের প্রিয় উপাসক স্পিনোজা আপেক্ষিক জ্ঞানের আশ্রয়ে রূপ ও উপাধি কল্পনায় সেই পরম সত্তার পরিচ্ছেদে বড়ই কুণ্ঠিত হইয়াছেন। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষে আপেক্ষিকতার পূর্ণ উৎসাদন সত্য সত্যই অপরিহার্য্য।

এই পরম বেদিতব্য সত্তার ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সর্ব্বতোভাবে অনধিগম্য। সান্ত ও সাদিপদার্থের সঙ্কীর্ণ চক্রের মধ্যেই আমাদের বৈষয়িকজ্ঞান নিরুদ্ধ। এই জ্ঞান দিক্ ও কাল সাপেক্ষ, অতএব দেশ ও কালের অতীত সেই

মহাসত্য কেমন করিয়া ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পরিগ্রাহ্য হইতে পারেন? আন্বীক্ষিক জ্ঞান ও ইহার কিছু উচ্চস্থানীয় হইলেও বৈষয়িক রাজ্যের বড় অধিক দূরবর্ত্তী নহে, ইহাও বিষয় রাজ্যের সসীম গণ্ডীরই অন্তর্নিবিষ্ট। এই বিষয় রাজ্যের পরপারে মায়িক জ্ঞানের অবসানে ঐ অতীন্দ্রিয় সনাতন তত্ত্বের উপলব্ধি সম্ভবপর, বিদ্যুতের আকস্মিক স্ফুরণের ন্যায় মায়িক মোহের তিরোধানে সেই মহাজ্ঞানের প্রানন্দ উচ্ছ্বাস হয় কত কঠোর সাধনার পরে যে এই পরমসিদ্ধি হয় তাহা বাঙ্‌মনোতীত। এই মহাজ্ঞান সেই অপৌরুষেয় মহাতত্ত্বের নির্দ্দেশক ও পরিবোধক ইন্দ্রিয় বিকারের কলুষ সম্পর্কশূন্য মায়িক মোহাতীত' শুদ্ধ আনন্দ—অনন্ত শান্তি—আত্মার চরমপরিতর্পন। পরম বিজ্ঞান বেদান্তও অবিদ্যা বা মায়ার বহির্ভাগে—সচ্চিদানন্দের প্রাণময় বিলাস অবলোকন করিয়া ভাতি-বিধুর জীব-মণ্ডলীকে আশ্বাসের মধুর সঙ্গীতে সমাশ্বস্ত করিয়াছেন।

এই বিশ্বোৎপাদিনী মোহময়ী অবিদ্যা বা মায়া না ঘুচিলে অদ্বৈত রাজ্যের অনন্ত সুষমা কিম্বা সচ্চিদানন্দের মোহন রূপমাধুরী অনুভূত হইবে না। যতদিন সাধনার চরমোৎকর্ষে—এই মহাসিদ্ধির আবির্ভাব না হইবে, ততদিন সাংসারিক ভোগ মোহের নিষ্ঠুর তাড়না মায়ার রৌদ্রশাসন - দুঃখের পৈশাচ ও প্রচণ্ড আঘাত।

চিরন্তনী পুরাতনী জ্ঞানদা ঋষি-সমুদীরিতা বৈদান্তিকী তত্ত্বকথায় মায়ার যথার্থ সংজ্ঞা বিনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কোথা হইতে কোন্ দুজ্ঞেয় কারণে, "সচ্চিদানন্দ" সেই অজ্ঞেয় সংসার কারণভূতা মায়ার আশ্রয়ে বিশ্বসৃষ্টি করিবেন, নিখিলার্থ গ্রাহিণী আর্য্য মনীষা তাহার সুস্পষ্ট অবধারণে যেন ভাত-ভীতবৎ দূরে অবস্থিত রহিয়াছে! যাহা হউক এই অনন্তসত্তার অসীম বিস্তারে ভৌতিক মোহের ভীষণ শাসন অতিক্রম করিয়া আপনার অবিদ্যাশ্রিতা ক্ষুদ্র সত্তাকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়া নিত্যানন্দের উপভোগ—জীবের চরমলক্ষ্য। কার্য্য কারণের স্বরূপ চিত্র অবধারণ করিয়া সেই অব্যয় অতীন্দ্রিয় পরম সত্তায় ঐকান্তিক সাযুজ্যলাভ জীবের চরমগতি। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন, "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোক ভাক্; সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্।" সেইরূপ স্পিনোজাও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তস্থলে প্রবেশলাভ করিয়া যেন কি এক মহীয়সী সাধনার অন্তে মহাসিদ্ধির আবেশে উদ্‌ভ্রান্ত মানবকে ভাব বিহ্বল হৃদয়ে আশ্বাসের মোহনমন্ত্রে বলিতেছেন, সেই সচ্চিদানন্দের মাঙ্গলিক সত্তায় আপনাকে একবার বিসর্জ্জন কর, দ্বৈত জগতের ভৈরবী মূর্ত্তী বিস্মৃত হইয়া অদ্বৈতের "কায়েন মনসা বাচা" উপাসনা কর এবং অবিদ্যার

নির্দ্দয় বন্ধনের একেবারে উন্মুলন করিয়া মহাবিজ্ঞানের সেবায় আত্মাকে চরিতার্থ করা—এ অতি মহতী সাধনা। প্রেমই সেই পরমযোগ। রূপজ মোহ বা কামজ আকর্ষণ সেই পারমার্থিক প্রেমের চিহ্ন নয়; সেই অনাদি সত্তার দুর্ব্বার আকর্ষণে বা উপাসনায় আত্মার—ঐকান্তিকী বিস্মৃতি বিষয় ভোগ বাসনার অনর্থকর দুর্দ্ধর্ষ তাড়নার নির্দ্দয় শাসন হইতে পরিমুক্তি সেই মহাপ্রেমের চরম প্রত্যক্ষলীলা। ইহাতে বিকার নাই—বিক্ষোভের আবিল সম্পর্ক নাই—কেবল অপার আনন্দ—দুঃখের ঐকান্তিকী নিবৃত্তি পরম শান্তি। প্রবৃত্তির উদ্দাম বা তাণ্ডব শাসনের অনুবর্ত্তনে মনুষ্যের যে সাময়িক মোহজ স্নায়বীক উচ্ছ্বাস হয়, এই প্রেমোল্য মহানন্দ কদাপি তাহার দৃষ্টান্ত বা উপমাস্থল নহে। সেই প্রেমভাবের ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে জীবের কি যেন এক অজ্ঞেয় অনির্ব্বচনীয় অপ্রমেয় শক্তি সঞ্চার হইয়া তাহাকে মোহন আহ্বানে অনন্তের উর্দ্ধরাজ্যে টানিয়া লয়। আত্মাহুতির বিনিময়ে মহাতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন—স্বরূপদর্শনে প্রাণান্দামৃত লাভ সেই প্রেমের শেষ গতি। ইহাকেই জ্ঞানিগুরু স্পিনোজা (Amor Intellectualis Intellectual Love of God) এই মহা আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সেই নিরবচ্ছিন্ন সুখস্নিগ্ধ মহারাজ্যে ভৌতিক দুঃখের পূর্ণ বিস্মৃতিতে দ্বৈত জগতের মোহবিজৃম্ভিত নৈশ তমিস্রার অবসানে আত্মার আনন্দামৃত—কি যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস—এই বৈদান্তিকী মধুবাক্ষরা বাণীর অমিয় আস্বাদে জ্ঞান বিজ্ঞানের চিরন্তন উপাসক আর্য্যঋষিগণ একদিন আপনাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। জ্ঞানিগুরু স্পিনোজাও সুদূর ইউরোপে আমার বাগ্‌বিতণ্ডা আলোড়িত সেই—প্রতীচ্য ভূখণ্ডেও—একদিন মহাসাধনার অন্তে সিদ্ধির আনন্দসাক্ষাৎকারে আপনার সর্ব্বাভিভাবিনী জ্ঞান প্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া সুখদুঃখাতীত বিকারবিক্ষোভানাশ্রিত ভৌতিক অন্ধকার বিনির্ম্মুক্ত বুধবরেণ্যবৃন্দনিষেবিত অদ্বৈত রাজ্যের বিজয়গরিমা গান করিয়া মহাসত্যের উপাসনা করিয়াছেন। ভ্রমের অবসানে তত্ত্বজ্ঞানের মধুর আবির্ভাবে, সুদীর্ঘ স্বপ্নের তিরোধানে, প্রাণদ জাগরণের ন্যায়, বিকার বিহ্বল জীবমণ্ডলী মায়িক দ্বৈতজগতের বিভীষিকার করালগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সেই "জ্ঞানং সত্যং শিবং সুন্দরম্" মহাতত্ত্বের—উপাসনায় প্রবুদ্ধ হইবে—পরমবিজ্ঞান বেদান্ত এবং বুধ-সিংহ মনীষিপ্রবর স্পিনোজা উভয়ই অভ্রান্ত মধুর সঙ্গীতে যেন সকলকে জাগাইয়াছেন। ভ্রমবিপাকে বিজড়িত হইয়া কেহ যেন সেই মহাসত্য না ভুলিয়া যান।

ময়মনসিংহ—নেত্রকোণায়

মুশলমান প্রবেশ

ও

বঙ্গ ইতিহাসের একটি ভুল।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস লিখিত

সুসভ্য সমাজে ইতিহাসই অতীতের সাক্ষী। ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত আজ কাল কেহ কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গেলে পদে পদেই উপহাস ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় বঙ্গভাষায় সেইরূপ ধারাবাহিক কোন ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং অতীতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভ হইতে ঐতিহাসিক সত্য বাহির করিতে হইলে নানাবিধ লোক প্রবাদ ও পরম্পরাগত কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমরা বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠে জানিতে পারিয়াছি যে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি বুখ্‌তিয়ার খিলীজি সতর (১৭) জন অশ্বারোহী সহ বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী, নবদ্বীপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং বলপূর্ব্বক মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে যে সাহ সুলতান রোমীয় নামক জনৈক মুসলমান ধর্ম্মবীর ৩৯ জন ধর্ম্মপ্রাণ সহচর সহ মদনপুর নামক গণ্ডগ্রামে মুসলমান ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, বঙ্গ ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ দেখা যাইতেছে না। মাত্র মহাত্মা হাণ্টার সাহেব তদীয় বিখ্যাত ভারত ইতিহাসে মদনপুরের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ বঙ্গ ইতিহাসের সেই ভুল সংশোধন করিবার জন্য মদনপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা প্রমাণ সহ নিম্নে নিবেদন করিলাম। এই বিবরণটী যদি কোন কৃতবিদ্য সুলেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইত তাহা হইলে ভাবী বঙ্গ ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা উজ্জ্বলিত হইত সন্দেহ নাই কিন্তু আমার ন্যায় একজন নগণ্য নিরক্ষর পল্লীবাসী কর্ত্তৃক সংগৃহীত হওয়ায় সে আশা সুদূর পরাহত।

ময়মনসিংহ নগরী হইতে ৩১ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে ও বর্ত্তমান নেত্রকোণা টাউন হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ দিকে নির্ম্মল সলীলা সাইডুলী নদীর দক্ষিণ তীরে অসংখ্য সুবৃহৎ পাদপ সংকুল প্রকৃতি দেবীর অতি সুরম্য নির্জ্জন শান্তিময় স্থানে মদনপুর গ্রাম অবস্থিত। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুবিস্তৃত সড়ক উক্ত মদনপুর গ্রামের উপর দিয়া কেন্দুয়া থানা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

আজ প্রায় ৭০০ বৎসরের উর্দ্ধ হইল এই প্রকৃতির সুরম্য নির্জ্জন ক্রীড়া নিকেতন মদনপুর গ্রামে মোসলেম ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষ মহম্মদের কোরাণিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার মানসে সুদূর পাশ্চাত্য ভূমি রোম নগর হইতে মহাপুরুষ সাহ সুলতান রোমীয় ৩৯ জন সহচর সহ বহু বাধা বিঘ্ন ও দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করিয়া এই পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত মদনপুর গণ্ডগ্রামে আসিয়া আস্তানা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মের অভ্রান্ত সত্যগুলি এই অনার্য্যধ্যুষিত জনপদবাসীদিগকে বিতরণ করিয়া সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; অবশেষে বহুসংখ্যক ভক্ত শিষ্য বর্ত্তমান রাখিয়া বর্ত্তমান সময়ের ৬৮৪ বৎসর পূর্ব্বে ৪৪৫ হিজরী শকে মানবলীলা সংবরণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এবং তদঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান হইতে সমানে ভক্তি ও পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, সে সময়ে মদনপুর গ্রাম মদন কোচ নামক জনৈক কোচ জাতীয় পরাক্রান্ত লোক কর্ত্তৃক অধ্যুসিত ছিল, তাহার নাম হইতেই ইহার নাম মদনপুর হইয়াছে। মদন কোচ যে তৎকালে একজন ক্ষমতাশালী লোক ছিল তাহা তাহার বাড়ীর সম্মুখস্থ সুবৃহৎ লুপ্তপ্রায় পুস্করিণী দৃষ্টে এবং নিম্নলিখিত লোক প্রবাদ হইতেই অনুমিত হয়। যখন সাহ সুলতান রোমীয় ও তদীয় পীর সাহ সৈয়দ স্বরূপ ও সেরু তাতার পানীয়া দুতর মেজাজে ফরাস প্রভৃতি অনুচরসহ মদনপুর আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন তাহাদের অদ্ভূত ভাবভঙ্গী ও অপূর্ব্ব আচার ব্যবহার এবং পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া দলে দলে কোচ জাতীয় স্ত্রীপুরুষ তাহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল, তদৃষ্টে মদন কোচ নিতান্ত ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া এই মহাত্মা মহাপুরুষদিগকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল এবং বিষ মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিয়াছিল। বিষপানে ফকিরগণ সজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সান্ধ্য উপাসনার সময় সুলতান সাহেব চৈতন্য লাভ করিয়া যেই নমাজের আজান দিলেন অমনি অনান্য ভক্ত ফকিরগণ নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া উপাসনায় যোগদান করিলেন এবং দলে দলে নবধর্ম্মে দীক্ষিত মদনের স্বজাতীয় লোকগণ সমবেত হইল। ইহা দেখিয়া মদন কোচ রাত্রিযোগে সমস্ত ধনরত্ন লইয়া সপরিবারে পলায়ন করিল এবং তাহার একখানা নৌকা মদন হালে ডুবাইয়া রাখিয়া গেল। সেই নৌকার মাস্তুল আজও মদনহালে বর্ত্তমান থাকিয়া ভ্রমণকারী বিদেশীয়দিগের নিকট মদন কোচের পলায়ন বৃত্তান্ত সপ্রমাণ করিতেছে।

সুলতান সাহেব সদীয় ৩৯জন আউথিয়ার মধ্যে ১২ জন অকৃতদার অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছিলেন অবশিষ্ট ২৭ জনের বংশধরগণ খাদিম, খুসবাম ও ফরাস এই তিন উপাধিতে বিভক্ত হইয়া ত্রিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করতঃ দরগা বায়ৎ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। মদনপুরের পশ্চিম সীমানায় সৈয়দ সাহ খরূপ সমাহিত হইয়াছেন, তাহার উপর এক মসজিদ স্থাপিত হইয়াছে, এবং মধ্যভাগে মদন হালের দক্ষিণ তীরে সুবৃহৎ উথরা বৃক্ষের নীচে সুলতান সাহেবের ভাবী পত্নী সমাহিত হইয়াছেন। এবং গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা হইতে কয়েক শত হাত ব্যবধানে সাহ সুলতান রুমীয় সাহেব তদীয় অনুচরগণ সহ সমাহিত হইয়াছেন। ঐ কবর স্থান উচ্চ ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা দুইখণ্ড করিয়া ঘেরিয়া রাখা হইয়াছে। উত্তরের অংশ অন্দর খণ্ড এবং দক্ষিণের অংশ বাহির খণ্ড বলিয়া অভিহিত হয়। দুই একজন সুচী সংযত ফকির ব্যতীত অন্যের অন্দর খণ্ডে প্রবেশের অধিকার নাই, সুতরাং আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ কবরের কোন ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। বহুচেষ্টায় মাত্র সমাধি সময় ৪৪৫ হিজরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। মদনপুরের ফকিরগণ এখনও নিকটবর্ত্তী মুসলমানদিগের সহিত কোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন না এবং সামাজিক সম্বন্ধেও অনান্য মুসলমান হইতে ভিন্ন অবস্থায় বাস করিতেছেন। যখন আমরা শাহ সুলতানের সমাধিকাল নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছি, তখন তাহার আগমনকাল অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করিয়া লইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে না। লোকমুখে প্রবাদ এই যে সুলতান সাহেব শতাধিক বৎসর মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইহা যদি কেহ সত্য বলিয়া স্বীকার নাও করেন তথাচ তাহার প্রচার যে অৰ্দ্ধশতাব্দী ব্যাপীয়া চলিয়াছিল, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

বিভিন্ন ভাষাজ্ঞ ও বিভিন্ন দেশবাসী ব্যক্তিগণ আসিয়া এ দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একটা দল গঠন করা ২।৪।১০ বৎসরের কার্য্য নহে, সুতরাং এই হিসাবে অনুমান করিলে সুলতান সাহেবের মদনপুর প্রবেশ প্রায় ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে আসিয়া পড়ে, সুতরাং বঙ্গ ইতিহাসের ১২০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে বাঙ্গলায় মুসলমান প্রবেশ করে নাই এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্তমুলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে তদানীন্তন নেত্রকোণার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট আবদুল হক সাহেবের অনুরোধে নেত্রকোণায় মুসলমান প্রবেশের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ

জন্য বহু অনুসন্ধান করিয়া মদনপুর ও রোয়াইলবাড়ী, কেন্দুয়া খুঞ্জার দিঘী প্রভৃতি মুসলমানদিগের কীর্ত্তিকলাপ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কেবলমাত্র মদনপুরের বিবরণের কতক অংশ চারুমিহিরে প্রকাশিত হইলে পর জনৈক বন্ধু আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে আপনার লেখায় ইতিহাস ভুল হইয়া পড়িয়াছে, আমি ইহার পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যে ঐতিহাসিক অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হইয়াছি, তাহা সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি, আশা করি ভাবী ঐতি-হাসিকগণ এই ভুল সংশোধন করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের মুসলমান প্রবেশ লিখিয়া রাখিবেন। ইতি—

দল।

শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল এম এস লিখিত।

আমি কালো ভালবাসি, তুমি শাদা ভালবাস। আমি হয়ত কালোর ভিতর অনেক সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার চক্ষে তাহা পড়ে নাই। আবার তুমি শাদার ভিতরে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ, আমার চক্ষে তাহা পড়ে নাই, সুতরাং তুমি যে কালো অপেক্ষা শাদাকে অধিক ভালবাস সেটা তোমার দোষ নহে, এবং আমি শাদা অপেক্ষা কালোকে যে অধিক ভালবাসি এটায় আমারও দোষ নাই। উভয়ের স্থান, সংসর্গ, ভূয়োদর্শন প্রভৃতি কারণে ইহা উৎপন্ন।

আমি পাহাড়ের দেশে জন্মি নাই, নদীআবৃত দেশে জন্মি নাই তাই আমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিকে ভালবাসি। তুমি পাহাড়ের দেশে জন্মিয়াছ, তুমি অভ্রভেদী অচল শেখর, হিম-শুভ্র শৃঙ্গও শীতল সমীরণ ভালবাস, তোমার দেহ তথায় ভাল থাকে, আমার সমতলে দেহ ভাল থাকে। এজন্য তুমিও দোষী নও, আমিও দোষী নই, ইহা প্রকৃতির নির্ব্বাচন।

তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ, তাহাতে শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, বিষয়-বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য আছে। আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্ম ভাব, সাধনা, পবিত্রতা পুরুষানুক্রমে আলোচিত হইতেছে। রাম যে বংশে জন্মিয়াছে, তাহাতে শিল্প-কলা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সৌন্দর্য্য-বোধ সহজেই উৎপন্ন হয়। ভীম যে বংশে জন্মিয়াছে, তাহাতে

বীরত্ব, তেজ, ন্যায়পরতা, নেতৃত্ব আপনা হইতেই সম্মানিত হইয়াছে। অথচ সেই বংশেই অর্জ্জুন জন্মিয়া কৃষ্ণ সহবাসে সাত্ত্বিক ভাব শিক্ষা করিয়াছেন। কেহ বা দেশ গুণে স্বদেশপ্রিয়তা, পরোপকারপ্রিয়তা, মনুষ্যত্ব শিক্ষা করিয়াছেন। অবার কেহ কেহ বা প্রকৃতির গুণে স্বার্থান্বেষণ, আত্মসেবা আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ। এজন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারিনা। সকলে বিশেষত্ব উত্তরাধিকার ক্রমে পাইয়াছে। তুমি উকীল, ব্যবহার শাস্ত্র শিখিয়াছ, তোমার সন্ধান-বুদ্ধি, তীক্ষ্নদৃষ্টি, কূট-তর্ক, বিষয়বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে। আমি চিকিৎসক, লোকের ক্লেশ নিবারণ, বেদনা লাঘব, রোগ দূর করিবার জন্য যে আয়াস ও তজ্জন্য যে লক্ষণ জ্ঞান, ভেষজ নির্দ্দেশ, ভূয়োদর্শনে আমি শিখিয়াছি। এইরূপ, কার্য-ক্ষেত্রেই বুদ্ধির বিকাশ হয়, তজ্জন্য তোমার কি আমার বিশেষ দোষ কি গুণ নাই।

জগৎ এইরূপ বৈচিত্র্যের রঙ্গভূমি, এই বৈচিত্র ভগবৎ-কৃপা, নতুবা জগৎ চলিত না। একজন চাষ করিবে, একজন কাপড় বুনিবে, একজন সেলাই করিবে, একজন পাক করিবে, একজন ঘর প্রস্তুত করিবে। ফলতঃ মানবের প্রত্যেক অধিকারী একটী করিয়া ব্যবসার সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং এক একজন উপযোগীতা অনুসারে এক এক কার্য্য লইয়াছেন। সকলেই জগৎপালিনী মাতৃ-দেবীর ঘরে কিঞ্চিৎ সহার্য্যের জন্য আহূত হইয়াছে। সেই অনন্তশক্তিশালী গৃহদেবতার ঘরকন্নার এক একটী উপকরণ এক এক জনের হস্তে রহিয়াছে। চাষার হাত কাজ করিতে করিতে শক্ত হইয়াছে, রাজার হাত তৈলমর্দ্দনে কোমল হইয়াছে, পাল্কীবেহারার কাঁধ বহন-কার্য্যের জন্য ফুলিয়া গিয়াছে। কার্য্যোপযোগী শিক্ষায় তৎসম্বন্ধে পরিবর্ত্তন, ইহাতে দোষ গুণ কিছু নাই।

অথচ আমি যেমন কার্য্য করি, তুমি তেমন কর না; আমি যাহা ভালবাসি, তুমি তাহা ভালবাস না। ইহা সমালোচনার বিষয়। সমালোচনা হইতে ঠাট্টা উপহাস, উপহাস হইতে তীব্র শ্লেষ, তহা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে দল। তুমি কি মনে কর, সকলেই এক কার্য্য করিবে; যদি তাহাই করে, তবে উভয়ের মধ্যে বিবাদ কেন? বরং প্রতিযোগী ব্যবসায়ই পরস্পরের শত্রু। স্বামী স্ত্রী উভয়েই চিত্রকর। স্ত্রীর চিত্র জগৎকে মোহিত করিল। স্বামী সেই চিত্র দেখিতে আসিয়া চিত্রকলার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইল না; ক্রোধে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, ঈর্ষ্যায় তাহার হৃদয়ে অগ্নি উদ্গীরিত হইল, মনে করিল, আমার যশ ইহার দ্বারা তিরোহিত হইবে। নরাধম ছোরা দ্বারা নিজের স্ত্রীকে, যে তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে, যে জিনিষ স্বামীর অপ্রিয় জানিলে পোড়াইয়া ফেলিতে পারিত, এমন স্ত্রীকে

ছোরা প্রয়োগে বিনাশ করিতে চাহিল। এই কি এক ব্যবসায় কি একরূপ কার্য্য করিলে প্রণয়?

আমি ভাবি বটে যে আমার মতন সকলে হউক। কিন্তু যদি হয়, তাহাকে আমি কি ভালবাসি? না। বরং দুই প্রকারের প্রকৃতি সহজে মিলিত হয়, একই প্রকারের হইলে বিবাদ হয়। দুই প্রকারের তাড়িত আকর্ষণ করে, এক তাড়িত্ব প্রাপ্ত হইলে বিতাড়িত করে, বিজ্ঞানের এই শিক্ষা। নারী প্রকৃতি যত কোমল হয়, বীরপুরুষ তাহাকে তত ভালবাসে, কিন্তু কঠোর প্রকৃতি রমণী কঠোরপ্রকৃতি পুরুষের মধ্যে চির বিবাদ। সুতরাং আমি ভাবি বটে যে, আমার মত সকলে হউক, কিন্তু আমার মত একজনকেও আমি সহ্য করিতে পারি না।

তবে কি হইলে মিলন হইবে? একরূপ হইলে হইবে না। আবার অন্যরূপ হইলে তুমি বলিবে, এ ব্যক্তি ঠিক আমার বিপরীত। আমি যদি তোমাকে না বুঝি, তুমি দুঃখিত হইবে। আর আমি ভালরূপ বুঝিয়া যদি তোমার সমালোচনা করি, তুমি মর্ম্মান্তিক চটিবে। তবে কোন্ পথে গেলে তুমি খুসী? তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার উপায় আমার নাই। কাহারও নাই।

তুমি যদি আমা হইতে উচ্চ হও, আমি ঈর্ষা করিব; যদি সমান হই, তুমি প্রতিযোগিতা করিবে; আর যদি ছোট হও, তবে তুমি ঘৃণিত হইবে। তবে কোথায় দাঁড়াই? অবস্থা, শিক্ষা কি পদের গুণে পরস্পরের মিলন হয় না।

ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখা যাউক, অনেকে মনে করেন, একধর্ম্ম হইলে মিলন হয়। সিয়া সুন্নি মুসলমানের বিবাদে কত নরহত্যা হইয়া থাকে, কায়স্থ ব্রাহ্মণের বিবাদে কত দলাদলি হইতেছে! রোমান- কাথলিক প্রটেষ্টাণ্ট কত জনকে জীবন্তে দাহন করিয়াছে, কতজনকে পশুর দংষ্ট্রে নিক্ষেপ করিয়াছে! নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে! দুই শাখাকে যদি দুই ধর্ম্ম বল, একের মধ্যেই তবে দেখ, অমুক কুলীন, ফুলে মেলের যাবনিক দোষ, বিষ্ণু দাসের উত্থান-পতন, অমুক স্থানত্যাগী, এইরূপ যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ লইবে, তাহাতেও দোষের অন্ত নাই।

মিলন কোথায়? দেখিলাম, এক আকৃতিতে নহে, এক প্রকৃতিতে নহে। এক ব্যবসায়ে নহে, এক বংশে নহে, এক ধর্ম্মে নহে। পৃথিবীর কোন্ জিনিসের কোন্ অবস্থায় কত মিশ্রণে যে মিলন, তাহা কেহই বলিতে পারে না সুতরাং আমরা নিরাশ হই, বুঝি এ পৃথিবী, মিলনের ভূমি নহে!

এক কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিবার সময় মিলন হয়, কিন্তু একটু আগে কি একটু পরে গেলে হয় না। রুষ-সেনাপতি কুরুপাটকিন নৃত্য দর্শনের জন্য নিম্নস্থ প্রধান সেনাপতিকে গুলি করিয়া মারিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য পরিত্যাগের সঙ্গে তঁহার পূর্ব্বশিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

একই পাণ্ডবপক্ষের দুই যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকী পরস্পর খড়্গ হস্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। কর্ণ বলিলেন, ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি যুদ্ধ করিব না, কুরুপক্ষে ভীম ও কর্ণ একত্র যুদ্ধ করিলেন না। ধর্ম্মক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের সমাজ হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র বাহির হইয়া অন্য সমাজ করিলেন। আবার পণ্ডিত শিবনাথ—"এ মোর প্রাণের ব্যথা, এ মোর মর্ম্মের কথা, কারে বলি কে শুনবে হায়!"—বলিয়া ডাক ছাড়িয়া বাহির হইলেন। তবে বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?

দেখিলাম, একক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পর্য্যন্ত মিলন হইল না, দল গেল না। সন্ন্যাসীগণ আপনাদের হইতে শ্রেষ্ঠ কোন লোক দেখিলে বিষ প্রয়োগ করে। দয়ানন্দ ও বিজয়কৃষ্ণ এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। বরং ধর্ম্মের গোল ভাঙ্গা আরও কঠিন, অন্য বাধা সহজে ভাঙ্গে।

কিন্তু প্রকৃতি মধ্যে আমার কি দেখি, অপার বৈচিত্র্য মধ্যে অপার সম্মিলন, অনন্ত প্রেম। আমরা দেখি—

কোমল কমল কলি, আজি যে পড়িবে ঢলি
তপন কিরণে;
তপনের পানে চেয়ে, হাসিয়ে বিকল হয়ে,
বান্ধয়ে বন্ধনে।

* * * *

প্রশান্ত গম্ভীর নীর সীমাহীন জলধির
থাকে অচঞ্চল,
সমীর সখার সনে মিশিলে আনন্দ মনে
করে কলকল।
পাহাড় লহরী তুলি হৃদয় ভাণ্ডার খুলি
করে সম্ভাষণ।

পরস্পর বিরোধী হইলেও প্রকৃতি পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। আম্র পল্লব পরস্পর সম্মিলিত, দীর্ঘ পূর্ণ মসৃণ পত্র, অগ্রভাগে ঝুপি হইয়া থাকে! মুকুল

ক্ষুদ্র ফুলরাজির সমষ্টি, ফলের ভিতরে বীজ, বাহিরে মিষ্ট ও কঠোর আবরণে আবৃত। পলাস পত্র পর্য্যায়ে অবস্থিতি, ঈষৎ দৈর্ঘ্যযুক্ত গোলাকার মসৃণ পূর্ণ পত্র। দুগ্ধস্রাবী পুষ্পরাজি একত্রিত হইয়া প্রকাণ্ড কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘায়ত ফল উৎপাদন করে। এবং ফলাদি এক বোটায় সংযুক্ত হইয়া অভ্যন্তরেই বিকশিত হয়। মিষ্ট আবরণে বেষ্টিত খাদ্যোপযোগী বীজ ভিতরে পাতালা গাত্রাবরণে আবৃত। কিন্তু এই দীর্ঘ বৃক্ষদ্বয় পরস্পর এক বাগানে সম্মিলিত। কেহ কাহারও বিরোধী নয়। আবার হীনবংশ মাধবী লতা স্বচ্ছন্দে সহকারে উঠিতেছে।

বিটপীর উচ্চ শিরে বাহিয়া উঠিছে ধীরে
লতা হীন জন।

পক্ষীগণ কত ভিন্ন পর্য্যায় শ্রেণীতে ও বিচিত্র রঙ্গে অবস্থিত, অথচ।

এক ঝোপে ডাকিছে পাখী সোণার বরণ মাখি
সুতানে সুস্বরে।
অন্য কুঞ্জে তদুত্তরে সঙ্গীত-লহরী ঝরে
তুষিয়া অন্তরে।

প্রকৃতির বিশ্ববিমোহন কুঞ্জবনে অহিংস্রক হরিণ, গরু, ছাগ, মেষ বিরাজ করে, আবার কিঞ্চিৎ দূরেই নখ দন্ত-সমন্বিত হিংস্র শ্বাপদকুল, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল বিরাজ করে; কোন উচ্চ ধ্বনি-সমুত্থিত বিশাল গর্জ্জন প্রকৃতি মধ্যে শুনি না। বরং তান লয় বিশুদ্ধ ভাবে সকল চলিতেছে, কেহ কাহাকেও না ভক্ষণ করে, এমন নহে, কেহ কাহারও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নহে; এমনও নহে; অথচ প্রকৃতির গভীর শান্তি বিচলিত হয় না।

এত বিরোধী ধর্ম্ম, এত সংঘর্ষণ, এত বৈচিত্র্য, তথাপি তন্মধ্যে এক অনন্ত প্রেম বিরাজ করে।

যখন বিশ্বরাজ্যে এই আপাতঃ-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে এমন পবিত্র প্রেম বিরাজ করে, তখন মানব পরিবার, যাহাকে তোমরা সৃষ্টির প্রধান বলিয়া থাক, তাহার মধ্যে কি সম্মিলনের সম্ভাবনা নাই? তাহারাই কেবল পরস্পর বিছিন্ন হইয়া দলাদলিতে বিভক্ত হইয়া বিবাদ বিসম্বাদে জগৎকে বিব্রত করিবে?

সুতরাং আমরা বুঝিলাম, এ কার্য্য ধর্ম্ম দ্বারা হয় না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ আছে, জগতে কতকালে একধর্ম্ম আসিবে, কে জানে? একবর্ণ, এক আকৃতি আসিবে না। প্রকৃতি মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিবেই। আর বড় যিনি, তাঁহার ন্যায় যদি ছোট উঠিতে চান, অমনি বলিবে, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর কেন?

পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম এ প্রতিযোগিতা নর-সংসারে থাকিবেই, একজন অন্যজনকে অতিক্রম করিয়া জীবন-সংগ্রাম ক্ষেত্রে চলিতে চাহিবেই চাহিবে। কিন্তু যতক্ষণ ও যেজন্য প্রতিযোগিতা, তাহা ভিন্ন বিরোধ রাখিও না। প্রতিযোগিতা জীবন-সংগ্রামের জন্য, জীবনের অভাব দূর হইলে তাহার কঠোরতা দূর কর। যখন সকলের এক মত, এক শিক্ষা হওয়া অসম্ভব, তখন তাহা চাহিও না। মস্তিষ্ক মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে, তাহার শ্বেত ও ধূম্র সামগ্রীর অভ্যন্তরে যে সকল শক্তি নিহিত আছে, এবং শরীরের যে শক্তি তাহার উপর ক্রিয়া করিয়া মিল স্পেন্সার হইতে নির্ব্বোধ জড়ভরৎ পর্য্যন্ত, খ্রীষ্ট ও কেশব হইতে জুডাস পর্য্যন্ত, নানা বৈচিত্র্যময় মানব-পরিবার গঠন করিয়াছে, তন্মধ্যে একতার আশা করা অসম্ভব, তাহা কখনও হইবে না, এবং হইলেও সংসার চলিবে না। হীন, দীন, বৃহৎ, শক্তিমান, দুর্ব্বল, মূর্খ থাকিবেই থাকিবে। তবে যদি বল, সব একরূপ না হইলে ভালবাসিব না। তবে তোমার আশা কখনও পূর্ণ হইবে না।

দেখিলাম, বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, একতা আমাদের আকাঙ্ক্ষা, মানব-পরিবারের শুভ-সম্মিলন আমাদের বাসনা, ধর্ম্ম-সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা। কেবল ধর্ম্মসমন্বয় কেন ? সকলের আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিশ্বের সমগ্র বিভাগে, সমস্ত মানব পরিবার মধ্যে এক গভীর প্রেম, গভীর সমন্বয় কিসে আসিবে ?

তুমি আমা অপেক্ষা শিক্ষা অধিক পাইয়াছ, তুমি ভাবিতেছ, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, রাম লিখিতে পড়িতে শিখে নাই, তাহার সিদ্ধান্ত তুমি সমীচীন মনে কর না। কিন্তু সহজেই মনে করিতে পার যে, আমারও ভুল হইতে পারে, অথবা উভয়েরই আংশিক ভুল। পূর্ণ জ্ঞান মানবের কখনই হয় না। এক-শ্রেণীর দার্শনিকেরা মনে করেন, জগতের সকলই ভ্রান্তি, আর এক শ্রেণী মনে করেন, অনেক বিষয়ে আমার জ্ঞান পরান্মুখ। সুতরাং যদি অনেক বিষয়ই আমরা না জানিতে পারি, তবে এক ভ্রাতা যদি আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম জানে, তবে সেজন্য তুমি রাগ কর কেন ? উপরে দেখিতে গেলে আমা অপেক্ষা কত পণ্ডিত আছেন, আবার নীচে দেখিতে গেলে মূর্খেরও অভাব নাই, ধনী অপেক্ষাও ধনী, রাজরাজেশ্বর আছেন। শক্তিশালী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শক্তি আছে। ছোট ও বৃহৎ, কিছুরই অভাব নাই। অতএব আগে মনে কর, আমি কত বিষয় জানি না, সুতরাং না জানে যে, তাহাকে ক্ষমা কর, শিখাইয়া লও, চালাইয়া লও, রাগ করিও না। আর যদি একজনে ভুল করে, কি দোষ

করে, ভাবিয়া দেখ আমার কত ভুল ও কত দোষ আছে, সুতরাং দোষ বুঝাইয়া দেও ও ক্ষমা কর। আমি কি ক্ষমার যোগ্য নহি? ভাবিয়া দেখদেখি, আমার হৃদয়ে কত দোষ দুর্ব্বলতা আছে, যদি ভগবান আমায় ক্ষমা না করিতেন, তবে আমার কি দুর্দ্দশা হইত। তুমি যেমন ভগবানের দরবার-প্রার্থী, সেইরূপ অন্য লোককে তোমার কৃপাপাত্র, মনে করিয়া ক্ষমা কর ও তাহাকে শিক্ষা দান কর। অবোধকে শিক্ষা দিবার জন্য জগতে কত প্রণালী হইয়াছে। একদল সিংহ ব্যাঘ্রের কবলে ফেলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, কোন দল অগ্নি ও তরবারী হস্তে করিয়া নরহত্যা ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির পরিচালন করিয়া মনে করিয়াছেন, উত্তম শিক্ষা দিলাম। কিন্তু সকলেই একরূপ নহে। আবার এক মূর্খ এক সদাশয় ব্যক্তির চক্ষু উৎপাটন করিল, সদাশয় মহাত্মা তাহার উচ্চ শিক্ষা দিয়া হৃদয়ে চির-অনুতাপানল প্রজ্বলিত করিলেন। কেহ আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা অজ্ঞান লোকের মুর্খতা দূর করিলেন। অশোধ্য দুর্ব্বৃত্তদের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, আবার মহাত্মাগণ নিজের শাস্তিদাতাদিগকে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, ক্ষম পিতা, তাহারা জানে না, কি করে!

এই উদারতার সহিত প্রেম চাই। উদারতা ক্ষমা করে, প্রেম চায় কোলে নিতে! আহা, আমার ভ্রাতাগণ অজ্ঞানতাকূপে পড়িয়া রহিল, এদের কি হবে, কেমন করিয়া এদের সংশোধন করি? ইহা কার্য্যের প্রসূতি। অমনি তোমার মনে শত উপায় আসিল, দয়াময় তোমার প্রার্থনা শুনিলেন। তুমি বিদ্যালয় করিলে, ড্যাভিড্ হেয়ারের ন্যায় শত শত লোককে শিক্ষা দিলে, তাহারা তোমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিল। মহম্মদ মহীসিন সৎকার্য্য, বিশেষতঃ শিক্ষাদানের জন্য প্রচুর ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন। আজি শত শত শিক্ষার্থী দরিদ্র সমস্বরে বলিতেছে, জয় মহম্মদ মহীসিনের জয়। বিদ্যাসাগর নারীগণের জন্য প্রাণ মন বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা ক্লেশ দূর ও অব্যবহারের জন্য অশ্রু ফেলিলেন। আজি সকলে বলিতেছে, ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই প্রেমের নিকট পাসণ্ড পরাজিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ যখন শ্রীচৈতন্য ও সাঙ্গোপাঙ্গের নিকট জগাই মাধাইয়ের দেহ ভিক্ষা করিলেন, তাহাদিগকে বলিলেন, "মেরেছিস কল্সীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না," তখন পাষণ্ড-গণ কাঁন্দিয়া আকুল হইল। শত প্রহারে, কি মোকর্দ্দমায় তাহা হইত না। সুতরাং প্রেম জগজ্জয়ী। প্রেমই ছোট বড়কে এক দৃঢ় অথচ সুখস্পর্শ কোমল রজ্জুতে বাঁধিয়া ফেলে। প্রেমে মহাশক্তি, প্রেমই ঈশ্বর।

আমার অদ্যকার বিষয় দল। আমাদের একটী সংস্কার আছে, যে দল বান্ধিয়া উহাকে শাস্তি দিব। গবর্ণমেণ্ট শাস্তি দেন আইন দ্বারা, আমরা শাস্তি দেই সামাজিক শাসন দ্বারা। সামাজিক শাসন প্রার্থনীয়, ইহার নাম Public opinion আইনের ভয় যাহা না করিতে পারে, সাধারণের মত তাহা করিতে পারে। এই সমাজের ভয় অনেক লোককে ভীত করে। বিশেষতঃ আমাদের হিন্দু-জাতি এই সমাজের ভয়ে এত অস্থির যে, সমাজবন্ধনের ভয়ে নড়িতে চায় না। আমি কুসংস্কার মানি না, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম চাই, এই কথা বলিলে সমাজ তোমাকে চাপিয়া ধরিবে, আর যদি তুমি বল বর্ত্তমান প্রণালীতে আমি বিবাহ দিলাম, তোমার আর সাধ্য কি ? অমনি তোমার গলায় পা দিবে। তুমি যদি বল, নারীজাতির ক্লেশ বিদূরিত করিব, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিব, বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিব, বহু বিবাহ দূর করিব, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিব, তোমার প্রাণ বাঁচান ভার হইবে। তুমি যদি বল, নিম্নশ্রেণীকে মানুষ বলিব, সাধারণ লোককে শিক্ষা দিব, সাম্যমন্ত্র প্রচার করিব, তোমার নড়িবার সাধ্য থাকিবে না, সমাজের বন্ধনে তোমার সর্ব্বাঙ্গ অচল হইবে। দল নামক প্রকাণ্ড রাক্ষস তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তাহা রক্ষ অনীকিনীর ন্যায় গজরাজ-তেজ-ভূজে, কালাগ্নি-সম্ভবা বিভার ন্যায় তোমাকে গ্রাস করিতে আসিবে, যদি ভয়ে পশ্চাৎপদ হও, তাহার গর্জ্জনে অধীর হইবে কম্পিত হইবে, কিন্তু সিংহ বীর্য্যে বল, আমি তোমায় গ্রাহ্য করিনা, অমনি প্রভাতকুয়াসা সম বালার্ক কিরণে গলিয়া যাইবে।

এই ত শক্তি, অথচ ইহার জ্বালায় বিলাতফেরত সমাজ-চ্যুত হইল। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, সকলে সমাজচ্যুত! যাঁহারা দেশের গৌরব, পবিত্র পুণ্যবান, তাঁহারা নাকি অস্পৃশ্য, তাঁহাদের অন্ন স্পর্শে ঘোর অধঃপতন! হায় মূর্খতা, তোমার শক্তি অসীম।

সামাজিক শাসন সামাজিক পাপের ঔষধ, সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞানযুক্ত শাসন, সেই মহৌষধ। ঈর্ষা, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা, ব্যক্তিগত ক্রোধ ইহার নেতা হইলে তাহার তামসিক শক্তি অতি ঘৃণিত। অধিকাংশ স্থলে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। এবং এইজন্যই যাহারা দল বান্ধে, তাহাদিগকে ঘৃণা করি।

এই দলের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত, সম্প্রদায়ের শক্তি অপহৃত, এবং প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের হস্ত পদ বাঁধা। তুমি শূদ্র, তুমি ওঁতৎসৎ

বলিও না, তোমার জিহ্বা খসিয়া পড়িবে। তুমি অন্যের স্পর্শ জল খাইও না, তোমার জাতি যাইবে। তুমি ছুঁইও না, আমার ব্রাহ্মণত্ব যাইবে। তুমি তোমার সর্ব্বদা অগ্নিদাহে জর্জ্জরিতা দুহিতার দুঃখ বিদূরিত করিতে পার না; তুমি তোমার পত্নীকে দিবালোকে বাহির করিতে পার না; তুমি তোমার প্রিয়তমা নারীগণকে শিক্ষা দিতে পার না; তুমি সমুদ্র পারে যাইতে পার না। তুমি অন্যের ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিতে পার না।

এই দল আজিকার শত শত বাঙ্গালী সন্তানকে হিন্দুসমাজ হইতে অপসৃত করিয়াছে, কাহাকেও মুসলমান, কাহাকেও খ্রীষ্টান বলিয়া দূরে রাখিয়া দিয়াছে। আহারে বিহারে, স্বার্থে পরার্থে তাহারা ভিন্ন। অথচ শাক্ত শৈব বৈষ্ণব গাণপত্যের ন্যায় খ্রীষ্টপন্থী, আল্লা-পন্থীকে দলে রাখিতে পারিত, হিন্দু-নামে অভিহিত করিতে পারিত। আমি জানি, অন্য ধর্ম্মের অত্যাচারে হিন্দু সন্তান যবন স্পৃষ্ট হইয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত হিন্দু অনুষ্ঠান করিয়াও দলে উঠিতে পারিল না। দিন দিন হিন্দুসমাজ ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইয়া, সূক্ষ্মতর ইথারের ন্যায় অন্তর্হিত হইতে চলিল, তথাপিও দলাদলি ঘুচিল না।

এই দলাদলি বাঙ্গালার নিজস্ব, অথবা হিন্দুর পৈতৃক সম্পত্তি। বাঙ্গালীর প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মে দলাদলি, জাতীয় সমিতিতে দলাদলি, ধর্ম্মে কর্ম্মে, আহারে বিহারে দলাদলি, এবং এই জন্য আমি মনে করি, বাঙ্গালী জাতি অধঃপতিত। মুসলমানের একতা চিরপ্রসিদ্ধ, বাঙ্গালীর দলাদলি তদপেক্ষা কম প্রসিদ্ধ নহে। ফলাফল সকলেই জানেন, তাই বলি, ভাই, ক্ষুদ্র চক্ষে জগৎকে দেখিও না, বিশ্বপিতার অনন্ত প্রেমের দিকে চাহিয়া দেখ, তিনি কি বলিতেছেন, আর তুমি কি করিতেছ! অনন্ত আকাশে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র কত দূরে থাকিয়াও এক পরিবারস্থ লোকের ন্যায়, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, কিরণ দানেও পরিভ্রমণে সহায়তা করিতেছে। আর আমরা একগৃহে থাকিয়াও মিলিতে পারিলাম না! পরের দোষ দেখিও না, অগ্রে ভাবিয়া দেখ, আমরা কোন্ বিষয়ে মিলিতে পারি। আগে প্রভেদের দিকে চাহিও না। প্রেম যেমন অনন্ত, বৈচিত্র্যও তেমনি অনন্ত, সুতরাং এই অনন্ত বৈচিত্র্য অনন্ত প্রেমের সহকারী। রামধনু সপ্ত বর্ণের সমবায়েই সুন্দর, পুষ্প সবুজ পত্রদল, লাল কি শাদা পল্লবদল সমবায়েই এত সুন্দর। পাখীর মধ্যে ময়ূর সাতরঙ্গের সম্মিলনে এত সুন্দর। কোকিল সপ্তস্বরের জন্য এত মধুর, হারমোনিয়ম বিবিধ স্বরযোগে এত মিষ্ট! তাই আসুন, ক্ষুদ্র বৃহৎ,

জ্ঞানী অজ্ঞান, বিদ্বান মূর্খ, বলবান দুর্ব্বল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, নমশূদ্র ভুইমালি, এক জননীর পুত্র, একমাত্র জননীর সন্তান বলিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করি। পদ্মার জল যখন পুকুরে আইসে, তখন যেমন তাহার ধাপদল কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি, এই সাহিত্যপরিষৎ সকল সাম্প্রদায়িকতা, দলাদলি, হি মুসলমান প্রভেদ দূর করিয়া এক ভাষা-ভাষীগণ আমরা ভ্রাতৃপ্রেমে মিলিত হই। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ময়মনসিংহের মুদ্রাযন্ত্র সংবাদপত্র।

রায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর লিখিত

মুদ্রাযন্ত্র লোক শিক্ষা এবং সাহিত্যচর্চ্চার এক প্রধান অবলম্বন; মুদ্রাযন্ত্রের সুস্থাবস্থা দেশের উন্নতির মানরজ্জু বিশেষ। দেশের ভাষা বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সভ্যতা প্রভৃতির অবস্থা অধ্যয়নের সহজ উপায় মুদ্রা যন্ত্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের ইতিবৃত্ত সকলেরই বিশেষরূপে অবগত: হওয়া উচিত। যাহা, প্রজার অশ্রু রাজার সিংহাসনে ও রাজার সান্ত্বনা প্রজার কর্ণে নিয়ত বহন করিতেছে, পৃথিবীর এক প্রান্তের জ্ঞান, সভ্যতা ও আবিষ্ক্রিয়া অপর প্রান্তে আনিয়া ফেলিতেছে একদেশের আলোকে অপর দেশের বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে, তাহার ক্রমোন্নতির প্রতি সকলের সবধান দৃষ্টি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। এ অঞ্চলের মুদ্রাযন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিবার তেমন সুবিধা ও সুযোগ হয় নাই। এই আশঙ্কায় আজ এ অঞ্চলের মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাসাধ্য অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে, তাহাই নিবেদন করিতে প্রয়াসী; ভ্রম প্রমাদ হওয়া অসম্ভব নহে, আশাকরি ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

প্রসঙ্গাধীন বক্তব্য এই যে, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে এণ্ড্রুজ সাহেব হুগলীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন। হল্‌হেড্‌ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে মার্শম্যান্‌ সাহেব "দিগদর্শন" নামে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। "ঢাকা নিউজ" পূর্ব্ববাঙ্গালার প্রথম সংবাদ পত্র; ইহা ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হইত, আলেকজেণ্ডার ফর্ব্বস্‌ সাহেব ইহার প্রথম প্রচার করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা "বেঙ্গল-

টাইম্‌স্” নাম গ্রহণ করিয়াছে। ১২৬৭ সালে ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু ভৌমিক প্রভৃতি কতিপয় দেশানুরাগী সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঢাকায় “বাঙ্গালাযন্ত্র” প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরের ১লা চৈত্র হইতে সুপ্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার “ঢাকা প্রকাশ” প্রচার করেন। “সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ ভাস্কর” এই দুই প্রতিদ্বন্দী পত্রের কবির লড়াইয়ের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধরুচি প্রবর্ত্তন করিয়া “সোম প্রকাশ” যেরূপ পশ্চিম বাঙ্গালায় বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের যুগান্তর আনায়ন করিয়াছে। “ঢাকাপ্রকাশ”ও সেইরূপ স্বাধীন ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সকল আন্দোলন করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার সংবাদ পত্রের উন্নতির পথ পরিষ্কার করেন। সেই অবধি অব্যাহত ভাবে ইহা চলিয়া আসিতেছে। ১২৭৯ সনের ১লা আষাঢ় হইতে “ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা” নামে একখানি পত্রিকা প্রথমতঃ পাক্ষিক পরে সাপ্তাহিক হইয়া ঢাকার নূতন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি প্রায় একবৎসরের পর অদৃশ্য হয়। ১২৭২ অব্দের ১লা চৈত্র হইতে শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার “বিজ্ঞাপনী” নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রথমে ঢাকার বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ১২৭২ সনের প্রথমভাগে সেরপুরের বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভা হইতে “বিদ্যোন্নতিসাধিনী” নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল। উহা ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। “বিদ্যোন্নতিসাধিনী” ময়মনসিংহের প্রথম সংবাদ পত্র। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রামদাস সেন প্রভৃতি কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহার লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি মেগাজিনের আদর্শে লিখিত না হইলেও উহাতে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, প্রসিদ্ধ লোকের জীবন চরিত প্রভৃতি প্রকাশিত হইত। সেরপুরের ইতিহাসের কিয়দংশ প্রসিদ্ধ কবি গোল্ড্‌স্মিথের জীবনী এবং অষ্ট্রেলিয়ার বৃত্তান্ত ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ নিবারণ প্রভৃতি ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় তদানীন্তন গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় “বিদ্যোন্নতি সাধিনী” তাহার সহযোগীদিগের অধিক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত না। আক্ষেপের বিষয় অসুবিধা নিবন্ধন উহারজীবন এক বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই। ইহার স্বল্প জীবন সাধারণের কোন বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু সেরপুরের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। পোষ্টাফিস সংস্থাপন, বহু বিবাহ নিবারণ ও সংস্কৃত ভাষা আলোচনার জন্য সভা এবং ভারতবর্ষীয় সভার শাখা সভা প্রভৃতি সুকার্য্যের

অনুষ্ঠান বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার পর হইতে হইয়াছিল, উহাই সেরপুরের প্রথম সভা।

১২৭৩ অব্দে ময়মনসিংহে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনের প্রথম আয়োজন হয়। পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ও ধানকোড়ার ৺ গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৺ হরিকিশোর রায়, ৺ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ৺ গঙ্গাদাস গুহ, ৺ পার্ব্বতী চরণ রায়, ৺বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং ৺দেবীদাস সেন মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ সভ্রান্ত ব্যক্তি এক নিয়ম পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ঢাকার "গিরিশযন্ত্র" ময়মনসিংহে আনিবার চেষ্টা করেন। উল্লিখিত নিয়ম পত্রের মর্ম্ম এই যে "গিরিশযন্ত্র" ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে আনীত হইলে লাভালাভের অর্দ্ধাংশ যন্ত্রস্বামী গিরিশবাবুর প্রাপ্য, অপরার্দ্ধ অংশ পরিমাণানুসারে অংশীদারদিগের মধ্যে বিভক্ত হইবে। কার্য্যের অবস্থা উন্নত হইলে অংশীদারদিগের প্রদত্ত টাকা শোধ এবং যন্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহের পর উদ্বৃত টাকা গিরিশবাবু যন্ত্রের মূল্য স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মূল্য শোধ হইলে, যন্ত্রের লাভ অংশীদারদিগের মধ্যে বিভক্ত হইবে। অংশীদারদিগের মধ্যে একজনও কার্য্যচালাইতে স্বীকৃত থাকিলে, যন্ত্র ময়মনসিংহ হইতে স্থানান্তরিত হইতে পারিবে না। দুইবৎসরের মধ্যে কেহই অংশ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই নিয়ম পত্র অনুসারে ১২৭৩ অব্দের আষাঢ় মাসে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র উল্লিখিত মহাত্মাদিগের প্রযত্নে ময়মনসিংহে আনীত হয়। ময়মনসিংহের এই প্রথম মুদ্রা যন্ত্র। "বিজ্ঞাপনী পত্রিকা"ও এই সময়াবধি ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত আরম্ভ হইয়াছিল; বিজ্ঞাপনী অধিক দিন জীবিত থাকে নাই, ১২৭৫ অব্দের ভাদ্র মাসেই ইহার আয়ুষ্কাল শেষ হয়। ময়মনসিংহ আসিবার পর হইতে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহার পরে নানা কারণে কার্য্য বিশৃঙ্খল ঘটায় বিজ্ঞাপনী যন্ত্র পুনরায় ঢাকায় নীত হয়।

১২৭৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ময়মনসিংহে হিন্দুধর্ম্মজ্ঞান প্রদায়িনী সভার সভ্যেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমশঃ প্রাদুর্ভাব দেখিয়া "আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" নামে একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ন্যূনাধিক দুইবৎসর কাল শুদ্ধবিষয়ে আলোচনা করিয়া ১২৮০ সালে "আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১২৮২ সনের পৌষ মাস হইতে "ভারতমিহির" সংবাদ পত্র ময়মনসিংহ ভারত মিহির যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়! আনন্দচন্দ্র তৎসম সাময়িক; উহা প্রথমতঃ মুক্তাগাছায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে ময়মনসিংহে আনীত

হয়। কালক্রমে ১২৯১ সালে ৺ শারদীয় পূজার সময় ভারতমিহির যন্ত্র এখান হইতে কলিকাতা নীত হয়। ১২৮৭ সনের শেষভাগে পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সেরপুরে এক মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করেন। উক্ত মুদ্রাযন্ত্র মদীয় নামে চারুযন্ত্র আখ্যাদিয়া "চারুবার্ত্তা" নামধেয় এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন! বাবু নৃত্যগোপাল গোস্বামী, বাবু অদ্বৈতচরণ বসু, টড্ রাজস্থানের বিখ্যাত অনুবাদক ও সাহিত্য সমাজে পরিচিত পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি দীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্তবাবু অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় যথাক্রমে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব ও পরমপূজনীয় পিতৃবন্ধু সেরপুরের অন্যতম ভূম্যাধিকারী ৺কিশোরীমোহন চৌধুরী, দেশ বিদেশ বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, সাহিত্য সেবী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয় প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা মহোদয়গণ ইহার রীতিমত লেখক ছিলেন। এই চারুবার্ত্তা পরিচালনা সম্বন্ধে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৺ কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার অল্প দিন পরেই "সুধাকর" নামে অন্য একখানি পত্রিকা এই প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কিন্তু "সুধাকর" অতি অল্প কাল মধ্যেই অন্তর্হিত হয়।

১২৯১ সনে ৺ শারদীয় পূজার পর চারুযন্ত্র ময়মনসিংহে উঠিয়া আইসে, ও অগ্রহায়ণ মাস হইতে "চারুবার্ত্তা" তথা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৯৬ সনের কার্ত্তিকমাসে নানা কারণে চারুযন্ত্র পুনরায় পরমারাধ্য পিতৃদেব মহাশয় নিজ বাড়ীতে আনয়ন করেন।

১৩০০ সনে পূজ্যপাদ পিতৃদেব, তাঁহার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ৺ দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে এক রেজেষ্টরি কৃত দলিল সম্পাদন করিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানকীনাথ ঘটক, ৺ শ্রীকণ্ঠ সেন ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথরায় মহাশয়গণের হস্তে চারুযন্ত্র ও চারুবার্ত্তা অর্পণ করেন। প্রথম অবস্থায়ই শ্রীযুক্ত শ্রীনাথরায় মহাশয় উহার পরিচালন ভার পরিত্যাগ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে ৺ শ্রীকণ্ঠ সেন মহাশয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘটক মহাশয়ের উপর অর্পণ করেন, তৎপর শ্রীযুক্ত জ্ঞানকীনাথ ঘটক মহাশয় এক বিশেষ নিয়মে উহার পরিচালন ভার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সোম মহাশয়ের উপর অর্পণ করেন। পরমারাধ্য পিতৃদেব যে সকল নিয়মে চারুযন্ত্র অর্পণ করেন, উহার প্রধান নিয়ম এই, যতদিন চারু-মিহির পরিচালিত হইবে, ততদিন চারুযন্ত্র পরিচালকগণের হস্তে থাকিবে;

ঐ যন্ত্র কোন ঋণের জন্য আবদ্ধ হইতে পারিবে না। চারুমিহির প্রচার বন্ধ হইলে "চারুযন্ত্র" পুনরায় পিতৃদেবের উত্তরাধিকারীগণের প্রতি বর্ত্তিবে। "চারুবার্ত্তা" এখনও "চারুমিহির" নামে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়দের যত্নে "স্বদেশ সম্পদ" নামক এক পত্রিকা বাহির হইয়া কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "আরতি" নামক একখানা মাসিক পত্রিকা ১৩০৭ সনের আষাঢ় মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

উপসংহারে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে, বহুকাল পূর্ব্বে সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে "কৌমুদী" নামক একখানি পদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা ও "আর্য্য প্রতিভা" নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল; এতদুভয় অকালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

টাঙ্গাইল আহ্লাদী প্রেস হইতে "আহাহ্লাদী" নামক একখানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত। করটীয়ার "আকবর ইস্‌লামিয়া" ও "হানিফী" উল্লেখ যোগ্য সংবাদ পত্র। অতি প্রাচীন সময়ে একজন শিক্ষিত মুসলমান দত্তের বাজারে এক কাষ্ঠের মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা এক উল্লেখ যোগ্য বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে এই নগরে সুহৃদ প্রেস হইতে "শিক্ষা প্রচার" নামক একখানি পাক্ষিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ইদানীং মুদ্রাযন্ত্র এবং মুদ্রণের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য ক্ষিপ্র হওয়া আবশ্যক; মুদ্রণ চিত্তাকর্ষ হওয়া উচিত। ময়মনসিংহের বর্ত্তমান মুদ্রা-যন্ত্রগুলি এদিকে কতদূর সফল হইয়াছেন তাহা এখানে আলোচনা করিতে চাইনা! এই প্রসঙ্গে গত ৩।৪ বৎসর মধ্যে ঢাকা নগরীতে মুদ্রাযন্ত্র এবং মুদ্রণের যে বিপুল উন্নতি হইয়াছে, যে সকল অনুকূল অবস্থার সহায়তায় ঢাকার মুদ্রাযন্ত্র উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, ময়মনসিংহে সে সকল অবস্থার অনুকূলতা না থাকিলেও ইহার যথেষ্ট উন্নতির পথ আছে। আমি স্বত্বাধিকারিগণকে সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি, বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ আয়োজনে এবং কি উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহে সংবাদপত্র পরিচালিত হওয়া উচিত, তাহা ময়মনসিংহের সাহিত্যিকগণের এক বিচারের বিষয় হইতে পারে।

পারসী ও আরবী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে অক্ষরান্তরীকরণ।

মোহম্মদ শহীদু-ল্লাহ লিখিত।

আজি কি আনন্দের দিন! আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী আজ জননী মাতৃভাষার সেবার জন্য এক স্থানে সমবেত হইয়াছি। মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে, কোন জাতি উন্নত হইতে পারে না। যেমন মাতৃস্তন্য ব্যতিরেকে শিশুর জীবন ধারণ এক প্রকার অসম্ভব, তেমনই মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কোন জাতীয় জীবনের স্ফূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। রোমকেরা গ্রীস জয় করিয়া গ্রীসীয় সভ্যতা গ্রহণ করিলেন, গ্রীসীয় সাহিত্য দর্শনাদি চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, কিন্তু জাতীয় ভাষা লাটিন ছাড়িলেন না। তাই রোমের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক রোমবাসীর, "আমি রোমান" এই উন্নত আত্মাভিমান্ ছিল। তাই রোম জগতের ইতিহাসে এক গৌরবময় পৃষ্ঠা রাখিয়া যাইতে পারিয়াছে। রোমানাধিকারে ব্রিটনে রোমীয় সাহিত্যের এত দূর চর্চ্চা ছিল যে স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত লাটিনে পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। কিন্তু জাতীয় ভাষার অনুশীলনের অভাবে ব্রিটেন হইতে রোমানদিগের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটনীয়দিগের জাতীয় জীবনের শেষ হইল। যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে নর্ম্মাণ ফ্রেঞ্চের চর্চ্চা ছিল ততদিন ইংরেজের জাতীয়তা (Nationality) সম্পূর্ণ গঠিত হয় নাই। জাতীয় ইংরাজি সাহিত্যের উন্নতির সহিত ইংরাজ জাতির উন্নতি হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশসমূহে জাতীয় ভাষার পরিবর্ত্তে লাটিনের চর্চ্চা হইত, ততদিন ইয়ুরোপের Dark age বা অজ্ঞানতার যুগ ছিল। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি যে জাতীয় উন্নতির সোপান, জর্ম্মান জাতি তাহার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এমন এক সময় ছিল, যখন জর্ম্মাণির ভদ্রাখ্যাধারী ব্যক্তিগণ জর্ম্মাণ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলা অভদ্রোচিত মনে করিতেন। তাঁহারা সমাজে ফরাসী ভাষা ব্যবহার করিতেন। ইহাই ভদ্রতার নিদর্শনস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইত। যতদিন এই অস্বাভাবিকতা (artificiality) ছিল, ততদিন জর্ম্মাণির জাতীয় জীবন সুষুপ্ত অবস্থায় ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে জাতীয় সাহিত্যের আলোচনার সহিত জর্ম্মণির উন্নতির সূত্রপাত হয়! এক্ষণে জর্ম্মা

জাতি যে গৌরবের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার এই জাতীয় ভাষায় অনুশীলনের ফলেই।

গোদুগ্ধ বা গর্দ্দভদুগ্ধ যেমন মাতৃদুগ্ধের স্থান অধিকার করিতে পারে না, সেইরূপ বিদেশীয় ভাষা কখন মাতৃভাষার স্থান অধিকার করিতে পারে না। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। নর্ম্মাণেরা ইংলণ্ড অধিকার করিয়া কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত নিজ ভাষা রাজশক্তিপ্রভাবে চালাইলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহারাই ঘৃণিত সাক্‌সন্‌দিগের ভাষা গ্রহণ করিয়া আধুনিক ইংরাজি ভাষার সূত্রপাত করেন। আরবেরা স্পেন জয় করিয়া ক্রমে ক্রমে স্পেনীয় ভাষা গ্রহণ করেন। তবে তাঁহারা তাহা আরবী অক্ষরে লিখিতেন। বলদৃপ্ত চাগ্‌তাই তুর্কবংশীয় তৈমুর-বংশধরগণও নিজ ভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানের ভাষা গ্রহণ করতঃ উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি করেন। যে সকল বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতা বাঙ্‌লা ভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষা চালাইতে চান, ইতিহাস বলিবে, তাহারা ভ্রম করিতেছেন। পূর্ব্বে এ প্রকার হয় নাই, এখনও এ প্রকার হইতে পারে না। তবে মাতৃ ভাষার চর্চ্চার সহিত উর্দ্দুর চর্চ্চা দূষনীয় নহে, বরং বাঞ্ছনীয়। বঙ্গীয় হিন্দু ভ্রাতাদিগেরও এ প্রকার উর্দ্দু চর্চ্চা করা উচিত। ইহা এক প্রকার lingua franca আছেই, এবং ইহা অতি সহজ। এই দুই কারণে ইহার দাবী হিন্দির দাবী অপেক্ষা অগ্রগণ্য। তবে আমি পুনরায় বলি, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন ভাষা হইতে রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষাকে সম্পদ্‌শালিনী কর; কিন্তু বিদেশীয় ভাষার নিকট মাতৃভাষাকে বিক্রয় করিও না।

বাঙ্‌লা যেরূপ বাঙ্‌লার হিন্দুর মাতৃভাষা, সেইরূপ বাঙ্‌লার মুসলমানেরও মাতৃভাষা। বাঙ্‌লা মায়ের হিন্দু মুসলমান উভয়েই সন্তান। ভাইভা'য়ে যদি মিল না থাকে, তবে মায়ের সেবা কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে? কিন্তু আমরা হিন্দু মুসলমান মুখে যতই বলি না কেন, "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই", ভেদ নাই" অন্তরে কিন্তু হিন্দু হিন্দুকে যে চক্ষে দেখেন, মুসলমানকে সে চক্ষে দেখেন না, বা দেখিতে পারেন না। মুসলমানও সেইরূপ মুসলমানকে যে চক্ষে দেখেন হিন্দুকে যে চক্ষে দেখেন না, বা দেখিতে পারেন না। ইহা কি গভীর পরিতাপের বিষয় নহে?

আজি শুভ সাহিত্যসম্মিলনে হিন্দুমুসলমানের অতীতের অপ্রিয় বাদবি-সংবাদের কথা তুলিতে চাহি না। তবে বাঙ্‌লা সাহিত্য সেবকগণের বোধ হয়

অজ্ঞাত নাই যে, ঈশ্বর গুপ্তের সময় হইতে এপর্য্যন্ত অনেক হিন্দু লেখক নাটকে উপন্যাসে মুসলমানের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। মুসলমান যে নীরবে সহিয়াছেন, তাহাও নয়।

তবে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় উদারচেতাঃ লেখকও বঙ্গীয় সাহিত্যে আছেন। সাধারণতঃ মুসলমান বলিতে, ধর্ম্মকর্ম্মরহিত, কদাচারী, গোখাদক, পূর্ব্বকালের অসুর-বংশোদ্ভব একজাতির কথা হিন্দুর মনে স্বতঃ উদয় হয়। তাই হিন্দু প্রবাদ রচনা করিয়াছেন, 'নেড়ে নয় ইষ্টী, আর তেঁতুল নয় মিষ্টি'। হিন্দু বলিতে, মুসলমান বুঝেন, বৃক্ষপ্রস্তরের উপাসক, দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণ-বর্জ্জিত, গোলামী-পরায়ণ এক জাতি। তাই মুসলমান বলেন, 'কাফের বেইমান'। এই স্থানে আমার পারশ্য কবি সা'দীর এক কবিতা মনে পড়িল।

"য়েকে যহুদ্ ব মুসল্মাঁ মুনা জেরাহ্ কর্ দন্দ
চুনাঁকেহ্ খান্দাহ্ গেরেফ্ত্ আজ নেজা'এ ঈশানম্॥
'ব তনজ্' গোফ্ত্ মুসল্মাঁ 'গার্ ঈঁ কাবালা 'এমন্।
দোরস্ত্ নীস্ত্ খোদায়া যহুদ্ মীরানম্' ॥
যহুদ গোফ্ত্ 'বতওরীত্ মীখোরম্ সওগন্দ্
ন্দা গার্ খেলাফ্ বুওদ্ হাম চু তু মুসলমানম্॥"

এক ইহুদী ও এক মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে পরস্পরের জাতি তুলিয়া শপথ করিতেছিল দেখিয়া আমার হাসি পাইল। মুসলমান শপথ করিয়া কহিল যে, যদি এই দলিল অকৃত্রিম না হয়, তবে ঈশ্বরের দণ্ডে তাহার যেন ইহুদীর মত ক্লেশাবহ মৃত্যু হয়। ইহুদী পালটিয়া নিজে ধর্ম্মগ্রন্থের দোহাই দিয়া বলিল যে, যদি তাহার দলিল সত্য না হয়, তবে ঈশ্বর যেন তাহাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীয় মত মুসলমান করিয়া দেন।

কি ঘৃণার কথা! মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করা মনুষ্যত্ব নয়; পশুত্ব। নিজ জাতি, ধর্ম্ম, দেশকে ভাল মনে করা অবশ্য মনুষ্যের স্বভাব। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য জাতিকে, কি অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে, কি অন্য দেশকে ঘৃণা করা কিছুতেই ন্যায়-ধর্ম্ম-সঙ্গত নয়। সাধারণতঃ অজ্ঞানতাই এই প্রকার ঘৃণার ভাবের জননী। আমরা যে বিষয় জানি না, সে সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই প্রতিকূল মত পোষণ করি। যদি কোন অপরিচিত শান্ত প্রকৃতির পশু সহসা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, আমরা ভীত হইয়া পড়ি। সর্ব্ববিষয়েই এইরূপ। যদি

আমরা অন্যজাতির ইতিহাস কিংবা ধর্ম্মশাস্ত্র, কিংবা লোকচরিত অপক্ষপাতভাবে পাঠ করি, তবেই আমাদের ঘৃণাভাব যায়। আমরা তখন দেখিতে পাই যে, তাহাদের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ আছে, তাহাদের ধর্ম্মেরও অনেক মহান্ সত্য আছে। যদি আমরা পূর্ব্ব হইতেই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া এ সকল আলোচনা করি, তবে হিতে বিপরীত হয়। কেন না, ভালমন্দ সকলেরই ভিতর আছে; তাহার উপর, চোখে যদি নীল চশমা পরি, তবে সব ত নীল দেখাইবেই। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে যথার্থ সহৃদয়তার অভাব আছে, তাহা এই কারণেই। এই সহৃদয়তার অভাব আচার ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, কাগজে-কলমে, রঙ্গমঞ্চে, রাজনীতিক্ষেত্রে, প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই অপ্রীতিকর বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি পছন্দ করি না। তবে এই কথার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, অনেকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, হিন্দুমুসলমানে কোনই অনৈক্য নাই। কিন্তু আমি বলি রোগ ঢাকা দিলে কি রোগ সারে, না চিকিৎসা করিলে? তবে চিকিৎসা অনেক সময় অপ্রীতিকর হয় বটে।

বঙ্গীয় হিন্দু বড় একটা আরবী ও পারশ্য সাহিত্য পড়েন না। মুসলমান ইতিহাসের পাতা উল্টান কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস যাহা কিছু পড়েন, তাহা ইংরাজীতে, কিম্বা মুসলমানবিদ্বেষী ইউরোপীয় পরিব্রাজকদিগের পুস্তকে। মুসলমান ধর্ম্ম তিনি পড়িয়া দেখিতে সময় পান না। যখন নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রই তিনি এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন, তখন অন্যপরে কা কথা। অথচ কোরাণ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস (না পড়িয়াই বিশ্বাস) যে, এক হস্তে তরবারি এবং অন্য হস্তে কোরাণ লইয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, কোরাণে এই প্রকার বিধি-ব্যবস্থা আছে। হাদিস সমূহের (অর্থাৎ যে সকল পুস্তকে হজরত মহম্মদের উক্তি লিপিবদ্ধ আছে, তাহাদের) অস্তিত্ব বোধ হয় তিনি জানেন না। মহাপুরুষ মহম্মদের জীবনী পাঠ করিতে হইলে ওয়াশিংটন্ আর্‌ভিঙ্ প্রমুখ খৃষ্টীয় লেখক-গণের শরণাপন্ন হন। তাহাতে এই হয় যে, তিনি মুসলমান জাতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি অলীক কুসংস্কার পোষণ করেন। তাহাতে মুসলমানের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব স্বতঃই হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

বঙ্গীয় মুসলমান অবশ্য বাঙ্গালার হিন্দুপ্রাধান্যের প্রভাববশতঃ হউক, কিংবা স্কুল কলেজে পড়ার খাতিরে হউক, একটু আধটু হিন্দু সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চা

করিয়া থাকেন। প্রায় সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ থাকায় এ বিষয়ে অনেকটা সুবিধা আছে। আজ কাল অনেক মুসলমান ছাত্র স্কুল কলেজে সংস্কৃত পড়িয়া থাকেন। ইহাতে তাহারা অনেকটা হিন্দু অনুরাগী হইয়া পড়েন বটে। কিন্তু উপনিষদ্ গীতা ও হিন্দু দর্শনশাস্ত্র পড়া না থাকায়, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের যে সংস্কার আছে, তাহাই থাকিয়া যায়। এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে রীতিমত সংস্কৃতভাষাজ্ঞান ও গুরোপদেশ আবশ্যক। কিন্তু কোন হিন্দুর নিকট সংস্কৃতশিক্ষার্থ মুসলান এ বিষয়ে উৎসাহ পান না। যদি কোন মুসলমান অগ্রসর হন, সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ অমনি "অনধিকারী" "অনধিকারী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। মুসলমানদিগকে কোন সংস্কৃত পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হয় না। আমি জানি, কয়েকটী মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হন নাই। আমার নিজের বিষয়েই দেখুন। আমি এম্, এ, তে সংস্কৃত পড়িবার জন্য ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করি। কিন্তু কয়েকজন সংস্কৃত অধ্যাপক আমাকে বেদ ও ব্যকরণ পড়াইতে অস্বীকার করায়, আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে হয়। দুঃখের বিষয়, ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ সুবিধার অনুরোধে আমার ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায়ও এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

আমি অনেকদিন হইতে হিন্দুমুসলমানের অনৈক্যের বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার প্রতীকারের এই একমাত্র উপায় স্থির করিয়াছি যে, মুসলমানগণ হিন্দু সাহিত্য, দর্শন, উপনিষদাদি আলোচনা করিবেন; এবং হিন্দুগণ মুসলমান সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অনুশীলন করিবেন। আমি বলি না যে, হিন্দুমুসলমান আপন আপন জাতীয় সাহিত্য ইতিহাসাদি ত্যাগ করিবেন। বরং হিন্দু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুদর্শনের সহিত মুসলমান দর্শন, হিন্দু উপনিষদের সহিত মুসলমান এল্‌মে তসাব্বফ্, হিন্দু সাহিত্যের সহিত মুসলমান সাহিত্য ইত্যাদি অনুশীলন করিতে থাকুন। মুসলমানও তদ্রূপ আপন কোরাণ হাদিসের সহিত হিন্দু উপনিষদ্ দর্শনাদির আলোচনা করুন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রাদির বিমিশ্রিত পাঠে দেখিবেন, কি অমৃত উৎপন্ন হইবে। নানক, কবীর, রামমোহন রায়, আল-বেরুণি, আকবর, আবুল ফজল, প্রভৃতি মহাত্মাগণ এইরূপ মিশ্রণেরই ফল।

কিন্তু আরবী ও পারশী ভাষা অধ্যয়ন করিয়া মুসলমান সাহিত্যাদির আলোচনা করা সকলের সম্ভবপর নয়। এই জন্য আরবী ও পার্শী পুস্তক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে আমাদের সম্পূর্ণ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না। নব বিধান সমাজভুক্ত স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় কোরান ও অন্যান্য কতকগুলি মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রসংক্রান্ত পুস্তকাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়া বাঙ্গালার ভাষা, বাঙ্গালার হিন্দু, ও বাঙ্গালার মুসলমান এই তিনকেই চিরঋণী করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার কার্য্য এক্ষণে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হয় বাঙ্গালা মায়ের কি এমন হিন্দু কিংবা মুসলমান সন্তান নাই? খলিফা আল্‌মনসুব, হারূণ্-র্-রশীদ ও আল্‌মামুন প্রভৃতির সময় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আরব্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল; এবং আকবরের সময় অনেক সংস্কৃত পুস্তক পারশ্য ভাষায় অনুবাদিত হয়। সাহ্‌জাদাহ্ দারা সেকো অনেক সংস্কৃত পুস্তক পারশ্য ভাষায় অনুবাদিত করান। এই সকল সংস্কৃত পুস্তকের মধ্যে অনেক অস্তিত্ব এক্ষণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আবু রায়হাণ আল বেরূনীর 'ফি ত্ তহ্‌কীকে মা লি-ল্ হিন্দ' (ভারত-তত্ত্ব) ও আবুল্ ফজলের আইন আকবরীর অধিকাংশ উপকরণ আজকাল অনস্তিত্বের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। এই সকল আরবী ও পারশী পুস্তক এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল অনুবাদ করিতে পারিলে ভারতের পুরাতত্ত্বের অনেক ছিন্নপত্রের পুনরুদ্ধার হয়। এতদ্ভিন্ন, আরবী ও পারশী ভাষার অনেক মৌলিক পুস্তকেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তারাফাহ্ নামক আরব্য কবির (ইনি মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন) কবিতা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ এই কবিতাটি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল:—

> লা আলায়্‌তু লাযান্ কাশ্‌হী কাশ্‌হী
> বিত্বানাতান্
> লি আদ্‌বিন্ রকীকি-শ্ শাফ্‌রাতায়নি
> মুহান্নাদী।

অর্থাৎ আমি শপথ করিতেছি যে, আমার কটিদেশ হিন্দুস্থানের দ্বিমুখ তীক্ষ্ণ-ধার তরবারির কোষ হইতে কখনও শূন্য থাকিবে না।

এই মুহান্নাদী (হিন্দুস্থানজাত) তরবারির উল্লেখে আমরা অবগত হই যে ভারতবর্ষে তীক্ষ্ণধার দ্বিমুখবিশিষ্ট তরবারি প্রস্তুত হইত, এবং তাহা আরবে প্রেরিত হইত। এইরূপ কোরাণে কাফূর (কর্পূর) ও জন্‌যাবীল (শৃঙ্গবের অর্থাৎ আদ্রক) শব্দের উল্লেখে, ঐ সকল দ্রব্য যে ভারতবর্ষ হইতে আরবে

রপ্তানি হইত, তাহা বেশ বোঝা যায়। এইরূপ আরব্য ও পারশ্য সাহিত্যাদির অনুশীলনে ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে।

আরব্য ও পারশ্য ভাষার পুস্তক বাঙ্‌লা ভাষায় অনুবাদিত করিতে হইলে, ঐ সকল ভাষা হইতে বাঙ্‌লায় অক্ষরান্তরীকরণের (transliteration) একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। বিখ্যাত Sacred books of the East Series এর অনুবাদকগণ প্রাচ্য ভাষাসমূহ হইতে অক্ষরান্তরীকরণের এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বঙ্গভাষায় আরবী ও পার্শী সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের একের অক্ষরান্তরীকরণ প্রণালী অন্যের অপেক্ষা বিভিন্ন, এবং তাহাও বৈজ্ঞানিক প্রণালী নহে। আমি প্রস্তাব করি যে, আরবী ও পার্শী হইতে বাঙ্‌লায় অক্ষ-রান্তরীকরণের এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য আরবী, পার্শী, বাঙ্‌লা, ও ইংরাজী ভাষাবিদ কয়েকজন বিজ্ঞলোক লইয়া একটি সব কমিটী গঠিত হউক। তাহাদের বিচারের জন্য আমি একটি প্রণালী উপস্থিত করিতেছি। যদি তাঁহারা অনুমোদন করেন, তবে যাহাতে ইহা সকলে গ্রহণ করেন তাহার চেষ্টা করা উচিত। *

এক্ষণে এই অক্ষরান্তরীকরণ প্রণালী অনুযায়ী আমি হাফেজের একটি গজল বাঙ্‌লাক্ষরে লিখিয়া মদুরেণ সমাপয়েৎ করি। এই গজলটির সহিত বাঙ্‌লা দেশেরও কিছু সম্পর্ক আছে। বাঙ্‌লার সুলতান গিয়াস উদ্দীন পূরবী সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করেন। তদবস্থায় তিনি গুল্, সার্ব, ও লালাহ নাম্নী তাঁহার তিন প্রিয়তমা পত্নীকে মরণান্তে তাঁহার শব প্রক্ষালন করিতে নির্দ্দেশ করেন। অনন্তর একদিন তাঁহার শরীরে জীবনের কোন চিহ্ন না দেখিয়া তাহাকে মৃত মনে করতঃ উক্ত পত্নীত্রয় তাঁহার নির্দ্দেশমত কার্য্য করেন। স্নানের সময় তাঁহার শরীরে জীবনের চিহ্ন দেখা যায়, অনন্তর তিনি কিছুদিন পর পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার উক্ত পত্নীত্রয়কে তাহাদের সপত্নীগণ "গাস্‌সালাহ" অর্থাৎ শব প্রক্ষালনকারিণী নামে অভিহিত করিতে থাকেন। এই কথা সোলতানের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন—

"সাকী—হাদীসে সর্ব বাগুল্ বা লালা "মীরপরদ"

---

* (পৃথক পত্রপৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য)

ইহা কবিতার এক চরণ হইল দেখিয়া, তিনি সভাসদগণকে তাহার অন্য চরণ রচনা করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ কবিতা পূরণ করিতে সক্ষম হইলেন না। তখন ঐ শ্লোকার্দ্ধ পারশ্য কবি সিরাজবাসী হাফেজের নিকট প্রেরিত হইল। তিনি এক রাত্রিতে নিম্নলিখিত গজলটি রচনা করিয়া সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দেন।

সাকী হাদীসে সর্ব বা গুল ব লালা "মী রবদ্।
ঈঁ বাহাস বা "সালাসা" এ গাস্সালা 'মী রবদ্।
ময়্ দেহ্ কেহ্ নৰ্ আরূসে চমন্ হদ্দে হুসন্ য়াফ্‌ত,
কারে ঈঁ জমাঁ জে সান্'আতে দাল্লালা মীরবদ্।
শকর্ শিকন্ শবন্দ্ হমাহ্ তূতিয়ানে হিন্দ্
জীঁ কন্দে পার্সী কেহ্ বহ্ বন্গালা' মীরবদ্।
তয়ে মকা ববীঁ বা জমাঁ দর্ সলূকে শে'র
কাঈঁ তিফ্‌লে য়াক্ শবাহ বাহে য়াক্ সালা' মীরবদ্।
আঁচশ্মে যাদআনা, এ 'আবেদ-ফেরেব্ বীঁ
কশ্ ক র্‌বানে সেহের্ বদম্বালা' মীরবদ্।
খাবে কর্দাহ্ মী খরামদ্ বা বর্ 'আরজে সমন্
আজ্ শরমে রূয়ে উ 'আরক আজ ঝালা' মীরবদ্।
আয়্মন্ মশব্ জে' এসবাএ ভুনয়া কে ঈঁ 'আযুজ্
মক্কারাহ্ মী নশীনদ্ বা মোহ্তালা' মী রবদ্।
চূঁ সামরী মবাশ্ কে জর্ দাদ্ বা আজ খরী
মূসা বিহিস্ত্ বা আজ্ পায়ে গোসালা' মীরবদ।
বাদে বাহার্ মী যজদ্ আজ বুস্তানে শাহ্
বজ্ ঝালাহ্ বাদাহ্ দর্ কদহে লালা' মী রবদ্।
হাফেজ জে শব্কে মযলিসে সুলতানে গিয়াসে দীঁ
খামুশ মশব কে কারে তূ আজ নালা' মীরবদ্।

[হে সাকি, লোকে সাইপ্রেস্ গোলাপ ও টিউলিপ পুষ্পের কথা আলোচনা করিতেছে—আর এই বাদানুবাদ করিতে করিতে তিন তিন বার পূর্ণ পাত্র শূন্য করিতেছে।

পাত্র পূর্ণ কর; কারণ নব অসি (ধর) পত্নী চরম সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছেন। এই বয়সে কেশপ্রসাধনে নিপুণতা প্রয়োজন।

হিন্দুস্থানের তোতাপক্ষিগণ (কবিগণ) সকলে কলকল রব আরম্ভ করুক। এই যে সুশ্রাব্য কবিতা বাঙ্গালা দেশে যাইতেছে, ইহা হইতে এই কবিতা সম্পর্কে স্থান ও সময়ের সীমা লক্ষ্য কর। একরাত্রির শিশু এক বৎসরের পথ বাঙ্গলা দেশে চলিল।

মুনিজন মনোমোহন কটাক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর--ঐ কটাক্ষের পশ্চাতে মন বাঁধিবার শিকলি আছে।

শিশিরসিক্ত সলজ্জ যূথিকার ন্যায় স্বেদজলসিক্তা প্রেয়সী কম্প্রবক্ষে মন্থর গমনে চলিতেছেন।

অধীর হইও না, সংসারের কুহকজাল হইতে আপনাকে রক্ষা কর।

সামরী মুসাকে ছাড়িয়া নির্ব্বোধের ন্যায় গোবৎসের অনুসরণ করিয়াছিল। তাহার ন্যায় হইও না।

বাদশাহের পুষ্পোদ্যান হইতে বসন্তের হিল্লোল বহিতেছে, আর টিউলিপ পুষ্প শিশির-মদিরায় পূর্ণ হইতেছে।

হাফেজ, সুলতানের মজলিসের আকর্ষণে নীরব থাকিও না—যদিও বিলাপই তোমার কার্য্যের পূর্ব্বে চলিল।

আমাদের সূতিকা-গৃহ।

শ্রীযুত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস্ লিখিত।

যখন স্বর্গ হইতে দেবশিশু জগতে অবতীর্ণ হয়, তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হয় কি না জানি না; কিন্তু যে গৃহে শিশুর আগমন হয়, তথায় নারীগণের হুলুধ্বনি ও আনন্দে পল্লি পূর্ণ হয়, নানা বাদ্যকর আসিয়া পারিতোষিক লইয়া যায় আত্মীয়গণ আনন্দে পূর্ণ হয়, যষ্ঠী দেবীর পূজায় কত খরচ হয়।

কিন্তু যে কুটীরে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, মাতা যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন, তাহাতে মনে হয় না যে এই ক্রিয়াটী পরিবারমধ্যে বিশেষ আনন্দের সহিত

অভ্যর্থিত হয়। তাহার একটী চিত্র নিম্নে প্রদান করিতেছি। শিক্ষিত পরিবার ও লক্ষপতিগণ ক্ষমা করিবেন, তাঁহাদের এ দোষ নহে। কিন্তু প্রকৃত জাতি কুটিরবাসী।

সে বাড়ীতে অনেক গৃহ আছে, যাহার দুই একটীতে বেশ বায়ুসঞ্চালন হয়। সুন্দর পরিষ্কার গৃহের অভাব নাই। অথচ বর্ষা হউক, শীত হউক গ্রীষ্ম হউক, সকল কালেই উঠানে একটী দ্বারহীন, অর্দ্ধ বৃত্তাকার চাটাই দ্বারা মোড়া খোয়াড় বা কুটির মধ্যেই এই প্রসবকার্য্য সম্পন্ন হয়। মেজে মোটেই উচ্চ নহে, চারিদিক আলি দিয়া রক্ষিত। কখনও কখনও শুনিয়াছি, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হওয়াতে শিশু জলমধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। কুটীরে কোন সরঞ্জাম নাই, একখানি দড়ির খাটিয়াও নাহি। কদাচিৎ খড় বিছাইয়া দেওয়া হয়। গৃহ খুঁজিয়া খুঁজিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন একখানা জীর্ণ তোষক বা কন্থা পুরাতন বস্ত্রে আবৃত এককোণে পড়িয়া আছে। সে গৃহ চির আর্দ্র। তাহাতে যখন প্রসূতি, ধাত্রী ও দুই একটী কুটুম্ব রমণী প্রবেশ করে, তখন নিঃশ্বাস বন্ধ হইবারই কথা। বাহিরের লোক বাহিরের আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, কিন্তু মাতা ও শিশুর ভাগ্যে এই গৃহে একুশ দিন কি এক মাস বাস। আবার সন্তান-প্রসবের পরে সেই গৃহে ধূমময় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। উহা দ্বায়্ল অঙ্গারক বাষ্প অপেক্ষাও বিষাক্ত, একাম্ল অঙ্গারক বাষ্প, Carbon monoxide ভয়ানক বিষ। তাহা, স্নেহের বাছনি, কুললক্ষ্মী, উভয়ের জীবনই এই প্রকারে সঙ্কটাপন্ন হয়। দুই এক স্থলে দেখিয়াছি, এই ধূম দ্বারাই জননী জীবনহীন সন্তান-প্রসবের পরে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছে। যে ঘটনা গৃহে পরিবার-মধ্যে ও অসংখ্য আত্মীয় স্বজনের নিকট এক অতীব আশার প্রস্রবণ বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা আশার প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া এক মহাশোকাবহ ঘটনায় পরিণত হইল।

এইরূপে শত শত গৃহ বংশহীন হইতেছে, শত শত হিন্দু পরিবার জগতে নির্ণাম হইতেছে। মাতা উহা সহ্য করিতে পারিলেও, শিশু কোমল অপূর্ণদেহ, অল্পবিকসিত ফুস্‌ফুস্, কোমল-চর্ম্ম; হায়, সে নবনীত পুত্তলি এমন করিয়া নিপীড়ন সহ্য করিবে কি প্রকারে? তাই শিশুর মৃত্যুসংখ্যা এ দেশে ভয়াবহ। আবার এক বৎসরের নীচেই শিশু অধিক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এবং ইহা বলিতে বোধ হয়, কেহই সঙ্কুচিত হইবেন না যে সূতিকা-গৃহই এই দুর্দ্দশার আকর।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে শিশুগণের মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা প্রায় অশীত ছিল। এক্ষণে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা শতকরা বিংশেরও নিম্নে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে বোধ হয়, ইংলণ্ডের অতীত মৃত্যুসংখ্যাই চলিতেছে। সমাজ-তত্ত্ববিদগণ ভাবিয়া অবাক হইতেছেন, কেন হিন্দুকুল বিনষ্ট হইতেছে। কিন্তু কোথায় রোগ, কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি ?

অন্য কারণ অনেক আছে, আমি জানি, এবং সে সকলের গুরুত্বও আমি লাঘব করিতে চাহি না। কিন্তু আমার মনে হয়, এইটী সর্ব্বাপেক্ষ গুরুতর। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার প্রিষ্টলি অম্লজান বাষ্প আবিষ্কার করেন। ইহার আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর হয়। Alchymy নামক দাসীর গর্ভ হইতে সেই মহান্ রসায়ন-শাস্ত্র জন্মগ্রহণ করে। এই অম্লজানই আমাদের নিঃশ্বাস পথে গমন করিয়া জীবন রক্ষা করে। এক্ষণে সর্ব্ববাদীসম্মত। যখন ইংলণ্ডে এ তত্ত্বের আবিষ্কার হয় নাই, তখন রেভারেণ্ড ষ্টিফেন হেলস্ নামক এক পাদ্রি গৃহমধ্যে বায়ু-সঞ্চালনের আবশ্যকতা আবিষ্কার করেন। জেল-সমূহে মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক হয় কেন, এ বিষয়ে এক কমিশন বসিয়াছিল। হেলস্ সাহেব সেই কমিশনের সভ্য ছিলেন। কেন তাহার মনে হইল জানি না—কারণ তিনি ১৬৭৭ সনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে প্রিষ্টলি ১৭৭৫ সনে অম্লজান বাষ্প আবিষ্কার করেন—হেলস্ বলিলেন, জেলের জানালা করিয়া দেও। জাহাজের মৃত্যু-সংখ্যা সম্বন্ধেও বলেন, যে জাহাজের বেড়ায় ফুকর করিয়া দেও। অমনি ইন্দ্রজালের ন্যায় মৃত্যু-সংখ্যা কমিয়া গেল।

এই হতভাগ্য দেশে যাহারা বিজ্ঞানের স্থান লইয়াছেন, মুল্লুক উজাড় হইলেও তাহাদের কুসংস্কার সারে না। এত বালকবালিকা মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছে; পেঁচোয় পাওয়া, মূর্চ্ছি ধরা, প্রভৃতি ভূতের কাণ্ড বলিয়া রোজা ডাকা হয়; কিন্তু এ ভূত সে রোজার হাতে সারে না। এ সেই আদি-ভূতের অভাব,—যাহার বিশ্লেষণ নাই, এবং যাহার মিশ্রণে আমাদের দেশের ভূতপূর্ব্ব চতুর্থ ভূত জীবন-রক্ষায় সমর্থ হয়; এবং সেই প্রথম ভূত যখন, যে ভূতকে 'শত ধৌতেন ও মলিনত্ব ন যায়তে', তাহার দুই হাত ধরিয়া আসিয়া ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাই পেঁচো হইয়া শিশুর মূর্চ্ছি ধরায়। ইহার প্রকৃত রোজা বায়ু-সঞ্চালন (ventilation) সে কুটিরে বায়ু-সঞ্চালন না থাকায়ই আশার সম্বল শিশুর

রক্ত দূষিত হইয়া তাহাকে অকালে নিয়তির হস্তে সমর্পণ করে। ইহা আমাদের অদৃষ্ট-দোষ নহে, নিয়তি নহে বিধাতার নিগ্রহও নহে; আমাদের অজ্ঞতার ফল।

গৃহের মেজে শুষ্ক হওয়া একটী প্রধান সাধন। পল্লীগ্রামে এ বিষয়ে বাস-গৃহের অনেক উন্নতি হইয়াছে। রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারগণ যেমন দরিদ্র কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ ময়দান মধ্যেই নির্ম্মাণ করেন, তজ্জন্য হতভাগ্যদের রোগ-গ্লানি কখনও নিবৃত্ত হয় না। আমি পল্লীগ্রামের যত সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী দেখিয়াছি, তাহার মেজে মনুষ্যমস্তক অপেক্ষাও উচ্চ। কিন্তু শিশুদের ও তাহাদের অপরাধে মাতার সেই কুটিরখানির মেজে একেবারে আঙ্গিনার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। ইহাতে তাহাদের কফ, কাশি, জ্বর হইবেই। একটা মত আছে, Malaria loves the ground, মাটীর উপরে ৮ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত মেলেরিয়া বিরাজ করে। সুতরাং উঠানে অনাবৃত মেজেতে প্রসূত সন্তান মেলেরিয়ায় ত পড়িবেই। আমি নবপ্রসূত সন্তানেরও বৃহৎ প্লীহা দেখিয়াছি। উচ্চ মেজের উপর অথবা দ্বিতল গৃহে এই ম্যালেরিয়ার ভয় থাকে না। সূতিকা-গৃহ উচ্চ মেজের উপর নির্ম্মিত হওয়া কর্ত্তব্য। যে বাড়ীতে অধিক সন্তান হয়, তথায় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে একখানা স্থায়ী সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হওয়া কর্ত্তব্য যাহা কখনও ভাঙ্গা হইবে না। আমাদের দেশে যে একটি কুসংস্কার আছে যে, সূতিকাগৃহ অপবিত্র, তাহা ভ্রমময়। কেন না যে গৃহে আত্মা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, সেত পরম পবিত্র স্থান; আর যেখানে ধ্রুব প্রহ্লাদ কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি মহাত্মাগণের জন্ম হয়, তাহা ত তীর্থ। সুতরাং এই কুসংস্কার জন্য সূতিকাগৃহ অতি হীনাবস্থায় প্রস্তুত করা বড় অন্যায়।

যদি গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়, সে অগ্নি ধূমসম্পর্ক শূন্য হইবে; অর্থাৎ কাঠের কয়লা, গুলের আগুন, যাহা হইতে ধূম, Co, Carbonic Monoxide বাহির না হয় তাহাই রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু শীতকালে ভিন্ন অগ্নি বেশী আবশ্যক হয় না। আমি এক গৃহে দেখিলাম, মাতা সেই একাম্ল অঙ্গারক বাষ্পে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, সহস্র চেষ্টায়ও বাচান গেল না।

ঘরটি উচ্চভূমির উপরে হইবে, সমান্তরাল জানালা ও দ্বার রাখা হইবে। সম্মুখে একটী বারান্দা থাকিবে। জানালায় পর্দ্দা দেওয়া কর্ত্তব্য। বাহির হইতে হিম ও রৌদ্র না আসিতে না পারে, বেড়া এরূপ হওয়া চাই। যাহারা দরিদ্র তাঁহারা যেরূপ ঘরে নিয়ত বাস করেন, সেইরূপই হওয়া কর্ত্তব্য। মনে

করিবেন না যে, দশ দিন কি একমাসে কি হইবে? কোমল-প্রাণ শিশুর পক্ষে কয়েক দিনের অত্যাচারই জীবন-বিনাশে সক্ষম।

বিছানা ছেঁড়া হউক, কি পুরাতন হউক, মলিন না হওয়া উচিত। মলিনতা অশেষ রোগের আকর। শিশুগণের শরীরে যে মাসী পিসী খোস বিচি উঠে, তাহার অধিকাংশই ঐ কোমল চর্ম্মে মলিনতার সংস্রবে উৎপন্ন। সন্তানকে মশারীর মধ্যে শয়ন করাইবে। বর্ত্তমান মশক-মেলেরিয়া-মত সকলেই আগত আছেন।

কাহারও ইহা অসাধ্য নহে। ইহাতে অনিচ্ছা হওয়ারও কারণ নাই। তবে হয় না কেন? প্রাচীনাগণের ও অনেক সময়ে শিক্ষাবিভ্রাট-গ্রস্ত পুরুষগণের দোষে ইহা হয় না। এ সমস্ত উপাদান মেথর লইবে, এই আশঙ্কা। কিন্তু কিঞ্চিৎ ক্ষতির ভয়ে এই গুরুতর আবশ্যক কার্য্যটী এত ঘৃণিতভাবে সম্পাদিত হওয়া অতি দুঃখের বিষয়। আর, স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইলে তাহা কাহাকেও দিতে হইবে না।

এ সংস্কার কেন আসিল? আমরা দেখিতে পাই, যাহাকে লোকে ঘোর কুসংস্কার বলে, তাহার ভিতরেও একটু সার-সত্য আছে। প্রসব-সময়ে যে রসাদি নির্গত হয়, তাহার সংক্রামণ-শক্তি অতিশয় অধিক, এজন্যই এরূপ হইয়া থাকিবে। লর্ড লিষ্টার ১৮৭৫ কি সেই সময়ে অন্টিসেপ্টিক থিয়রি বাহির করিয়া চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাহার মতে বায়ুতে ও দেহ-মধ্যে ঐ সমস্ত রসরক্তসংস্রবে কীটাণু জন্মগ্রহণ নানাবিধ রোগ উৎপন্ন করে। এজন্য কার্ব্বলিক্ এসিড্, ফেনিল, পারদীয় পারক্লোরাইড্, পটাশ পার্ ম্যাঙ্গ্যানেট, বোরাসিক এসিড্ প্রভৃতি সম্যক্ ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

ধাত্রী-বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকেও এই লিখিত আছে, The cardinal principle of midwifery is asepsis. দূষিত-বস্তুর-সংস্রবত্যাগ প্রসবকার্য্যের মূল মন্ত্র। প্রাচীনাদের এত কুসংস্কারের মূল এই কথাটী। বাস্তবিক যদি সন্তান প্রসবসময়ে বর্জ্জনীয় বস্তু সকল সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হয় ও বিষনাশক উল্লিখিত ঔষধগুলি জলে মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়, তাহার গন্ধে ভূত, পেঁচো সব পালায়ন করিবে। এবং এই পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিলে, প্রসবের পরে যে সূতিকা-জ্বর বা (Puerperal fever) রোগ উৎপন্ন হইয়া অনেকে মাতার ও তৎসহ সন্তানের জীবন বিনাশ করে, এ শোকাবহ ঘটনা আর দেখিতে হয় না।

প্রসবের পরে শিশুর পরিধেয় বিষয়ে অনেক অনভিজ্ঞতা দেখা যায়। কেহ

কেহ ফ্লানেল মুড়িয়া রাখেন; কিন্তু ফ্লানেলের দোষ এই যে, উহা একটু কাল গায়ে না থাকিলেই সর্দ্দি লাগে। সুতরাং ফ্লানেল অপেক্ষা তুলার কাপড়, তুলার কোট মন্দ নহে। কখনও কখনও গরম সময়ে ছেলেকে খালি গায়ে রাখা ও শীতল জল পান করান, ও শীতল জলে স্নান করা অভ্যাস করানও মন্দ নহে। এবং সাদা পেনী, কাপড়ের কোট, পিরান, এই সমস্ত ব্যবহার করাই যুক্তি-সঙ্গত।

আর একটা ঘটনা যাহা দেখিয়াছি, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। একপুত্রের মাতাও বিধবা হইলে পুত্রবধূর সূতিকাগারে গিয়া সন্তানের কি প্রসূতির শুশ্রূষা করেন না। আহা, সংস্কার এমনি প্রবল, যে স্নেহ, মায়া, মমতা প্রজ্ঞা সকলকে অতিক্রম করে! প্রকৃত পক্ষে, পবিত্র থাকার অভিপ্রায় তাঁহাদের হৃদয়ে এমন প্রবল, যে সংসারের আশা, স্বার্থবিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহারা এই (ছুঁতস্পর্শহীন) পবিত্রতার জন্য লালায়িত। এদিকে আমাদের দেশ যে শিশুর মৃত্যু দ্বারা এক প্রকাণ্ড শোকাশ্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দিকে কি তাঁহারা দেখিবেন না।

অতি করুণা করিয়া পরম পিতা আমাদের পুত্রকন্যাদানে কৃতার্থ করেন; আমি বঙ্গের মাতাপিতাগণকে অনুরোধ করি, তাঁহার এই দয়ার দান, এই অযাচিত করুণা যেন আমরা প্রকৃত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি; তিনি যাহা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতার জন্য যেন অবহেলায় না হারাই। যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা, জীবন উদ্যানের মনোহর পুষ্প ভবিষ্যৎ বংশপ্রদীপ, যাহাদের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি, ইতর জন্তুরাও যাহাদের প্রতি কর্ত্তব্যে ত্রুটী করে না, সেই অমূল্যধন পুত্র-কন্যার পালনকার্য্য যেন আমরা অজ্ঞানতার অনলে আহুতি না দেই। একটু উদ্যোগিতা, একটু সাহস, ও একটু অগ্রে চেষ্টা করিলে যদি অমূল্য ধন রক্ষিত হয়, তজ্জন্য সহস্র ত্যাগ-স্বীকারও পর্য্যাপ্ত নহে। তাই এক কথায় আমি অনুরোধ করি, স্বতন্ত্র সূতিকা-গৃহ উঠাইয়া দিয়া বাসগৃহেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার বন্দোবস্ত করুন। আর যদি তাহা না হয়, তবে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিবেন।

লর্ড লিষ্টারের প্রবর্ত্তিত প্রথা আমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত নারীগণের যেন অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়; এ ছুঁইও না, ধর, না ও তাই। যখন আমরা অস্ত্র করিতে যাই, তখন বিষনাশক পদার্থ দ্বারা আগে হাত ধুইয়া লই, ঠিক তখন মনে হয়,

যে আমরাও শুচিবায়ুগ্রস্ত; তবে এই প্রাচ্য পাশ্চাত্য শুচিবায়ুর সম্মিলনে আমাদের আচার যেন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তানগণের জীবনরক্ষা করিতে পারে, এরূপ করিবেন। দিবারাত্রি স্নান না করিয়া, গোবর জল ব্যবহার না করিয়া, পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক উপায়ে হস্ত পদ প্রক্ষালন, মেঝে দুর্গন্ধ ও বিষনাশক পদার্থ দ্বারা ধৌত করা, শুষ্ক ক্লোরিনেটেড্ লাইম্ দ্বারা মেজে পরিষ্কার করা, ধুনা দ্বারা গৃহের বাষ্প সুগন্ধ করা, সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার করা, এইরূপ নানা উপায়ে আমাদের এই সদাচার প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিলে উভয় দিকেই উপকার! লক্ষ্য সকলেরই এক, উপায় বিভিন্ন। যদি আমাদের দেশে এই বিষয়ে সহস্র সহস্র খণ্ড গ্রন্থ লিখিত করিয়া সরল ভাষায় মাতৃগণকে এবং অভিভাবক মহিলাগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে সাহিত্য পরিষৎ অতিশয় পুণ্য-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। দয়াময় সেই দিন আনয়ন করুন, যেদিন আমাদের শিশুগণ সবল ও সুস্থ মাতার বিশুদ্ধ স্তন্য পান করিয়া, সবল সুস্থ ও প্রফুল্ল মুখে এই নানা সুখদুঃখময় জগতে প্রবেশ করিয়া দেশের ও সমাজের নানা মঙ্গলকার্য্য সাধন করিয়া জীবন ধন্য ও জননী জন্মভূমিকে উজ্জ্বল করিতে পারে। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষা।

শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।

লঙ্কায় রাবণের অশোক কাননে সীতাকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করিয়া মহাবীর হনূমান একদিন ভাবিয়াছিলেন,

"অহং হ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচং যোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্।
যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা॥"

বাল্মীকীয় রামায়ণের এই তিনটি শ্লোকের অভ্যন্তরে দুইটি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে ;—সেই দুইটি তত্ত্ব জাতি তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব। যদি কেহ রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহ কবিকল্পনাসম্ভূত অলীক ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ এই অনুরোধটা করিতে পারি যে, আদি কবি বাল্মীকির অভিপ্রায়টা একবার বুঝিয়া দেখিলে ভাল হয়। হনুমান কোন্ জাতির অন্তর্গত ছিলেন, আর্য্য না অনার্য্য, অথবা ইরাণীয় বা তুরাণীয়, কিংবা হামাইত্ বা শামাইত্, আজিকার সভায় আমার তাহা আলোচ্য নহে। আমি বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ সংক্ষেপে নির্ণীত করিতে চেষ্টা করিব।

হনুমানের উপরি উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সীতার ও হনুমানের এবং রাক্ষসগণের ভাষা এক নহে। তাহাদের পরস্পরের ভাষা ভিন্ন, আচার বিভিন্ন। হনুমানের তিনটি ভাষাতেই অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অনার্য্য-কুলসম্ভূত হইয়াও আর্য্যকুল-ললনা মাতাকে সীতাদেবী ভাষায় স্বীয় মনোভাব জানাইয়াছিলেন। হনুমান অনার্য্য, সুতরাং তাঁহার ভাষাও অনার্য্য। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কপি কুলের সেই অনার্য্য ভাষাকে দ্রাবিড় ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এস্থলে তাঁহাদের সেই মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই দ্রাবিড় ভাষা কতদিনের আদিম তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। বিন্ধ্য-গিরির দক্ষিণাংশ হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এক সময়ে মোটামুটি দ্রাবিড় দেশ বলিয়া বর্ণিত হইত। রামায়ণ বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের কিয়দংশ এবং জনস্থান ও পঞ্চবটী এই দেশ অন্তর্গত ছিল। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণস্থ প্রদেশ সংস্কৃত গ্রন্থ সমুদয়ে দক্ষিণাবর্ত্ত বা দক্ষিণাপথ কিংবা দাক্ষিণাত্য দেশ নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই সমগ্র দক্ষিণাপথই যে দ্রাবিড় দেশ তাহা কিছুতেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। চিল্লপতিকরণ মণি মেকলাই, পুরণাত্মক মেন তামিল প্রভৃতি প্রাচীন তামিল গ্রন্থে দ্রাবিড় দেশ তামিলক নামে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মান্দ্রাজের ১০০ মাইল উত্তরস্থিত ব্যাঙ্কট গিরিকে উক্ত গ্রন্থ সমূহের লেখকগণ তামিলক ভূমির উত্তর সীমা এবং কুমারিকা দক্ষিণসীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সীমা অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কারণ ব্যাঙ্কট গিরিকে দ্রাবিড় দেশের সর্ব্বোত্তর সীমা রূপে স্বীকার করিলে ত্রৈলঙ্গ দেশ তাহার বাহিরে যাইয়া পড়ে। কিন্তু বোধ হয় সকলেই জানেন ত্রৈলঙ্গ অর্থাৎ তেলুগু ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার একটা প্রধান শাখা। সে যাহা হউক, ভৌগলিক সীমা লইয়া অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

উত্তর ভারতের কয়েকজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ ভারতবর্ষের অপভাষাগুলিকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা পঞ্চ গৌড়ী ও পঞ্চ দ্রাবিড়ী। কিন্তু তাঁহারা মহারাষ্ট্রী ও গুর্জ্জরী ভাষাকে পঞ্চ দ্রাবিড়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া এক বিষম গোল-যোগের সূচনা করিয়াছেন। দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত মরাঠি ও গুজরাতী ভাষার যে তিল মাত্র সম্পর্ক নাই, তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অবিদিত নহে। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, তামিল, তেলুগু, মলয়ালম্, কর্ণাটী ও টুলু এই পাঁচটীই প্রধান পঞ্চ দ্রাবিড়ী ভাষারূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কেহ কেহ টুড়া, কোটা, গণ্ড ও কূ এই চারিটী ও পঞ্চ দ্রাবিড়ে সংযুক্ত করিয়া সর্ব্বসমেত নয়টী দ্রাবিড়ী ভাষার উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে সম্প্রদায় বিশেষে মতভেদ দেখা যায়। এক সময়ে দ্রাবিড়ী ভাষা উত্তর ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দারুণ অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া উপেক্ষিত হইত। ইহারা ট-বর্গের বাহুল্য দর্শনে দংষ্ট্রা বিঘট্টিত করিয়া তাঁহারা ইহাকে টাণ্ডা, ডাণ্ডা - টাণ্ডা ড় ঢাণ্ডা অন্দ্রাণ্ডা বলিয়া কতই অশান্ত ভাবে শিষ্টাচারের প্রক্রান্ত সীমা অতিক্রম করিতেন। তাঁহাদের সেই অন্যায় উপেক্ষা ও অবহেলার কারণ কি তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। যে অনার্য্য বিদ্বেষ আর্য্য ঋষি ও কবিগণের অস্থিমজ্জার সহিত বিজড়িত ছিল; বৈদিক কাল হইতে যুগযুগান্তর ধরিয়া দস্যু, দানব, রাক্ষস ও যাতুধান দিগের দূর ছায়া দর্শনেও যাহা দ্বিগুণ করিয়া উঠিত, দ্রাবিড়বংশে দৈত্যের কায়া ও মায়া নিগূহিত ভাবিয়া তাহা আর কিছুতেই প্রশমিত হয় নাই। যেন সেই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ দন্তবক্র ও শিশুপাল, কংস ও জরাসন্ধের প্রেতাত্মা কালের গভীর যবনিকা ভেদ করিয়া আবার শত সহস্র রক্তবীজরূপে দ্রাবিড় দেশের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। তাই তাহাদের ভাষা ও ভাববিভবে এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে দ্রাবিড়ী ভাষা কতদিনের ?—উত্তরে বলা যাইতে পারে, দ্রাবিড় জাতি যতদিনের। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে দ্রাবিড় জাতির উল্লেখ আছে; ভগবান মনু যে জাতিকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া দৈত্য-দানবের অস্কারজনক নিম্ন নিবাত হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন; মহাবীর মগধের কঠোর শাসন যাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত টিন হুন দরাদ পারদদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল;—ওয়ালেস, হিকেল, স্লেটার রাজেন ওল্‌ড্‌হেম প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাসাগর গ্রস্ত লেমুরিয়ার ধূমময়ী মূর্ত্তি জগতের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া আজিকার ছিন্নভিন্ন শত ২ যোজন দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত, দক্ষিণ পূর্ব্ব

আফ্রিকা, মদগস্কর সিংহল, বোর্ণিয়ো, সুন্দ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপ সমূহকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া দ্রবিড়, দ্রমিল, দ্রুইড় (দ্রুমিল,) প্রভৃতির জীর্ণ চিত্র ইতিহাসের কীটদষ্ট পত্রে প্রকাশ করিতেছেন; সে জাতি কত দিনের তাহা কে বলিতে পারে? চিলপ্পতি-করণ, মণিমেকলাই প্রভৃতি প্রাচীন তামিল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাবণ স্বয়ং তামিল ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্রৈলঙ্গ বা তেলুগু ভাষায় প্রথম ব্যাকরণকর্ত্তা মহর্ষি কণ্ব বলেন, "ভগবান্ অন্ধ্র বিষ্ণু নিশুম্ভ দৈত্যের বধসাধন করিয়া আমাকে ত্রৈলঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। সেই ভগবান্ বিষ্ণুরই আদেশে আমি এই অন্ধ্র ব্যাকরণ রচনা করিয়াছি।" আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রকটিত করা অনাবশ্যক। উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দ্রাবিড়ী ভাষা অতি প্রাচীন।

দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার কোন্ কোন্ অংশে সাদৃশ্য আছে তাহা প্রদর্শন করা অলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। কতকগুলি কথা দ্রাবিড়ী ও বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায়; নিম্নে তন্মধ্য হইতে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল:—

(ক) দাড়ি, দোপাট্টী, পড়ন (পতন) প্রভৃতি।

(খ) কতকগুলি সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা শব্দের সহিত অতি সামান্য পার্থক্য দেখা যায়, নিম্নে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে:—

বাঙ্গালা।	দ্রাবিড়ী।
আম্র	মাম্বরম
কষ্ট	কষ্টম্
কুমারী	কুমারিত্তি
ত্রি	তিরি
দিন	দিনম্
দূর	দূরম্
নষ্ট	নষ্টম্
নিন্দা	নিন্দৈ
নিশ্চয়	নিচ্চয়ম্
পেটিক, পেটরা	পেটি

বাঙ্গালা	দ্রাবিড়ী
পুত্রী	পুট্টিরী
মঞ্জরী	মঞ্জরী
মৎস্য	মচছম্
মীন	মীনম্
মলয়	মলয়
মহিমা	মহিমৈ
মাংস	মাংস, মাঙ্গিষম
মান	মানম্
মাস	মাস
মিত্র	মিট্টিরু
মুখ	মুখম্
মূঢ়	মূড়ম্
মূর্চ্ছা	মূর্চ্ছৈ
মৃগ (জীব)	মিরুগম্
মেঘ	মেগম্
যথার্থ	যতার্থম্
যুগ	যুগম্
মৌন	মৌনম্
যাচক }	যচগম্
ভিক্ষা }	পিচ্চৈ
শৌর্য্য	শৌরীয়ম্

এইরূপ আরও অনেকগুলি কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহা নিষ্প্রয়োজন। শব্দের সাহায্য ব্যতীত কোন কোন ক্রিয়ার সহিতও সামান্য মিল দেখা যায়, যথা :—

বাঙ্গালা	তামিল
পড়িব	পড়িপ্পেন
পড়িয়াছি	পড়িত্তেন
পড়িতে	পড়িক্ক
পড়িয়া	পড়িক্কম

(তুই) পড়্	পড়ি
(তুমি) পড়	পড়িয়ুঙ্গল্
(আপনি) পড়ুন	পড়িয়ুম্

(গ) পার্শি ও উর্দ্দু হইতে অনেকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ও তামিল উভয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে তন্মধ্য হইতে কয়েকটার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

বাঙ্গালা	তামিল
আসল	অসল
আগে	আগে
আর্জি	আর্জি
ইলফা	ইলফা
ইনাম	ইনাম
ইজারা	ইজারা
ইস্তাহার	ইস্তিয়ার
হুকুম	উক্কুন
একুন	এগুন
কবুল	কবুল
কাছারি	কাচ্চেরী
কড়ার	কড়ার
কিল্লা	কিল্লি
কিস্তি	কিস্তি
খাজনা	কজানা
জমা	জমা
জমি	জমিন
জরিমানা	জল্মানা
জরুর	জরুর
জারি	জারি
জেলা	জিলা
জোব	জোর
তকরার (প্রতিবাদ ও তর্ক)	তকরার
তহ্শিলদার	তাসিলদার

বাঙ্গালা	তামিল
তালুক	তালুক
নকল	নকল
নমুনা	নমুনা
পেশ্‌কার	পেশ্‌কার
মাশুল	মাশুল
মকুপ	মাপ্‌
বেস্‌ (উত্তম)	বেস্‌
মোহর	মোহর
রাজি	রাজি
রুজু	রুজু
সহর	সহর

উপরি-উদ্ধৃত শব্দগুলি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, বঙ্গে ও দ্রাবিড়দেশে মুসলমান শাসনকালে বৈষয়িক ব্যাপার সম্পাদনের নিমিত্ত পার্শি ও উর্দ্দু হইতে ঐ গুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। অধুনা সেইরূপ desk, box, court, Judge, school, college প্রভৃতি শব্দ ইংরেজী হইতে ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই প্রচলিত হইয়াছে। জাতি নিবহের পরস্পরের সংঘর্ষে বা সম্মিলনে ভাবের ও ভাষার ঐরূপ আদান প্রদান জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যে ভাষা শব্দ-সম্পদে অধিক সমৃদ্ধ, সেই ভাষাই অধিকতর গৌরবান্বিত।

প্রাচীন ভাষা সমূহের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা গরীয়সী। তথাপি কেহ কেহ বলেন, দেবভাষা সংস্কৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও ইহা রোমীয় ভাষা হইতে দিনার * এবং তামিল ভাষা হইতে নীর, শর, মলয়, লঙ্কা প্রভৃতি শব্দ পরিগ্রহ করিয়াছে। † তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি কতদূর সমীচীন, এস্থলে তাহার আলোচনা হইতে পারে না। দ্রাবিড় ভাষা যে পাঁচটী প্রধান শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে তামিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ; অপর চারিটী ভাষার অপেক্ষা ইহাতে সংস্কৃতের প্রভাব অনেক কম দেখা যায়। ইহার কারণ তামিল ভাষার সৃষ্টি পুষ্টি সাধনে দাক্ষিণাত্য আর্য্যগণের অধিক কৃতিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্ববিষয়ে অযথাভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং স্থলবিশেষে নিরুপায় হইয়াই সংস্কৃত শব্দ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ও তামিল সদৃশ শব্দ সমূহের তুলনায় সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; দাঁড়, দোপাটী, কোটা কুটীর, পড়ন প্রভৃতি শব্দ তামিল হইতে কিরূপে বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বিন্যস্ত হইল, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা

---

* The Origin of the Tamil Velalas, pp 18-24.

† Caldwell's Comparative Grammar of the Pravidian Languages pp 439-4 7.

আবশ্যক। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটী কারণ দেখাইয়া থাকেন :—

(১) কনকসভৈ পিলে প্রমুখ কতকগুলি তামিল পণ্ডিত বলেন, প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত জাতি খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তদানীন্তন চলিত বাঙ্গালায় তাম্রলিপ্তি তামলিপ্তি এবং পালি ভাষায় তামলিট্টি নামে বিদিত ছিল। * তামিল শব্দ উক্ত তামলিট্টি শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পিলে মহাশয়ের অনুমান যদি ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে এই একটী যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, তাম্রলিট্টি হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে তামিলেরা যে সকল বাঙ্গালা শব্দ সচরাচর ব্যবহার করিত, দাড়ী, নাড়ী, হাঁড়ী, ভুঁড়ি প্রভৃতি তৎসমুদয়ের অবশেষ।

(২) সিংহপুর রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা মহারাজ সিংহরাজের পুত্র বিজয়সিংহ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা করিলে কৃষ্ণা নদীর তীরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তত্রত্য বিজয়বাটিকা নগর তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তি। বিজয়বাটীকা এক্ষণে বেজোয়াড়া নামে পরিচিত। ইহা ইষ্ট্ কোষ্ট্ রেল্ওয়ে লাইনের একটি প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। তথায় বিস্তর বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বিজয় সিংহ দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা তত্তদ্দেশে বহুদিন অখণ্ড শরীরে সজাব ছিল। ক্রমে তাহার বিস্তর রূপান্তর হইয়াছে।

"অন্ধ্রভৃত্যগণের বঙ্গবিজয় একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। উক্ত ব্যাপারে জেতা ও বিজিতের মধ্যে ভাব ও ভাষা সম্পর্কে বিস্তর আদান প্রদান হইয়াছিল তদ্ব্যতীত যোড় ও বল্লালগণের প্রাচীন প্রভাব বঙ্গে বেলুড় বেলুন প্রভৃতি গ্রামনামে আজিও দেখা যাইতেছে। †

উপরি-উদ্ধৃত কারণত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটাতে তামিলক দেশে প্রাচীন বঙ্গীয় ভাষার, এবং তৃতীয়টীতে বঙ্গে তামিল ভাষার প্রভাব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যদি তামিল জাতি যথার্থই প্রাচীন তাম্রলিপ্তগণের বংশে উদ্ভূত এবং তাম্রলিপ্ত হইতে দক্ষিণ সাগরতীরে উপনিবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তামিল ভাষার উপর প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট স্বত্ব ও স্বামিত্ব অবাধে সাব্যস্ত হইতে পারে। অতীত জাতি গৌরবের ছায়াময়ী চিন্তায় স্পর্দ্ধিত না হইয়া বাঙ্গালী মাত্রের পণ্ডিত কনকসভৈ পিলের উক্ত মতের নিরপেক্ষ আলোচনা দ্বারা প্রকৃত তথ্যনিরূপণে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

* Tamils Eighteen Hundred years Ago, pp 532

† Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, pp. 245-249.

চাড় ও বল্লালগণ কতকাল পূর্ব্বে বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। বল্লালসেন ব্রহ্মপুত্রের সন্তান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বল্লালসেন সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেন তামিল নামে একখানি পুরাতন তামিল পুস্তিকা মাদ্রাজের কনিয়ারা লাইব্রেরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পুস্তকে অনেক প্রাচীন কথা বর্ণিত আছে। কিষ্কিন্ধ্যা, দক্ষিণাপথ, দক্ষিণারণ্য প্রভৃতির বিস্তর বিবরণ সেই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। পরে সেই সকল বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইবে। সেন তামিল পুস্তকের সহিত বঙ্গের প্রাচীন বিবরণ কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কলিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর কনকসভৈ পিলৈ মহোদয়ের পুরাতন তামিলগণের বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। সেই পুস্তকে বিস্তর প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ আছে। বানর ও রাক্ষসগণের বিপুল ইতিহাস Tamil Antiquary নামক মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দু-আফ্রিকান (Indo-African) ও তামিলিয়ান (Tamilian) জাতির অর্থাৎ রাক্ষস ও বানরগণের প্রকৃত তত্ত্ব সেই পুস্তকে বর্ণিত আছে। পাঠকগণ সেই মাসিক পত্রিকা পাঠ করিলে রাক্ষস ও বানরগণের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন।